সপার্ষদ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী।

অর্থাৎ

বিস্তৃত উপক্রমণিকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

জীবন ও লীলাবিষয়ক প্রায়

পঞ্চদশশত মহাজনী

পদাবলী।

মহাজন-পদাবলী প্রভৃতি প্রণেতা অবসরপ্রাপ্ত জিলা-স্কুলের

ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক

দীন শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত।)

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

এ, এন্, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গ-কুলীনবর, গুহবংশধর,
টাকীরায় চৌধুরী যতীন্দ্র নাথ।
অগাধ পণ্ডিত, গুণগণ-মণ্ডিত,
বিদ্যোৎসাহী গৌর-ভকত-বিখ্যাত।
সোঁপল অকিঞ্চনে, তছু গীমশোহনে,
হার-"গৌরপদ তরঙ্গিণী।"
সুঘর শেখর, শ্যাম নটবর,
গীমে বনমালা শোহে জনি।
যদপি অপটু মালী, কু-মালা এ গাঁথলি,
তবু যুক্ত নহ পরিহার।
অমূল অতুল ইথে, আছয়ে শতে শতে,
গৌর-পদ-মণি উজিয়ার।
পহুঁ শচীসুত মঝু, চরণ-রাজীবে তছু,
করু এ মিনতি জোড়হাত।
নিতাই গদাই সহ, আশিষহুঁ অহরহ,
সুখে রহু যতীন্দ্র নাথ।

ভূমিকা।

আজ আট বৎসর গত হইল, উত্তর-বঙ্গের একজন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী বিদ্যোৎসাহী ও পরমবৈষ্ণব এবং পরমধার্ম্মিক ভূম্যধিকারীর উৎসাহে আমরা এই মহাগ্রন্থের সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। উক্ত জমিদার মহাশয়ের সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু এবং আমার বিশ্বাসী সুহৃদের প্রমুখাৎ জানিয়াছিলাম এবং জমিদার মহাশয়ের দুইখানি পত্র হইতেও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন ; তাই আমরা প্রাণপণে আগ্রহ-সহকারে এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। তিনি প্রথম পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনার সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু পদগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে মহাজনী পদ হয়। গ্রন্থমধ্যে একটীও আধুনিক পদ থাকিলে গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে না।"

তিনি দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"আপনার সংগৃহীত গ্রন্থপ্রকাশে এই ভগবৎ-সংসার হইতে কত ব্যয় পড়িবে, তাহার নির্ণয় জন্য গ্রন্থখানি সত্বর প্রেরণ করিবেন, ইত্যাদি।"

এই আদেশ অনুসারে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ গ্রন্থখানি উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার পর, তিনি গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সমগ্র মুদ্রণ-ব্যয়স্থলে মাত্র শত মুদ্রা সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন, এইরূপ জানাইলেন। আমরা এই অনুগ্রহে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলাম। কারণ, আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশে পাঁচশত মুদ্রার প্রয়োজন। আমরা নিজে নির্ধন, সুতরাং মাত্র শত মুদ্রা গ্রহণ নিষ্ফল জানিয়া, উহা আমরা গ্রহণ করি নাই। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় হতাশ্বাস হইয়া আমরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় মুদ্রণব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটী প্রস্তাবের উত্থাপন করি ; তাহা পাঠ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জনৈক সহৃদয় বদান্য রাজা ঐ পত্রিকায় লিখেন যে, যদি আমাদিগের গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনুমোদন করেন, তবে তাঁহার রাজ-সরকার হইতে সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন। অক্ষয় বাবুর অনুকূল-সমালোচনা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া, পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের বন্দোবস্ত করিতে প্রার্থনা করিলাম, আর উত্তরও নাই, সাহায্য প্রদানও নাই। ক্রমে তিনখানি পত্র লিখিয়া, উত্তর না পাইয়া, তাঁহার দত্ত সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিতে

বাধ্য হই। সে আজ কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরের কথা। তৎপর রাজা, মহারাজ, জমিদার, তালুকদার, সভা-সমিতি, পুস্তকপ্রকাশক, কত জনের কাছে, কত রকম সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিছুতেই দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হইল না। এই সকল মহাত্মারা সকলেই বিখ্যাত দয়াবান্, প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মশালী, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, কুবের তুল্য ধনবান্. কিন্তু, "তৃষিত দেখিলে সাগর শুকায়" যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা আমাদিগের দগ্ধ-অদৃষ্টে অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। এই অপার দুঃখের সময় বঙ্গের সুদূরপূর্ব্বপ্রান্ত হইতে একটী মহামনা সুহৃদ্ মধ্যে মধ্যে পত্র দ্বারা আমাদের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এবং আমাদিগের হতাশদগ্ধ-হৃদয়ে ধর্ম্মভাবপূর্ণ সোৎসাহ-বারি সেচন দ্বারা, মরুভূমে আশার বীজ অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আমাদিগের সংগৃহীত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন ও আলোচনা করিয়াছেন। অথচ এই মহাত্মার সহিত আমাদিগের অদ্যাপি সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই। ইনি শ্রীহট্ট-জিলাবাসী স্বনামধন্য গৌরগতপ্রাণ সুলেখক শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস।

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি তাঁহার মহাপাপী দীন-ভক্তের আশাও অপূর্ণ রাখেন না। তাই আজ তিন মাস হইল, একজন মহামনা ব্যক্তির আমাদিগের সহিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অকৃত্রিম সহানুভূতি জন্মে। তিনি স্বয়ং ধনী নহেন, কিন্তু পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়া আমাদিগের সাহায্যার্থ একটী দাতা জুটাইয়া দিয়াছেন। সেই দাতার কথা বলিবার পূর্ব্বে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদপূর্ব্বক এই মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি। ইনি ফরিদপুরের সর্ব্বপ্রধান উকিল, ভারতের সুসন্তান, স্বদেশসেবী, প্রকৃত জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার।

টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একজন ক্ষমতাবান্ সভ্য, সাহিত্যপরিষৎ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক, পরমবিদ্বান্, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, প্রভূত সৎকর্ম্মশালী, অশেষগুণালঙ্কৃত, মহাভাগবত. শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ই আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশের একমাত্র সাহায্যকারী। এই মহাত্মার কৃপাতেই আট বৎসরের পর এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল ; এই মহাত্মার প্রসাদেই বৈষ্ণব-জগত শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাবলীর বিমল-রসাস্বাদনে সক্ষম হইলেন। ইনি গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত অর্থ বিনা সুদে আমাদিগীকে ধার দিয়াছেন। গ্রন্থবিক্রয়ের মূল্য হইতে এই ঋণ পরিশোধ

করিতে হইবে। ইনি বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিতরণ জন্য মাত্র ১০।১৫ খানি গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, এই মাত্র কথা। সুতরাং ইনি কপর্দ্দকলাভেরও প্রত্যাশী নহেন। আমরা যখন ইঁহার হস্তে হস্তলিখিত কাপি প্রদান করি, তখন ইনি নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিয়াছিলেন "এই গ্রন্থের কুত্রাপি যেন আমার নামের উল্লেখ না থাকে।" প্রকৃত গৌরাঙ্গভক্তগণ এই রূপই বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও ঢক্কানাদ-বিদ্বেষী। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞতাভয়ে, দাতার নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভরসা করি, আমাদিগের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীহট্টবাসী অপর একজন ধর্ম্মবন্ধুর নিকটও আমরা বিশেষ ঋণী। ইনি বঙ্গ-বিশ্রুতনামা পরমপণ্ডিত তত্ত্বদর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়। ইঁহার সহিতও আমাদিগের চাক্ষুষ পরিচয় নাই। কিন্তু ইনি এমনই সহৃদয় উন্নত-চেতা, বিনয়ী ও পরমার্থপরায়ণ যে, আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থের উপক্রমণিকা সম্বন্ধে ইঁহার নিকট যখন যে সাহায্য চাহিয়াছি, তাহা সহর্ষে ও অবিলম্বে প্রদান করিয়া আমাদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার প্রদত্ত তত্ত্ব ও বহুমূল্য উপদেশ না পাইলে আমরা ৮৮ জন পদকর্ত্তার মধ্যে ৮০ জনের অল্পবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইতাম না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইঁহাকে দীর্ঘজীবী ও নিরাময় করিয়া স্বীয় দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

আমরা রাজকার্য্য-সম্পাদনোপলক্ষে পাবনানগরীতে অবস্থানকালে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি। তখন সৌভাগ্যক্রমে পরমবিজ্ঞ পরমদর্শী পরম-গৌরভক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমাদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মে। পদাবলীর স্থানে স্থানে আমরা যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যত্ন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে এই সুহৃদ্ আমাদিগের পরম সহায় ছিলেন। ইঁহাকে অনেকেই বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া জানেন, কিন্তু ইনি যে বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন উন্নত সাধক, তাহা অল্প লোকেই অবগত আছেন। ফলতঃ ইনি দেহরোগ ও ভবরোগ নিরাকরণে তুল্য পারদর্শী। ইঁহার ন্যায় মধুর-চরিত্রবিশিষ্ট লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি।

অপর পদাবলী গ্রন্থে যে সকল পদের রাগ-রাগিণী লেখা নাই, আমাদিগের সংগ্রহে পাঠকগণ তৎসমস্তের এক একটী রাগিণী নির্দ্দেশ দেখিতে পাইবেন। ইহা আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত নহে। আমাদিগের চিকিৎসক বন্ধুর নিকট প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজীউই ঐ সকল সঙ্গীতের রাগিণী নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এই বন্ধুটী একটী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, গৌরগতপ্রাণ, বিশুদ্ধচরিত্র ও সংকীর্ত্তন-সঙ্গীতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশালী।

অসাধারণ প্রতিভাশালী পরমপণ্ডিত বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও "বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইতিহাস" প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই মহাত্মদ্বয়ের গ্রন্থ হইতে পদকর্ত্তৃদিগের জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতেও আমরা কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই তিন মহাত্মাই আমাদিগের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা আরও বহু মহাত্মার নিকট অল্পবিস্তর ঋণী; তাঁহারা সকলেই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র এবং আমরা অবনত-মস্তকে সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আমাদিগের ভূমিকা প্রায় চরমসীমায় উপনীত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের সংগ্রহখানি সম্বন্ধে একটী কথাও বলি নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে দুইচারি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা ভূমিকাটীর উপসংহার করিতেছি। বর্ত্তমান গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট মহাজনী পদাবলী ও পদকর্ত্তৃদিগের বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের বহু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করিয়া অনেক গ্রন্থ আমাদিগকে ধার দিয়াছেন। অনেক গ্রন্থ আবার মূল্য দিয়া ক্রয়ও করিয়াছি। বাঁকুরা, বীরভূম, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেই আমরা অধিকাংশ হস্তলিখিত পদ-গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। বিষয়কার্য্য করিবার অবকাশ সময়ে এই সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আমাদিগকে কোন কোন স্থানে এবং কোন কোন লোকের নিকট যাইতে হইয়াছে। কোথায় সফলমনোরথ এবং কোথাও বা হতাশ হইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার মূল্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাত্মক প্রায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ, মহাপ্রভুর পরিকর ও পার্ষদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্ত্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে এমন সকল প্রাচীন পদ আছে, যাহা হয় ত অনেক পাঠক এ পর্য্যন্ত দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। যাহা হউক, দয়াল নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের চরণপ্রসাদে আমরা আমাদিগের গৃহীত মহাব্রতের উদ্যাপন করিলাম। বৈষ্ণব-জগত আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন অচিরে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি। ইতি

ফরিদপুর।
১২ই জুন ১৯০২। } শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ।

(১)

বুঝলু রে মন ভেলত বোখার।
দারুণ তাপ দেহে, দগধ অঙ্গার ॥
কাঁপত থরহরি অসহন শীতে।
বহি রহি চমকত ভয় ভরু চিতে ॥
ঘন ঘন বহত তপত নিশোয়াসা।
দূর সঞে না ভাগত দারুণ পিয়াসা ॥
ক্ষীণ বহত নাড়ী বিষম বিকার।
হরলহুঁ গেয়ান, পরলাপ সার ॥
রে মন ভোগবি ভব-রোগে কাহে।
পায়বি সোয়াথ শুন কহুঁ যাহে ॥
হরি-নাম-ঔষধ ভকতি অনুপানে।
পান করহুঁ অবি কয়ব পয়ানে ॥
কিন্তু জগবন্ধুক বিষয়-রোগে।
হরিনাম ঔষধ না মিলই ভাগে ॥

(২)

পামর মন তুহুঁ কাহে কর হাহুতাশ।
কাহেক ছোড়ত দীঘল নিশোয়াস ॥
আঁখিলোরে ভাসত কাহে দিন রাতি।
কাহে হিয়া দগদগি কাহে ফাটে ছাতি ॥
সমুঝল তছুক মরম অব মন মে।
বিষয়-ভুজঙ্গম দংশল মরমে ॥
বিষম বিষে তনু ভৈগেল বিথার।
তঁহি লাগি কর তুহুঁ ইহ হাহাকার ॥
কাহে নাহি ডাক উ ওঝা মূঢ়মন।
নদীয়ামে বৈঠত ওঝা মিশ্রনন্দন ॥
হরিনাম-মন্তরে সব সোই ঝাড়ে।
ভোগ-ভুজগ-বিষ, তব যাউ দূরে ॥
বিষ-বৈদ্য পহুঁ করুণাকসিন্ধু।
কব তাহে চিহ্নব দীন জগবন্ধু ॥

প্রথম সূচী।

বিষয় বা রস।

দ্বিতীয় সূচী।

পদকর্ত্তৃগণ

তৃতীয় সূচী।

গানের মোহরা।

গীত	পৃষ্ঠা
আনন্দে ঠাকুর গৌরীদাস … …	২৪৫
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে … …	২৪৩
আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত … …	২৬০
আনন্দ কন্দ নিতাইচন্দ অরুণ নয়ন … …	৩২৯
আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে … …	২৫৩ ও ২৮৯
আবেশে অবশ গোরার ঢুলু ঢুলু আঁখি … …	২৯৩
ইহ কলিযুগ ধন্য নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য … …	৩৪
ইহ পহিল মাঘ মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ …	৩৯২
ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল। বিহি নাহ কাহে লেই গেল …	৩৯২
ইহ আওয়ে চৈতক মাহ। ঋতুরাজ বাঢ়া যত দাহ …	৩৯৩
ইহ মাধবী পরবেশ। পিয়া গেল কিয়ে দূরদেশ …	৩৯৩
ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়। তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ় …	৩৯৩
ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ। তাহে আওয়ে শাওন মাহ …	৩৯৪
উলসিত আয়োগণ … …	১০৭
উষকালে সখী মিলে জল ভরিতে যায় … …	১৮০
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি … …	২৯৩
উঠিয়া বিহান বেলি … …	৩০৪
উঠ উঠ আজি একি অদভুত … …	৩৪৩
উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল … …	৩৪৭
উলু পড়ে বারে বারে হারাই পণ্ডিতের বাড়ী … …	৪১৬
ঐছে শচী জগন্নাথ পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ … …	৫
ও মোর জীবন প্রাণ পরম করুণাবান্ … …	৫
ও মোর জীবন সরবস ধন … …	৭৮ ও [illegible]
ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয় … …	[illegible]
ও না কে বলগো সজনি … …	১২২
ওরূপ সুন্দর গৌরকিশোর … …	১৩৬ ও ২১৮
ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজ ঘরে … …	১৪৪
ওগো সই রসের ভোমর মোর গোরা … …	২১৯
ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর … …	৪০৫

গীত

গীত | পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

গীত

পৃষ্ঠা

গীত পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা
গৌর-বরণ হিরণ কিরণ অরুণ বসন তার	...	...	৩০৩
গৌরীদাস সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে	...	...	২৯১
গৌরীদাস করি সঙ্গে আনন্দিত তনু রঙ্গে	...	...	২৯২
গৌর-গুণমণি বরজ-শশধর পূরব প্রকট	...	...	৩২৮
গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল	...	...	৩৩১
গৌরকিশোর পূরব রসে গরগর	...	...	৩৩২
গৌর গোকুল নাহ নটবর বেশ বিরচি	...	...	৩৩৯
গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব হইল	...	...	৩৫৪
গৌর বিধুবর বরজমোহন ভ্রমণ করু নদীয়ায়	...	...	৩৫৪
গৌরাঙ্গ-গমন শুনি অন্ধগণ বাহিরে বাঢ়ায় পা	...	...	৩৫৫
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা	...	...	৩৭১
গৌর-গরবে হাম জনম গোঙায়লু	...	...	৩৮৯
গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া	...	...	৪০০
গৌর-প্রেমভরে গরগর অন্তর	...	...	৪৪২
গৌর আনিলু আনিলু বলে	..	...	৪৫১
গৌড়দেশে রাঢ়ভূমে শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে	...	..	৪৫৬
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব প্রচার করিয়া সব	...	...	৪৬২
গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয়পরিকর দ্বিজহরিদাস নাম	...	...	৪৮২
গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি গদাধর	...	...	৪৮৮
গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ	...	...	৪৮৯
গৌরাঙ্গচাঁদ হেন নয়নের কোণে	...	...	৪৯০
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন তুয়া নাম	...	...	৪৯১
গৌরাঙ্গ পাতকী উদ্ধার করুণায়	...	...	৪৯১
ঘরে রে আইলা প্রভুরত্ন লৈয়া	...	...	৯৩
ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনী	...	..	৩৯৭
ঘুমক ঘোরে ভোর শচীনন্দন	...	...	২০৫
চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু	...	...	১২৮
চম্পক-কুসুম কনক নব-কুঙ্কুম তড়িত-পুঞ্জ	...	...	১৩৪
চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে	...	...	৭৬১

গীত পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা

হ

পৃষ্ঠা

মূলগ্রন্থের ৩য় সূচী সম্পূর্ণ।

উপক্রমণিকা।

বর্ত্তমান সংগ্রহ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শচীনন্দন গৌরাঙ্গদেবের ও তদীয় পরিকর ও ভক্তগণের অলৌকিক, অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব লীলাত্মক কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশশত প্রাচীন মহাজনী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি, গীতরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয়, পদচিন্তামণিমালা, রসমঞ্জরী, লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গৌরচরিত-চিন্তামণি, প্রভৃতি মুদ্রিত পদগ্রন্থ ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যে সকল পদ নাই, তেমন অনেক পদ পাঠক এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। আমরা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, বহু বিজ্ঞ-বৈষ্ণব-বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া, এবং বহু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়ার তোষামদ করিয়া, এই সকল অমূল্যরত্ন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অনেকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আমাদিগকে দেখিতে ও ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। যাহা হউক, এবিষয়ে আর যাহা বক্তব্য তাহা আমরা ভূমিকায় বলিব।

এই উপক্রমণিকায় আমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে একটী কথাও বলিব না। কেননা, সে অতুল, অমূল্য চরিত ভুবনে সুপরিচিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীল লোচনানন্দ ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল জয়ানন্দ দাসের চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা, শ্রীল ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও লীলা বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথানুসারে পরলোকগত জগদীশচন্দ্র গুপ্তের শ্রীচৈতন্যলীলামৃত, শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ বিরচিত অমিয়-মাখা অমিয়-নিমাই-চরিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত যুগাবতার, ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার [illegible] প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রভৃতি কএকখানি উপাদেয় [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আছে। পরিশেষে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত [illegible] সেন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] চরিতাখ্যান ও চরিত্র ও লীলার সমালোচনা আছে। অনুসন্ধিৎসু [illegible]

উপক্রমণিকা

পাঠক ইচ্ছা করিলে প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও প্রামাণিক জীবনী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু নূতন বলিবার নাই; কিন্তু এস্থলে একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদিগের ইচ্ছা। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে কি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিব মনে করিয়া।

বংশী শিক্ষার প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রেমদাস কহিয়াছেন :—

"কলি পাপতাপাচ্ছন্ন দেখি ভক্তগণে।
উদয় হইয়া প্রভু শচীর ভবনে॥
দুই ভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন।
অন্যে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ॥"

উক্ত গ্রন্থকার সেই দুইটী কার্য্যের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) "বহিরঙ্গ ভাবে হরে কৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগ মাঝে গৌর গুণধাম॥"

(২) "অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে॥"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দ্বিবিধ লোকের পক্ষে সাধ্য বিবেচনা করিয়া দ্বিবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমতঃ যাহারা বহিরঙ্গ বা সাধারণ লোক অথবা দুর্ব্বলাধিকারী, তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার বিধি করিলেন নাম গ্রহণ, নাম জপ বা নাম সঙ্কীর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা অন্তরঙ্গ বা পরিকর, অথবা সবলাধিকারী বা যাঁহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম এবং সেই মর্ম্ম মতে ধর্ম্ম সাধনে পারগ, তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থা হইল, "রসরাজ উপাসনা।" আমরা ক্রমে এই দ্বিবিধ উপায়ের যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। বিষয়টী অতি গুরুতর, প্রগাঢ় জ্ঞান সাপেক্ষ, বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সাপেক্ষ, এবং সাধন ভজন সাপেক্ষ। আমাদের তাহা কিছুই নাই। তবে বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে, পঙ্গু যেমন উন্নত শৈল উল্লংঘন করিতে, এবং কাষ্ঠমার্জ্জার যেমন লবণা-[illegible]সেতু বন্ধন করিতে ইচ্ছুক, আমাদিগের ইচ্ছাও তদ্রূপ। আমাদিগের ব্যাখ্যা [illegible]লোচনায় বহু ত্রুটি ও বহু ভ্রম থাকিবে; কিন্তু বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ আমা-[illegible]ত অপরাধ মার্জ্জন করিবেন, এ ভরসা আছে। তবে তাঁহারা যে সমা-[illegible] করিবেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে শিরোধার্য্য করিব এবং শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible]তীয় সংস্করণ হইলে, আপনাদের ভ্রম প্রমাদাদি সংশোধন করিয়া লইব।

প্রথমতঃ। নাম গ্রহণ, নাম জপ বা নামসংকীর্ত্তন। বৈষ্ণব জগতে "শিক্ষাষ্টক" নামে আটটী শ্লোক প্রচলিত আছে। উহা মহাপ্রভুর স্বরচিত বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে উপরুক্ত শিক্ষাষ্টকই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ২০ বিংশতি পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টকের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল॥
প্রভু শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ-প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥"

সজ্জনতোষিণী পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, এই অষ্ট শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্য লইয়া অতি সংক্ষেপে এই অংশের আলোচনা করিব।

পুরাণে কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই জীবের মুখ্য ধর্ম্মসাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—

"সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥" বিষ্ণুপুরাণ।

উভয় বচনের অর্থ ই এক। অর্থাৎ সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নামকীর্ত্তনই যে কলিকালের ধর্ম্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও একাধিক বার দৃষ্ট হয়। যথা :—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

অস্যার্থ। কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিবৎ জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহ যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন।

উপক্রমণিকা।

পুনশ্চঃ— "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোহপি লভ্যতে॥"

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কলিযুগে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা, সর্ব্বার্থ লাভ হয় জানিয়া গুণবেত্তা সারগ্রাহী সাধুরা ঐ যুগের প্রশং… করেন।

আবার নারদীয় পুরাণ দৃঢ়তার সহিত বারংবার বলিয়াছেন ঃ—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-প্রণেতা এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—"অতএ… কলিতে কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, এতদ্ব্যতীত জী… নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই। অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গ… নাই। 'কেবল' শব্দ তিনবার উচ্চারণের দ্বারা, হরিনাম ভিন্ন যে জ্ঞানযোগ, যজ্ঞ এবং তপস্যাদি জীবের আর কিছুই করণীয় নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর হরিনামই মুক্তির একমাত্র উপায়, তাহারই দৃঢ়তা স্থাপন জন্য তিনবার হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে।"

দিব্যোন্মাদ সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়কে কলিতে নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া, উহার উপকারিতা এইরূপে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥"

যদ্দ্বারা মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়; ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; জীবের শ্রেয়োরূপ শুভ্রোৎপলের ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়; যাহা ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ হয়; যাহা বিমলানন্দ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে; যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করে; এবং যাহা মন প্রাণ আত্মাকে পরমানন্দ-রসে অবগাহন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে; সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

এই নাম সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইবার জন্য নামে অনুরাগ হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্ব জীব সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু দ্বিতীয় শ্লোকে নামের শক্তি বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্, তোমার আমার প্রতি এমন করুণা যে, তুমি অধিকারী ভেদে বহুবিধ মুখ্য ও গৌণ নাম প্রচার করিয়া, সেই সকল নামে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। এবং আমরা দুর্ব্বল, সুতরাং দৃঢ় নিয়ম পালনে অসমর্থ হইব বিবেচনা করিয়া, তোমার নাম গ্রহণের কোনও কালাকাল নিয়মিত কর নাই। তোমার এতাদৃশী করুণা সত্বেও আমি এমনই দৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত, যে তোমার সুধাসদৃশ নাম গ্রহণে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

উপরে যে দুর্দ্দৈবের উল্লেখ আছে, তাহা দশবিধ নামাপরাধ* ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যথা,—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

নামাপরাধ-পরিশূন্য হইলেই জীবের নামে রুচি, নিষ্ঠা ও রতি জন্মে। অতঃ-পর নাম গ্রহণের অধিকারী হইবার জন্য সাধককে প্রস্তুত হইতে হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকে সেই অধিকারীর লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অস্যার্থ। যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইলেও আপনাকে তৃণাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করেন; তরু যেমন ছেদনকারীর অত্যাচার সহ্য করে, শুষ্ক হইয়াও কাহার নিকট সলিল প্রার্থনা করে না; বরং সকলকে স্নিগ্ধ ও রক্ষা করে; সেইরূপ যিনি সর্ব্ববিধ শোক তাপ অত্যাচার অপমান নিজে সহ্য করিয়া, অন্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনিই হরিনাম কীর্ত্তনে অধিকারী এবং তাঁহারই নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়।

নাম কীর্ত্তনের অধিকারী হইবার পর, জীবকে বিষয়াভিলাষশূন্য ও কর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া, ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে:—

* সাধুনিন্দা, শ্রীকৃষ্ণের তদ্বিভূতি স্বরূপ অন্য দেবতাতে ভেদ বুদ্ধি, গুরুর প্রতি তাচ্ছিল্য, বেদনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ। নামব্যপদেশে অসৎপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা। অপর মাঙ্গলিক কার্য্যের সহিত হরিনাম তুল্য সমজ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ এবং নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে বীতস্পৃহতা।

উপক্রমণিকা।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী-কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

অন্বয়ার্থ। হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য্যরূপ ধন, পুত্রকলত্রাদি-রূপ জন, ও মনোহারিণী কবিত্বশক্তি, এ তিনের কিছুই চাই না। কিন্তু হে নন্দনন্দন! জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমার প্রতি এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

বিষয়-লালসার প্রলোভন বড়ই প্রবল, অথচ জীব যারপরনাই দুর্ব্বল। ক্রমে ক্রমে জীব বিষম বিষয়-জালে জড়িত হইয়া অপার ও অগাধ ভবজলধি মাঝে নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন তাহার আর স্ববলে উদ্ধারের আশা থাকে না। কাজেই তাহাকে ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে বলিতে হয়, "হে অনাথনাথ! দীনশরণ! আমাকে কেশে ধরিয়া ভবাব্ধি হইতে উদ্ধার কর।" মহাপ্রভু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সাধকের এই অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

"অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

অন্বয়ার্থ। হে নন্দকুমার! তোমার চিরদাস তোমাকে বিস্মৃত হইয়া বিষয়-জালে জড়াইয়া ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সে যতই উঠিতে চেষ্টা করে, ততই তোমার পদপল্লব হইতে দূরে—অতি দূরে নীত হয়। তুমি কৃপা করিয়া তাহাকে তোমার চরণের রেণুকণা করিয়া রাখ। তবেই আমার দাস্যধর্ম্ম সুসাধ্য হইবে; এবং তবেই তোমাকে ভুলিয়া আর বিষয়ের সেবা করিব না।

একান্ত মনে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের নামে রুচি, নামে অনুরাগ ও নামে শ্রদ্ধা হইবে। নামগ্রহণ মাত্র নয়নে অবিরল ধারা বহিবে,—স্তম্ভপ্রলয় প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেহে অভিব্যক্ত হইবে। এইজন্য মহাপ্রভু জীবশিক্ষার্থ বলিতেছেন,—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

অন্বয়ার্থ। হে দীনবন্ধো! কবে তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে আমার নয়ন যুগলে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইবে? কবে ভাবের তরঙ্গে আমার বদনে গদ্গদ ভাষা ও স্বরভঙ্গরূপ বিকার উপস্থিত হইবে? এবং কবে আমার সমস্ত শরীর পুলকাবলীতে কণ্টকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিবে?

মহাপ্রভু এই শ্লোকদ্বারা সঙ্কেতে ইহাও বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, নামগ্রাহী

সাধক যখন যথার্থ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহাতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই পাইবে। তখন সাধক প্রাণবল্লভকে মুহূর্ত্তমাত্র না দেখিলে "যুগশত" মনে করিবেন, সমস্ত সংসার শূন্য দেখিবেন। সপ্তম শ্লোকে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

অস্যার্থ। অহো! গোবিন্দ-বিরহে আমার নিকট নিমেষ যুগবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; বর্ষাধারার ন্যায় চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতেছে; এবং সমগ্র জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে!

সামান্য নায়কের বিরহেই যখন সামান্যা নায়িকা "বাউরী পারা" হয়েন; তখন প্রেমময় প্রেমের আধার নন্দসুতকে যে সাধকরূপ নায়িকা একবার পাইয়াছে, সে কেমন করিয়া তাঁহার বিরহে ব্যাকুল না হইবে? সাধক তখন ভগবৎ-প্রেমে এতই মজিয়াছেন যে, তিনি প্রাণনাথকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, তাঁহারই দ্বারে ভিখারী হইয়া, তাঁহারই প্রেমে নির্ভর করিয়া কহিতেছেন :—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

অস্যার্থ। হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমা বৈ আর কিছু জানি না। ইচ্ছা হয় কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর; অথবা পাদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হও; কিংবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত কর। হে প্রেমলম্পট! আমার যেরূপ বিধান করিলে তুমি সুখী হও, তাহাই আমার স্বীকার্য্য। কারণ, আমি জানি তুমি আমারই প্রাণনাথ, অপর কেহ নহ।

এইরূপে নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের প্রেমদশা উপস্থিত হয় এবং সেই দশায় ভগবানের প্রতি রতি জন্মে। রতির পরিপাকে ভাব, ভাবের পরিপাকে মহাভাবের উদয় হয়। স্বয়ং শ্রীরাধা সেই মহাভাবরূপা, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ। সাধক আপনাকে রাধারূপা ভাবিয়া, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি জ্ঞান করতঃ ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অতএব দেখা যাইতেছে নাম-সংকীর্ত্তনের চরম ফলও যাহা, পঞ্চ রসের সাধনের চরম ফলও তাহাই। প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রথমটী দ্বিতীয়টী অপেক্ষা সুগম ও সহজ-সাধ্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া যে রসরাজ উপাসনা করিতেন, আমরা সম্প্রতি সেই সাধনপ্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু,

উপক্রমণিকা।

পাঠক মহোদয়গণ, প্রারম্ভেই স্মরণ রাখিবেন যে, "রসরাজ উপাসনা" রসের ভজনের শেষ—প্রথম নহে। মাধুর্য্যরস লইয়া রসরাজ উপাসনা করিতে হয়, সেই মাধুর্য্য আর চারিটী রসের পরিপাক। সুতরাং রসরাজ উপাসনার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমতঃ পূর্ব্ব[illegible]য়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমাদিগের কার্য্য সহজ করিবার জন্য [illegible]তামৃত হইতে, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে যে তত্ত্ব বিষয়ে [illegible]য়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"প্রভু কহে কহ [illegible]র নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচ[illegible] সাধ্য হয়॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য [illegible] কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মা[illegible] সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্য সার॥

এই কয়েক পংক্তিতে ভজনের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, সে সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিলে, অর্থাৎ সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম করিলে ভগবানকে

লাভ করিতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের উপর সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া নিজে কর্ম্মশূন্য হইবে। তখন যেমন কর্ম্ম থাকিবে না, তেমন ধর্ম্মও থাকিবে না। কেবল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ হইবে; পরে শুদ্ধভক্তির উদয় হইবে। ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয়ই ধর্ম্মের প্রধান সোপান, ইহাকে শান্তভক্তের সাধন কহে, এই সাধন ব্রজভাবের অতীত। ভক্তি যখন প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তখনই ব্রজ-ভাবে সাধনের আরম্ভ। এই আরম্ভেই দাস্য, দাস্যের পর সখ্য, সখ্যের পর বাৎসল্য, পরিশেষে কান্ত বা মধুর ভাবে ভজন। ইহার উপর আর কিছু নাই। কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখে কান্তভাবের শ্রেষ্ঠতার নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা :—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের ভাব পরে পরে হয়।
এক দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্ব-রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই এক গণনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

এই পঞ্চবিধ সাধন যে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহা পাশ্চাত্য মতের পক্ষপাতী পাঠকগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি ষড়দর্শনেই পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত কএক পংক্তিতে এই পঞ্চতন্মাত্রের যে ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্য-মতানুযায়ী। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত দার্শনিক মতই সাংখ্য-দর্শন হইতে গৃহীত। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি সাধনপ্রণালী বুঝাইবার জন্য রায় রামানন্দ বলিতে-ছেন যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ যেমন পর পর ভূতে বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীতে শেষ হইয়াছে, তদ্রূপ শান্ত, দাস্যাদি রস পর পর রসকে পুষ্ট করিয়া চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র নিত্য পদার্থ। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে, পর পর কল্পনা করিয়া বুঝিতে হইবে। আকাশের গুণ শব্দ। বায়ুর নিজের গুণ স্পর্শ ও আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ। সুতরাং বায়ুর গুণ দুটী, শব্দ ও স্পর্শ। অগ্নি বা তেজের গুণ রূপ, তদ্ব্যতীত আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ ও বায়ু হইতে গৃহীত গুণ স্পর্শ; সুতরাং অগ্নির গুণ তিনটী—রূপ, শব্দ ও স্পর্শ।

অপ বা জলের গুণ রস, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সুতরাং জলের চারিটী গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ক্ষিতি বা পৃথিবীর স্বীয় গুণ গন্ধ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাওয়া গেল :—

(১) আকাশ বা ব্যোম—শব্দতন্মাত্রক।

(২) বায়ু বা মরুত—শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রক।

(৩) অগ্নি বা তেজ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্রক।

(৪) অপ বা জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসতন্মাত্রক।

(৫) ক্ষিতি বা পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রক।

উপরে যেমন আকাশাদি তন্মাত্রের গুণ পর পর তন্মাত্রে সমাহৃত হইয়া, পৃথিবীতে গুণপঞ্চকের একত্র সমাবেশ বা পর্য্যবসান হইয়াছে; বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর শান্ত দাস্যাদির গুণ তদ্রূপ দুই তিন করিয়া চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

উপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি, বংশীশিক্ষায়ও সেই মতের অবতারণা দেখিতে পাই। ইহাতে ভগবানের সহিত জীবের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রজের সম্বন্ধ চতুর্ব্বিধ। যথা :—

"তেইসে সম্বন্ধ ব্রজে চতুর্ব্বিধ হয়।
প্রভু, সখা, পুত্র, কান্ত, মহাজনে কয়॥
তন্মধ্যে উত্তম কান্ত সম্বন্ধ বাখানি।
যার অন্তর্ভূত সদা ত্রি সম্বন্ধ জানি॥
এই লাগি ভাগ্যবান্ জীব সমুদয়।
রসরাজ কৃষ্ণে কান্তভাবেতে ভজয়॥"

বংশীশিক্ষার অপর এক স্থলে এই রস বা সম্বন্ধপঞ্চকের প্রভেদ সুন্দর উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

"শান্ত তামা, দাস্য কাঁসা, সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোণা, শৃঙ্গার রত্ন-চিন্তামণি॥"

এই পঞ্চ রসরূপ ধাতু ভিন্ন ভিন্ন আকরে পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায়ে আকর হইতে সেই পঞ্চধাতু উত্তোলন করিতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীবংশীবদনকে কি বলিয়াছেন, শুনুন :—

"খনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়।
ভাগ্য অনুসারে কিন্তু লাভালাভ হয়॥
মাত্র করমের ফলে তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ সুনিশ্চয়॥
কর্ম্মমিশ্রাভক্তি ফলে রূপা লাভ জানি।
জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ফলে সোণা লাভ মানি॥
সুবিশুদ্ধা ভক্তি প্রেম পিরীতের বলে।
রত্ন-চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চতন্মাত্রের সহিত পঞ্চরসের সৌসাদৃশ্য দেখাইতেছি :—

"কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, শান্তের দুই গুণ।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবাণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রমে গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্য রসের এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রম হীন।
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান॥
বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা দাস্যের সেবন।
সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন॥

সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব পার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করান সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ॥"

যদিও উপরে শান্তের কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তৃষ্ণা ত্যাগ এই দুইটী গুণের উল্লেখ আছে, তথাপি শান্তের প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা, তৃষ্ণা ত্যাগাদি আনুসঙ্গিক। তদ্রূপ দাস্যের প্রকৃত ধর্ম্মসেবা; সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রভৃতি আনুসঙ্গিক। তদ্ব্যতীত শান্ত হইতে গৃহীত গুণনিষ্ঠা। সখ্যের প্রধান ধর্ম্ম আত্মবৎ জ্ঞান বা পূর্ণ বিশ্বাস গৃহীত গুণ নিষ্ঠা ও সেবা। বাৎসল্যের প্রধান ধর্ম্ম পালন; গৃহীত ধর্ম্মনিষ্ঠা সেবা ও আত্মবৎ জ্ঞান। মাধুর্য্যের প্রধান ধর্ম্ম সম্ভোগ বা আত্মসমর্পণ গৃহীত ধর্ম্মনিষ্ঠা, সেবা আত্মবৎ জ্ঞান ও পালন। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাইলাম ঃ—

(১) শান্ত—নিষ্ঠাময়।
(২) দাস্য—সেবা ও নিষ্ঠাময়।
(৩) সখ্য—বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবাময়।
(৪) বাৎসল্য—মমতা (পালন) নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাসময়।
(৫) মাধুর্য্য—আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস ও মমতাময়।

সুতরাং পঞ্চতন্মাত্রেও যাহা দেখিয়াছি, এখানেও তাহাই দেখিলাম। কবিরাজগোস্বামী চরিতামৃতের স্থানান্তরেও এই পঞ্চরসের উল্লেখ ও প্রত্যেক রসের ভক্তদিগের উদাহরণও দিয়াছেন। যথা ঃ—

"ভক্ত ভেদে রস ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি, এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি, রস-পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

শান্তভক্ত নব যোগীন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥
মধুর রসের ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥"

একথা বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত পঞ্চরস অধিকার ভেদে উপাসনা পদ্ধতি মাত্র। সংপ্রতি আমরা এই পঞ্চবিধ সাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই।

ভাগবতাদি পুরাণে শম, দম, ইন্দ্রিয়সংযম, তিতিক্ষা, দুঃখত্যাগ, অমর্ষত্যাগ, জিহ্বাশাসন, জয়, ধৃতি, এই দশটী শান্তভক্তের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থমতে শান্তভক্তের অপর নাম প্রবর্ত্তসাধক। চরিতকার প্রবর্ত্ত সাধকের এই সকল লক্ষণ দিয়াছেন:—দয়া, অকৃতদ্রোহতা, সত্যবাদীত্ব, সারবত্তা, শম, দোষরাহিত্য, বদান্যতা, মৃদুতা, শুচিতা, অকিঞ্চণতা, পরোপকার, শান্তভাব, ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব, নিষ্কামতা, নিরীহতা, স্থৈর্য্য, ষড়রিপুজয়, মিতভোজন, অপ্রমত্ততা, মানহীনকে সম্মান, গাম্ভীর্য্য, কারুণ্য, মৈত্রী, কার্য্যদক্ষতা, মৌনাবলম্বন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ। কবিরাজ গোস্বামী পরিশেষে শান্তভক্ত কে নহে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি স্ত্রীসঙ্গে রত—কামের দাস, তিনি একজন; এবং শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্ত্তন মননে যাহার অভক্তি বা অরুচি, তিনি আর একজন।*

উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা গেল, তাহা আয়ত্ত করা যে কত কষ্টকর, কত কৃচ্ছ্রসাধ্য, কত যোগ ও তপস্যালভ্য, তাহা বাস্তবিকই প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়। যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম অধিকারী মাত্র। সাধক রামপ্রসাদ সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে:—

---

* কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য সার শম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কাব্যদক্ষ, মৌনী॥
অসৎসঙ্গত্যাগী এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ।

"এত ছেলের হাতের মোওয়া নয় মন,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবি।"

সত্য বটে, শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ লাভে মন উন্মত্ত হইলে, সাধক বাধা বিঘ্ন কিছুই মানেন না, শ্রমকষ্ট আয়াস কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় বশীভূত করতঃ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু মনে করিলেই কেহ শান্তভক্ত সাধু হইতে পারে না। নব যোগীন্দ্রগণের তপস্যা, আরাধনা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির সুন্দর কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ কর, দেখিবে, সে কি মহিয়ান অলৌকিক ব্যাপার। আবার স্মরণ রাখিও আজন্ম যোগী, সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমী, নিত্যসিদ্ধ শুক সনকাদি এই শান্তরসেরই রসিক। এত কৃচ্ছসাধ্য যোগ করিয়া, এত ত্যাগস্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদপঙ্কজ ভিন্ন সর্ব্বার্থ তুচ্ছ করিয়া শান্তভক্ত ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু সে ভগবান ঐশ্বর্য্যময়। দেখিলে প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় নাচে, মন মাতে বটে, কিন্তু তাঁহার সামীপ্যলাভে সাহস হয় না। সে রূপরাশি দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সাধক দূরে—সুদূরে—বহুদূরে থাকিয়া সেরূপ দেখেন, আর বলেন ;—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমনী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥" **

অথবা অনুতাপ করিয়া বলেন ;—

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়লু,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, হেরি, কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥" **

পরিশেষে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া বলেন :—

"তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়াপদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥" **

সাধক ভগবানকে পাইতে এপর্য্যন্ত যে অধিকার টুকু পাইয়াছেন, তাহা অতি সংকীর্ণ। কেননা, সাধক ভগবানকে তিন মূর্ত্তিতে দেখিতেছেন,—পাতা,

শাস্তা ও ত্রাতা। কিন্তু নিজের পালক রূপে ভাবিতে পারেন, এতটুকু অধিকারও হয় নাই। সেইজন্য বলিতেছেন ;—

"তুহ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহ মুঞি ছার।" **

অর্থাৎ "তুমি জগন্নাথ, জগতপালক, আমি সেই জগতের একজন, তাই তোমার পাল্য।" দ্বিতীয়তঃ সাধক সমস্ত জীবন পাপ করিয়া হাজতের আসামীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে ভগবানের নিকট মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তৃতীয়তঃ সাধক মুমুক্ষু হইয়া ভবসিন্ধু তরিবার জন্য ভগবানের নিকট তদীয় বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদপল্লব যাচ্ঞা করিতেছেন। এই তিন স্থলেই দেখা গেল, সাধ্যের উপর সাধকের দাবি অত্যল্প। কিন্তু ক্রমে এই দাবি গুরুতর হইবে—সংকীর্ণ অধিকার বিস্তীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাধক যদি কায়মনোবাক্যে ভগবানের দ্বারে পড়িয়া থাকেন, তবে ভক্তবৎসলের দয়া অবশ্যই লাভ করিতে পারেন। তিনি সাধককে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বলেন "বৎস বর গ্রহণ কর।" তখন সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে কহেন "দয়াময়, যদি অধিনকে বরই দান করিবে, তবে এ দাস ধন জন কিছুই চাহে না। চাহি কেবল ঐ চরণে সেবার অধিকার।"

"আর কিছু ধন চাইনা আমি
(কেবল) ঐ চরণ সেবার ভিখারী।" প্রাচীনপদ।

কল্পতরুর দ্বারে ভিখারী বৈমুখ হইল না ; ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল ; ভক্ত সেবার অধিকার লাভ করিলেন। আজ অবধি শান্তভক্ত দাস্যভক্ত হইলেন। সেব্য ও সেবক দূরে দূরে ছিলেন এখন নিকট হইলেন। উভয়ের মধ্যে সমবন্ধ হইল—প্রভু ও ভৃত্য। বিগ্রহ সেবা, শ্রীমন্দির মার্জ্জন, তুলসীতরুতে জলসেচন, সাধু বৈষ্ণব সেবা, তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি দাস্যভক্তের কার্য্য। বিবিধ সেবাদ্বারা যখন প্রভু দাসের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে, সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ট হয়, তখন ভগবান্ ভক্তকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন। ভক্ত তখন সখ্যোচিত ভাবে বিভোর হইয়া বলেন ;—

"মায়ের সোহাগে, ভুলিয়া রহিলি,
মায়ের কোলেতে ভাই।

** বিদ্যাপতি।

মোরা কেন তোর, দুয়ারে ঠারিব ?
নাই কি মোদের মাই ?
হারেরে কানাই, সকলেই মোরা,
আহিরি-গোপ ছাবাল।
তুইত নহিস্, ঠাকুরের পুত,
তবে কাহে ঠাকুরাল ?
কত মারি ধরি, কাঁধে তোর চড়ি,
ঝুট ফল দিই মুখে।
তাই কিরে কানু, যাবিনা গোঠেতে
রহিবি মায়ের বুকে ?"

তখন কটিতটে পীতধড়া, মস্তকে মোহনচূড়া, গলে গুঞ্জহার ও হস্তে পাঁচনি খানি লইয়া সখা রাখালগণের আগে আগে গোষ্ঠে না যাইয়া কি রাখালরাজের আর সাধ্য আছে ? এখানে ঐশ্বর্য্য নাই, বিভূতি নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই, এখানে সব সমান। এখানে অভিমানের কথা "তুই মায়ের কোলে বসিয়া থাকিবি, আমাদের কি মা নাই ?" এখানে দেমাগের কথা "আমরা সব গোয়ালার ছেলে, আর তুই বুঝি ঠাকুর পুত্র ?" এখানে আদর—ভালবাসা, "মারা, ধরা, কাঁধে চড়া" আর অর্দ্ধভুক্ত মিষ্টফল শ্রীভগবানের শ্রীমুখে অর্পণ। গোপকুমারগণ শ্রীগোপালকে মুখে আদরমাখা গালি দেয় বটে ; কিন্তু অন্তরে "ভাই কানাইয়ের" প্রতি কত যে মমতা, তাহা কবি ভিন্ন কে জানিবে ? তাই রাখালের মুখে শ্রীগোবিন্দ দাস কহিয়াছেন :—

"যদিবা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান
এক তিল না দেখিলে মরি॥"

আহা ! সখ্য প্রেমের কি মধুর ভাব ! কি অতুল ভক্তিযোগ ! কি অপ্রতিম প্রেম !! ব্রজগোপালের প্রতি ননীরগোপালের এই একরূপ সখ্যভাব ; পক্ষান্তরে অর্জ্জুনাদির প্রতি যদুনন্দনের কি অন্যরূপ প্রগাঢ় সখ্যভাব ! বিপদে, সম্পদে, আহবে, শান্তিতে, বনে, রাজপ্রাসাদে, শ্রীহরি সর্ব্বত্র পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবের সুহৃৎ, পাণ্ডবের মন্ত্রী, পাণ্ডবের বুদ্ধিবল। পাণ্ডবজায়া যাজ্ঞসেনী বাঁধিয়াছিরে ভগবানকে সখ্যপ্রেমে—যে প্রেমের তুলনা নাই, যে ভক্তি অদ্বিতীয়া, বৈ

অচলা! দুর্মতি দুঃশাসন রাজ সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত, দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে—কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন :—

"হা কৃষ্ণ! দ্বারকানাথ! কেশীঘ্ন! যদুনন্দন!
মথুরেশ! হৃষিকেশ! ত্রাতা ভব জনার্দ্দন!"

আর ভক্তবৎসল বস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণার লজ্জা নিবারণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির ভীষণ কোপানলে পাণ্ডবগণ পতঙ্গবৎ দহনে উদ্যত; ডাকিলেন পাঞ্চালি কাতর প্রাণে, আর অমনি প্রাণসখা উপস্থিত হইয়া সখাগণকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিলেন। সখ্যপ্রেমের যে কত প্রভাব তা আর কত কহিব?

এই সখ্যপ্রেমের পরিপাকে বাৎসল্য প্রেমের উৎপত্তি। সখ্যের মূলসূত্র বিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান, এই দুইটী গাঢ় হইয়া বাৎসল্য আকার ধারণ করে। ভগবান সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থায় ভক্তাধীন বটেন, কিন্তু বিশেষরূপে অধীন বাৎসল্য প্রেমিকের। এখানে :—

"একি আশ্চর্য্য কথা, শিষ্যের পায় গুরুর মাথা,
গাছের গোড়ায় ধরে ফুল।
পিতা পুত্ত্রেরে ভজে, শিষ্য গুরুকে যজে,
আউলচাঁদ ভাবিয়া আকুল॥

এই যে গানটী ইহা প্রহেলিকা নহে—ইহা একটী আউল বা বাউলের তর্জ্জা। বাৎসল্যরসে বাস্তবিকই জগৎ-পিতা পুত্র, আর জগদ্‌গুরু শিষ্য; আর সামান্য রক্তমাংস বিশিষ্ট মানব পিতা ও গুরু। বিশ্বপালক এখানে পাল্য, আহিরী ও আহিরিণী পালক। যাঁহার রচিত কর্ম্মসূত্রে ব্রহ্মাদি দেবগণও ত্রিভুবন নিয়ত নাচেন, সেই বিশ্বনিয়ন্তা নন্দের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচেন, আর নন্দরাণী হাততালি দিয়া বলেন :—

"ফিরে ঘুরে তেমনি করে নাচরে যাদুধন।
হেলে দুলে বাঁকা হৈয়া নাচরে যাদুধন।
পায়ের উপর পাটী থুয়ে নাচরে যাদুধন।
উদর ভরে খেতে দিব নবনী মাখন।"

যিনি দামোদর—"ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে"—তিনি কিনা ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে সামান্য ক্ষীরসরের নিমিত্ত নৃত্য করেন! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর কি ভক্তবাৎসল্য! গোয়ালার মেয়ের কি পুণ্যপ্রভাব! কি অপূর্ব্ব অপার্থিব ভক্তির জোর!!

বালগোপালের একটানে পূতনা সংহার—কোমল অঙ্গের এক আঘাতে শকট-

লার্জ্জুন ধরাশায়ী—এক কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের স্থিতি—এক পদাঘাতে কালিয়নাগের দমন! বাৎসল্যের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মাতা যশোমতি এমন যে বস্তু তাঁহাকে বালক জ্ঞান করেন। পাছে বা গোপাল বনে ক্ষুধায় কাতর হয়েন এই জন্য :—

"গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি,
পীঠে দিল পাট কি ডোর।
ধড়ার আঁচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী,
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥"

আরও, ভগবান যেন আমার গোপালকে রক্ষা করেন, এই বলিয়া মাতা বালকের শিরে রক্ষাবন্ধন করেন, তাঁহার মস্তকে—যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত-পাবনী গঙ্গার উৎপত্তি—যাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শে পাষাণমানবী—তাঁহার মস্তকে স্বীয় বাম পদধূলি অর্পণ করেন। কি ভীষণ—ভয়ানক—বিশাল অধিকার!! আবার অপরদিকে দেখ, নন্দরাজের সাধন বলইবা কত! যাঁহার বিপদভঞ্জন নামে স্তূপীকৃত বিঘ্ন বাধা বিদূরিত হয়, সেই ভগবানের দ্বারা আপনার চরণের কাষ্ঠের বাধা বহাইয়া ছিলেন! সখ্যপ্রেমে ভগবান অর্জ্জুনের রথের সারথী—কিন্তু বাৎসল্যে তিনি পদানত ভৃত্য! এই বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠাই কান্ত বা মধুর ভাব।

এই মধুর ভাবের উপাসক একদিকে দ্বারকাবাসিনী রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, অপরদিকে ব্রজবাসিনী গোপবধূগণ! ভগবানে রতি স্বকীয়া ও পরকিয়া ভেদে দ্বিবিধ। মহিষীগণের রতি স্বকীয়া ও ব্রজগোপীগণের রতি পরকিয়া। গোস্বামী-গণ স্বকিয়া অপেক্ষা পরকিয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেননা, পরকিয়া প্রেমে গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা অধিকতর। গোপী প্রেমের শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ, উহা নিষ্কাম, কিন্তু মহিষীদিগের প্রেম সকাম। অর্থাৎ মহিষীগণ আত্ম সুখেচ্ছা প্রণোদিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ—সম্ভোগে অভিলাষিণী ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রজবধূগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ-মানসে বনে বনে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেন। গোপীগণ যে অঙ্গরাগ প্রভৃতি করিতেন, তাহাও ভগবানের সন্তোষবিধান নিমিত্ত, নিজের সুখের জন্য নহে। এই জন্যই পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ গোপিকার প্রেমকে কামান্ধহীন বলিয়া বারংবার বর্ণন করিয়াছেন।

আমরা যে উপরে "কাম" ও "প্রেম" দুইটী কথার উল্লেখ করিয়াছি, সে দুটীতে স্বর্গমর্ত্য প্রভেদ। কেননা, "কাম অন্ধতম," "প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

কবিরাজ-গোস্বামী নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে এতদুভয়ের সুন্দর তুলনা করিয়াছেন :—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্ম সুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
শুভ্র ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥"

মাধুর্য্যরসের ধর্ম্ম পতি পত্নীর ভাব—এই ভাব আধ্যাত্মিক, শারীরিক নহে। সাধক আপনাকে পত্নী জ্ঞান ও ভগবানকে পতিজ্ঞান করিয়া ভাগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবেন। এই মধুর প্রেম গুহ্যাদি গুহ্য, ইহা দুই চারি কথায় বুঝিবার বা বুঝাইবার সাধ্য কাহারও নাই। যাঁহারা কঠোর সাধনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এ ধর্ম্ম বুঝিবার ও যাজন করিবার অধিকারী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া এই ধর্ম্মেরই যাজন ও উপদেশ করিয়াছেন। এ ধর্ম্মে স্ত্রীপুরুষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালকবৃদ্ধ সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার। যে গুরূপদেশ লইয়া অন্বেষণ করিবে, সেই এই সাধনমার্গে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিবে। যাঁহারা মধুর ভজনের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে কায়োমনোবাক্যে প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইতে হইবে; পুরুষদেহ ত্যাগ না করিলে, অর্থাৎ আমি পুরুষ এই জ্ঞান বাক্যে, মনে, কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, প্রকৃতি ভাবাপন্না না হইলে, এ সাধনের কেহই অধিকারী হইতে পারেন না। আর একটী কথা। মধুর ভজনের অপর নাম, গোপীভাবে ভজন, অর্থাৎ এক-মাত্র ব্রজগোপীগণই এ ভজনের অধিকারিণী; সুতরাং মধুর ভজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ প্রাপ্তির ঐকান্তিকী ইচ্ছা যে জীবের মনে হইবে, তাঁহাকে কোন ব্রজসখীর অনুগা হইয়া সাধন করিতে হইবে। শ্রীমৎশ্যামানন্দ শ্রীললিতা-সখীর

চরণ প্রসাদে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ললিতা বিশাখাদি প্রধানা সখীগণের আশ্রয় প্রাপ্তি সামান্য সৌভাগ্যের কার্য্য নহে। সাধারণ সাধকদিগকে শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী প্রভৃতি কোন মঞ্জরীর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহা-দিগের কৃপালাভ করিতে পারিলে, পরে ললিতাদি প্রধানা কোন সখীর কৃপালাভ করা যায় এবং তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ লাভ হইতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবনীতে অবতীর্ণ না হইলে, কোন জীবই মধুর রসের আস্বাদ পাইত না। শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গসহ নবদ্বীপধামে প্রকট হইয়া ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। অধুনা সাধু বৈষ্ণবগণ সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া জীবের মহোপকার করিতেছেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের বিজয় পতাকা আজ দেশ বিদেশে এমন কি সুদূর মার্কীর্ণ দেশে পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইতেছে।

এই সংগ্রহে শ্রীগৌরাঙ্গের যে সকল পরিকর ও ভক্তের উল্লেখ আছে; নিম্নে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

অচ্যুতানন্দ।—ইনি শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ও মহাপ্রভুর অতি অন্ত-রঙ্গ ভক্ত। অতি শৈশবে অচ্যুতানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ইনি বহুদিন নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অচ্যুতের ধর্ম্মমত বৈষ্ণব-জগতে যারপর নাই আদরণীয়; এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন;—"অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার।"

অজামিল।—এই ব্যক্তি এতই মহাপাপী ছিল, যে তাহার রসনায় ভগবানের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইত না। ইহার পুত্রের নাম ছিল "নারায়ণ"। এই পুত্রকে বারংবার ডাকিতে ডাকিতে এই মহাপাপীর উদ্ধার হয়। অনেক ভজন সঙ্গীতে অজামিলের নাম প্রবাদবাক্য স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য্য।—আনুমানিক ১৩৫৫ শকাব্দে * শ্রীহট্ট লাউড়ে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কুবের পণ্ডিত ইহার পিতা এবং নাভাদেবী ইহার মাতা ছিলেন। ইনি প্রথমে কমলাক্ষ নামে একজন ঘোর বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। পদ্মপুরাণ মতে ইনি মহাদেব ও মহাবিষ্ণুর অবতার। কথিত আছে ইহার অর্চ্চনা ও হুঙ্কারে

---

* আচার্য্য আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া লাগি ধরাধামে এদাস আইল॥"

১৪০৭ হইতে ৫২ বাদ দিলে অদ্বৈতের জন্মাব্দ হইল ১৩৫৫ শক।

শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন। কোন কোন পদে ইঁহাকে "শান্তিপুরের বুড়ামালী" বলা হইয়াছে। লাউড়ের জনৈক রাজার নাম দিব্যাসিংহ ছিল। যাঁহার বৈষ্ণবী নাম লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। কুবের পণ্ডিত এই নৃপতির মন্ত্রী ছিলেন। আচার্য্যের বংশ প্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সম্রাট রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। এই নাড়িয়াল বংশে জন্ম হেতু মহাপ্রভু আচার্য্যকে "নাড়াবুড়া" বা শুধু "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন ইনি তপস্যা বলে ভগবানকে বৈকুণ্ঠ হইতে নাড়িয়া ছিলেন বলিয়া ইঁহার "নাড়া" নাম। আবার কেহ কেহ বলেন অদ্বৈতের মাথা টাক পড়া ছিল, এইজন্য "নাড়া" নাম। অদ্বৈতের উপাধি ছিল "বেদ পঞ্চানন"। অদ্বৈতের দুই স্ত্রী, সীতা ও শ্রী; ছয় পুত্র, অচ্যুত, বলরাম, কৃষ্ণমিশ্র ইত্যাদি। অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থ মতে অদ্বৈতের ছয়জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, নাম লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীহরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীর্ত্তিচন্দ্র।

অদ্বৈতের জন্মমাস মাঘ, তিথি সপ্তমী। ঈশান নাগর বলেন:—

"সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥"

তাহা হইলে ১৪৮০ শকে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বৎসর পর, শান্তিপুরে আচার্য্য তিরোহিত হয়েন। লাউড় হইতে আচার্য্য শ্রীহট্ট নবগ্রামে পরিশেষে শান্তিপুরে আসিয়া বসতি করেন। মহাপ্রভু কতকদিন আচার্য্যের নিকট পড়িয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। লোকনাথ গোস্বামী সীতাদেবীর জীবনী লিখেন; উক্ত গ্রন্থের নাম "সীতা চরিত্র"। নরহরি দাস অদ্বৈতের যে চরিত্র লিখেন, তাহার নাম "অদ্বৈতবিলাস"।

অনুপ।—ইনি শ্রীরূপসনাতনের সহোদর, কুমারদেবের পুত্র এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। ইঁহার অপর নাম অনুপম।

অনন্তদাস—(১) অদ্বৈত শাখা বিশেষ। নীলাচল যাইবার সময় মহাপ্রভুর সহিত গঙ্গাতীরস্থ আঠিসারা গ্রামে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি দর্শন মাত্র মহাপ্রভুর চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করেন। (২) অনন্ত আচার্য্য ও অদ্বৈত শাখা।

অভিরাম গোপাল।—ইনি শ্রীমতী রাধার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বাপরের সেই শ্রীদাম সখা। ইনি পূর্ব্বদেহে গৌরাঙ্গ অবতারে বর্ত্তমান ছিলেন। ৺জগদীশ্বর গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহা নহে। 'অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অভিরাম গোপালকে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং না আসিয়া শক্তি সঞ্চার দ্বারা রামদাসের প্রকাশ করেন। রামদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধামে আগমনপূর্ব্বক নৃত্যকীর্ত্তনে জগতমোহিত ও পাষণ্ড দলন করেন। অভিরামের স্বরূপ রামদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত কিন্তু স্বয়ং অভিরাম শ্রীচৈতন্যের শাখা। যথা :—

"অভিরাম মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলশাঙ্গের কাষ্ঠতুলি যে করিল বাঁশী॥" চৈ-চ।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অভিরামের মুরলীবাদন সম্বন্ধে লেখা আছে :—

"এক দিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্ত্তন সে ভঙ্গিমা অনুপম॥
সখ্য রসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে নিজবংশী নাহি পায়॥
শতাবধি লোকে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে॥"

খানাকুল কৃষ্ণনগরের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আদিপুরুষ "স্মৃতি সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীধামে যে শ্লোক দ্বারা আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতেছি যে, যে কাষ্ঠে অভিরাম মুরলী করেন, তাহা অতিব গুরুভার ছিল। যথা :—

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যত্রাভিরামো মহান্,
গোস্বামী শতবাহ্য দারু মুরলীং কৃত্বা সমাবাদয়ন্।
যং ক্রুয়ুব্রজবাসি বৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্তবৃন্দাবনম্,
তস্মিন শ্রীমতী চারু কৃষ্ণনগরে বাসো মদীয়োঽধুনা॥"

অ, লী, ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

অভিরাম লীলামৃতে আরো দেখা যায় যে, ঐ কাষ্ঠ পূর্ব্বাবতারে সকল গোপবালকগণের মুরলী সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে। অভিরাম পত্নী শ্রীমতী মালিনী ঠাকুরাণী ঐ কাষ্ঠ এক অঙ্গুলীদ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের মধ্যে কাজীপুর নামে এক গ্রাম ছিল; অভিরাম গোস্বামীর আগমনের পর ঐ কাজীপুর শ্রীপাঠ খানাকুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। অভিরাম লীলামৃত ও অভিরাম পটল নামক গ্রন্থদ্বয়ে অভিরাম গোপাল ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী মালিনী ঠাকুরাণীর নানা অদ্ভুতকাহিনী বর্ণিত আছে।

আত্মারাম দাস—পদকর্ত্তা, শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। শ্রীখণ্ডগ্রামে অম্বষ্ঠকুলে ইহার জন্ম। ইহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী দাসী ছিল।

ঈশ্বরপুরী—ইনি একজন পরম প্রেমিক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্র শিষ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু। ইহার জন্মস্থান কুমারহট্টে ছিল।

ঈশান—(১) মহাপ্রভুর গৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিলে, ঈশান শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে যখন নবদ্বীপ গমন করেন, তাহার অব্যবহিত পরই ইহার অপ্রকট হয়। (২) ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রভুর পালক পুত্র ও শিষ্য। ইনি "অদ্বৈতপ্রকাশ" রচয়িতা। ঈশান সীতা দেবীর আদেশক্রমে ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দারপরিগ্রহ করিয়া পদ্মানদীর তীরস্থ তেওতা সান্নিধ্য ঝাঁকপাল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তেওতার রাজ পরিবার ও তত্রত্য বাগছি মহাশয়েরা নাগরবংশীয়দিগের শিষ্য। ঈশান নাগরের পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ নামে তিন পুত্র জন্মে। ঈশান নাগর বহু বর্ষ লাউড়ে থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম প্রচার করেন। এবং স্বীয় গুরু অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশে অদ্বৈত প্রকাশ প্রণয়ন করেন। ১৪৯০ শকে অদ্বৈত প্রকাশ সমাপ্ত হয়। অদ্বৈত প্রকাশে যথা ঃ—

"চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥"

১৪১৪ শকে অচ্যুত ও ঈশান নাগর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ইহার মাতা আচার্য্যের আশ্রয় লন।

উদ্ধারণ দত্ত—"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ" নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ শাখার অন্যতম। ইনি কৃষ্ণলীলার সুবাহু গোপাল ছিলেন। ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রাম ইহার জন্মস্থান। কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নবহট্ট বা নৈহাটী নগর ছিল। ইহার রাজার নাম ছিল নৈরাজা, ইনি ঝামটপুরের সন্নিহিত রসডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ধারণ দত্ত এই নৈরাজার দেওয়ান ছিলেন, এবং যে গ্রামে তিনি সেই সময়ে বাস করিতেন, তাহার নাম উদ্ধরণপুর, উহা নৈহাটীর উত্তরে অবস্থিত। উদ্ধরণপুর বৈষ্ণবদিগের একটী প্রসিদ্ধ পাট। এই স্থানে উদ্ধারণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে দত্ত মহাশয়ের সমাধি এবং পূর্ব্বদিকে একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। প্রবাদ আছে যে যখন মহাপ্রভু এই গ্রামে আগমন করিয়া দত্ত মহা-

শয়কে কৃতার্থ করেন, তখন তিনি ঐ নিম্ববৃক্ষমূলে বসিয়াছিলেন। উদ্ধারণ পুরের অব্যবহিত দক্ষিণে "বেণেপাড়া" নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে, এখানে দত্ত মহাশয়ের স্বজাতি অর্থাৎ সুবর্ণবণিকগণ বাস করিতেন। বদনগঞ্জ নিবাসী ৺ হারাধন দত্ত "ভক্তিনিধি" মহাশয় উদ্ধারণ দত্তের বংশধর ছিলেন।

কাশীমিশ্র—জগন্নাথদেবের প্রধান সেবক ও রাজা প্রতাপরুদ্রের ইষ্টদেবতা ছিলেন। পুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য ইহারই গৃহে বাসা করিয়াছিলেন।

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী—ইনিও কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর-পুরীর প্রিয় কিঙ্কর ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর, তাঁহারই পূর্ব্বাদেশ ক্রমে উভয়ে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবক নিযুক্ত হয়েন। গুরুর ভৃত্য বলিয়া শ্রীচৈতনা উভয়কে অত্যন্ত সমাদার করিতেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর অঙ্গসেবা করিতেন; আর মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, তখন বলশালী কাশীশ্বর দুই হস্তে লোক সরাইয়া প্রভুর পথ করিয়া দিতেন। যথা :—

"ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা। নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে। তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর। জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোসাঞী মনুষ্য গহনে। লোক ঠেলি পথ করে কাশীবলবানে॥"

চৈ, চ, আদি।

কালিয়া কৃষ্ণদাস—পাতাই হাটের উত্তরে আকাই হাট গ্রামে ইহার পাট। এখানে তাঁহার সমাধি আছে; ঐ সমাধির পশ্চিমে নূপুরকুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ইনি কায়স্থ ছিলেন।

কুবের পণ্ডিত—অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা।

কৃষ্ণদাস—এই নামে অনেক মহাত্মার নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে পদকর্ত্তা-দিগের পরিচয়ে (১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ (২) দুঃখী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ (৩) দীন কৃষ্ণদাসের বিবরণ দ্রষ্টব্য। তদ্ব্যতীত যে কয়েকজন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহার এই স্থলে উল্লেখ হইল। প্রথমে মহাপ্রভুর শাখা গণনায় (১) "অকিঞ্চন প্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস নাম।" (২) কৃষ্ণদাস বৈদ্য (৩) "কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।" দ্বিতীয়তঃ নিত্যানন্দ শাখা গণনায়ঃ—(১) সূর্য্যদাস সরখেলের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস (২) দ্বিজবর কৃষ্ণদাস, রাঢ় দেশবাসী (৩) বৈষ্ণব প্রধান কালাকৃষ্ণদাস (৪) নারায়ণ, দেবানন্দ, ও মনোহরের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস (৫)

বিহারী কৃষ্ণদাস, ইনি নিত্যানন্দ-গত-প্রাণ ছিলেন ; নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কাহা-কেও মানিতেন বা জানিতেন না। তৃতীয়তঃ অদ্বৈত শাখা গণনায়ঃ—আচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র, ইনি কৃষ্ণমিশ্র নামে খ্যাত। চতুর্থতঃ গদাধর পণ্ডিত শাখায় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। এই সকল ব্যতীত "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস"। ইনি দিব্যসিংহ নামে লাউড়ের রাজা ছিলেন। ইহাঁর রচিত গ্রন্থ অদ্বৈতাচার্য্যের "বাল্যলীলা"। ইনি ৪৫০ বৎসরের লোক।

কংসারী সেন—প্রভু নিত্যানন্দের পরিকর, জাতিতে বৈদ্য।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। নবদ্বীপ মধ্যবর্ত্তী বিদ্যানগরে ইহাঁর এক চতুষ্পাঠী ছিল, সেই টোলে নিমাই, গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত বহু দিন অধ্যয়ন করেন।

•গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—গামিলা-নিবাসী ও ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য।

গরুড় পণ্ডিত—কথিত আছে ইনি নামবলে সর্পবিষে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যথাঃ—

"গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল।
নাম বলে বিষ যারে না করিল বল॥" চৈ, চ।

গজপতি প্রতাপরুদ্র—মহা যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজা। খৃষ্টাব্দ ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইহার প্রতাপে পাঠানেরা সর্ব্বদা ভীত ছিল। ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন ; পরে কাশীমিশ্রের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত—ইনি পূর্ব্বাবতারে শ্রীমতী রাধিকা ছিলেন। ১৪০৮ শকে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের এক বৎসর দুই মাস পরে, চট্টগ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতীর গর্ভে গদাধরের জন্ম। রত্নাবতীর নামান্তর নবকুমারী ও দুঃখিনী। গদাধরের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বেলেটী গ্রামে বাস করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে মাতুলালয় নবদ্বীপে আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর সমকালে কান্দিভরতপুর গ্রামে সুররাজনামে একজন ধনবান্ ব্যক্তি গদাধরকে বেলেটী হইতে আনয়নপূর্ব্বক ভরতপুর গ্রামে স্থাপন করেন। পরে ভরতপুর হইতে গদাধর নবদ্বীপ যাইয়া বাস করেন। চট্টগ্রাম হইতে ঢাকার বেলেটী গ্রামে, এবং বেলেটী হইতে মুরশিদাবাদ, কান্দিভরতপুরে এবং ভরতপুর হইতে নবদ্বীপে শিশু গদাধরের আগমন কি সূত্রে হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আর

এই সকল কথা জনশ্রুতিমূলক না বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সম্মত, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। গদাধর অকৃতদার ও আকুমার বৈরাগী। ইনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্ত্র-শিষ্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সতীর্থ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচল গমন করিলে, গদাধর তাহার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ১৪৫৫ শকে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১১ মাস পর জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমে পণ্ডিতের তিরোভাব হয়। গদাধরের ভ্রাতা বাণীনাথ বিবাহ করেন। বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ, তাঁহার পুত্র শ্রীবল্লভ; শ্রীবল্লভতনয় রামনাথ; রামনাথের পুত্র রাধাবিনোদ; রাধাবিনোদাত্মজ কুমার কমলচন্দ্র।

গদাধর দাস—চৈতন্যচরিতামৃতের দশম পরিচ্ছেদে ইহার এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

"শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি। কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥"

ইহার নিবাস এঁড়িয়াদহ গ্রামে ছিল। স্বগ্রামস্থ কাজীগণকে ইনি হরিভক্ত করিয়া তুলেন। প্রভু নিত্যানন্দের শাখা গণনায় আর এক গদাধর দাসের উল্লেখ আছে। যথাঃ—

"গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যার ঘরে দানলীলা কৈলা নিত্যানন্দ॥"

গোকুলানন্দ—(১) দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য (২) পদ-কল্পতরু-গ্রন্থের সংগ্রাহক বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেন। (৩) ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য যাজীগ্রামবাসী গোকুল সেন একজন প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ইহাঁর কথা নরোত্তমবিলাসে এইরূপ আছেঃ—"শ্রীগোকুল গায় বর্ণ বিন্যাস মধুর। হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥" (৪) শ্রীবীর হাম্বির ভূপতির সমকালে বনবিষ্ণুপুরে এক গোকুল দাস মহান্ত ছিলেন। (৫) ভক্তিরত্নাকরে এক গোকুল দাসের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছেঃ—"পঞ্চকূটে সেরগড় বাসী শ্রীগোকুল। পূর্ব্ববাস রাঢ়েই কবীন্দ্র ভক্তাতুল॥"

গোপাল দাস—আমরা ১১ জন গোপাল দাসের নাম পাইয়াছি। তন্মধ্যে বোধ হয়, শেষজন পদকর্ত্তা। (১) চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উপশাখায় এক গোপাল দাসের উল্লেখ আছে যথাঃ—"রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।" (২) ঐ গ্রন্থের ঐ পরিচ্ছেদে (১০ম) গোপাল আচার্য্যের উল্লেখ আছে। (৩) কাঞ্চন পড়িয়া নিবাসী গোপাল দাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য (৪) গোপাল নামে অদ্বৈতা-চার্য্যের এক পুত্র ছিলেন। নরোত্তম বিলাসের দুইস্থানে ইহাঁর উল্লেখ আছে। যথাঃ—"অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপাল প্রেমময়।" পুনশ্চ "অচ্যুতানন্দের অনুজ

শ্রীগোপাল।" (৫) বিশ্বকোষকার বলেন,—"গোপাল দাস ভক্তিরত্নাকর নামক বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত হয়। (এই ভক্তিরত্নাকর) ঘনশ্যাম বিরচিত গ্রন্থ হইতে অবশ্য ভিন্ন। (৬) কর্ণানন্দে এক গোপাল দাসের কথা এইরূপ আছে। যথাঃ—"বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস। প্রভুর সেবক হয় অতিশুদ্ধভাষ॥" (৭) রাজা বীর হাম্বিরের পুত্র ধীর হাম্বিরের বৈষ্ণবনাম গোপাল দাস। (৮) নরোত্তমবিলাসে এক গোপাল দাস এইঃ—"নর্ত্তক গোপাল জিতামিত্র বিপ্রবর্য্য।" (৯) নরোত্তম বিলাসের অন্যত্র আর এক গোপালের কথা এইঃ—"শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার।" (১০) নরোত্তম বিলাসের শেষভাগে আর এক গোপালের এইরূপ বর্ণনা আছেঃ—"কোমর পুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। সকল লোকেতে যার গায় গুণকীর্ত্তি॥" (১১) কর্ণানন্দ গ্রন্থে কবি গোপাল দাসের কথা এইরূপ আছেঃ—"শ্রীগোপাল দাস প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাই লেখা॥ বুধই পাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া। যাঁহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥"

গোপাল ঠাকুর—নামান্তর চাপাল গোপাল। এ ব্যক্তি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কুলিয়া গ্রামবাসী হিরণ্যদাসের গৃহে আরিন্দা ছিল। যবন হরিদাসকে অবজ্ঞা করাতে ইহার কুষ্ঠরোগ হয়। মহাপ্রভু যখন কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার কৃপায় এই কুষ্ঠরোগী উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

গোপীকান্ত—(১) রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্য্যের পুত্র। ইনি পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং পিতার ন্যায়ই কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন। (২) মহাপ্রভুর উপশাখায় আর এক গোপীকান্তের নাম দৃষ্ট হয়।

গোপাল ভট্ট—ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। ১৪২৫ শকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভট্টমারি গ্রামে বেঙ্কট ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। যখন গোপালের বয়ঃক্রম ত্রিশবৎসর, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমন করেন; এবং তদুপলক্ষে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভু গোপাল ভট্টের আবাসে চারি মাস অবস্থিতি করিয়া চাতুর্ম্মাস্য করেন। এবং তাঁহারই আদেশে এবং শক্তি-সঞ্চার-প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাইয়া ৪৫ বৎসর বাস করেন। ইনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ও রাধারমণ বিগ্রহ সেবা প্রকাশক। ১৫০০ শকে ইহার তিরোভাব হয়, শ্রীবৃন্দাবনধামে ইনি রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের নামান্তর ভক্তিবিলাস গ্রন্থ।

গোপীনাথ—এই নামে তিনজনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (১) গোপীনাথ সিংহ চৈতন্যের জনৈক দাস। মহাপ্রভু ইঁহাকে "অক্রূর" বলিয়া পরিহাস করিতেন। (২) গোপীনাথাচার্য্য শ্রেষ্ঠ কুলীন, পরম পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি (৩) গোপীনাথ পট্টনায়ক রায় রামানন্দের ভ্রাতা।

গোবর্দ্ধন দাস—এই নামে আমরা চারিজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। (১) কবি রাধাবল্লভ দাস একটী পদে গোবর্দ্ধন দাসকে রঘুনাথ দাসের পিতা ও চাঁদপুর গ্রামবাসী বলিয়াছেন। ইহাঁর গৃহে যবন হরিদাস বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। (২) জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তা। ইনি ১৭০০ শকের লোক বলিয়া বিখ্যাত। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য কবি গোবর্দ্ধন দাস। ইহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন "গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্ব্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় প্রীত।" আবার নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ বলেন "জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্। যেঁহ সব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥" (৪) রসিকমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক গোবর্দ্ধন দাস শ্রীমৎশ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

গোবিন্দদাস—গোবিন্দ নামে আমরা অনেকের নাম পাইয়াছি। (১) ঈশ্বর পুরীর পূর্ব্বভৃত্য মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক মহাভাগবত গোবিন্দানন্দ, জাতিতে শূদ্র ছিলেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া; তাঁহার সন্তোষ প্রদান করিতেন। ইহার ন্যায় ভাগ্যবান্ শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত মধ্যে অতি অল্প লোক ছিলেন। চৈতন্য ভাগবৎ ও চৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বত্র এই গোবিন্দের কাহিনী রহিয়াছে। (২) মহাপ্রভুর প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্ত, ইনি একটী পদে আপনাকে "গরীশ্বর" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (৩) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ইহার নিবাস ঝামটপুর গ্রামে ছিল। (৪) বোরাকুলী নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ইনি একজন পদকর্ত্তা। ইহাঁর বিষয় স্বতন্ত্র প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। (৫) বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ, ইনিও একজন কবি ও সুগায়ক, ইহাঁর বিষয়ও স্বতন্ত্র প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। (৬) বুধরী গ্রামবাসী রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পদকর্ত্তা। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত জীবনী দ্রষ্টব্য। (৭) গতিগোবিন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র ও পদকর্ত্তা, স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইহার বিষয় দ্রষ্টব্য। (৮) নিত্যানন্দ শাখায় এক গোবিন্দ কবিরাজের নাম আছে। (৯) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী (১০) মৈথিলী গোবিন্দ দাস (১১) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর

শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ (১১) গোবিন্দ আচার্য্য (১২) ৺হারাধন দত্ত ভক্তি-নিধির মতে বাঘনাপাড়াবাসী পদকর্ত্তা এক গোবিন্দানন্দ ছিলেন। (১৩) কাঞ্চন-নগর-নিবাসী কড়চা-লেখক কর্ম্মকার-কুলোদ্ভব গোবিন্দ দাস। ইনি স্ত্রী দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হয়েন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে দুই বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া গোবিন্দ দাস যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাই কড়চায় লিপিবদ্ধ করেন।

গৌরসুন্দর—জনৈক পদকর্ত্তা, ইহার বিষয় কিছুই জানা যায় নাই।

গৌরীদাস—এই নামে দুইজন পদকর্ত্তা আছেন। (১) পণ্ডিত গৌরী দাস, ইহার নিবাস ছিল অম্বিকা কালনায়। ইনি মুখটী বংশজাত বরুণ বাচস্পতির বংশধর। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, পূর্ব্বাবতারে ইহার নাম ছিল সুবল। ইহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র, মাতার নাম কমলাদেবী। ইহারা ছয় ভ্রাতা ছিলেন :—(১) দামোদর পণ্ডিত (২) জগন্নাথ (৩) সূর্য্যদাস (৪) গৌরীদাস (৫) কৃষ্ণদাস (৬) নৃসিংহ চৈতন্য। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস শালিগ্রামে ছিল। মহাপ্রভু ইহাকে প্রসাদস্বরূপ এক বৈঠা প্রদান করেন। ইহার অপ্রকটের পর ইহার শিষ্য ও পৌত্রীপতি হৃদয়চৈতন্য ঐ বৈঠা প্রাপ্ত হয়েন। হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দপুরী সমগ্র উড়িষ্যা দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। গৌরীদাসের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর ও নিত্যানন্দের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর ছিল। ইনি অম্বিকাস্থিত গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণববন্দনায় ইহার বিষয় এইরূপ লেখা আছে, যথা—

"গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞীরে নিল উৎকল নগরী॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে গৌরীদাসের প্রভাব এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা :—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম দিতে নিতে ধরে সেই শক্তি॥"

এতদ্ব্যতীত ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মহিমা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। গৌরীদাসের পত্নী বিমলা দেবীর গর্ভে বড় বলরাম ও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। রঘুনাথের মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে দুই পুত্র। গৌরীদাসের বংশধরেরা অদ্যাবধি অম্বিকায় আছেন। এই গৌরীদাস নিত্যা-নন্দের ভক্ত। (২) গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া ইনিও নিত্যানন্দের ভক্ত। বৈষ্ণববন্দনায় ইহার সম্বন্ধে এই লেখা আছে :—"গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।

নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥" ইনিও একজন পদকর্ত্তা। অচ্যুত বাবু অনুমান করেন, পদকল্পতরুর চতুর্থশাখায় নিত্যানন্দ মহিমাসূচক যে একটী পদ আছে, উহা এই দ্বিতীয় গৌরীদাস-বিরচিত।

গৌরাঙ্গপ্রিয়া—শ্রীনিবাসাচার্য্যের পত্নী।

চন্দ্রশেখর দাস—মহাপ্রভুর উপশাখা বিশেষ। ইনি জাতিতে বৈদ্য। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ এই চন্দ্রশেখরের কাশীধামস্থ গৃহে বাসা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য—শ্রীচৈতন্যের এক শ্রেষ্ঠ শাখা। ইনি মহাপ্রভুর মাসীপতি। ইঁহার গৃহে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ নাটকাভিনয় করেন। তাহাতে স্বয়ং লক্ষ্মীও রুক্মিণী সাজিয়া নৃত্য করিয়া ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—"আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥" কাহার কাহার মতে ইনি একজন পদকর্ত্তা।

চিরঞ্জীব সেন—বৈদ্যবংশজাত, দাসগুপ্ত উপাধিধারী ও শ্রীখণ্ডবাসী। গোবিন্দ কবিরাজের জীবনীতে ইঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়—বংশীবদন দাসের পিতা। নিবাস নবদ্বীপস্থ কুলিয়া পাহাড় গ্রামে।

[জগ]ন্নাথ দাস—এই নামে চারিজন মহাজনের নাম পাইয়াছি। (১) পুরুষোত্তম শ্রীগালীম জগন্নাথ দাস (চৈ চ) ইনি মহাপ্রভুর উপশাখা। (২) "জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁই কৈল গঙ্গাবাস॥" চৈ, চ। (৩) "অতিবড়" জগন্নাথ দাস। (৪) কীর্ত্তনীয়া জগন্নাথ দাস। শেষ দুইজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

জগাই মাধাই—ইঁহারা দুই সহোদর নবদ্বীপের কোতয়াল ছিলেন। উভয়েই মদ্যপায়ী, দুরাচার, কুকর্ম্মান্বিত ও অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন। ইঁহারাই মহাপ্রভুর "পতিতপাবন" নামের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জনার্দ্দন—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের সেবক। ইঁহার উপাধি "মিশ্র" ছিল।

জগদীশ পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা গণনায় একজন ও নিত্যানন্দ শাখা গণনায় অপর একজন জগদীশের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—(১) বাল্যকালে একদিন একাদশী তিথিতে এই জগদীশ ও হিরণ্যের ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ আব্দার করিয়া বিষ্ণুর জন্য প্রস্তুত নৈবিদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। (২) "জগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত বর্ষে যথা বর্ষা ঘন॥"

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পিতা, ইঁহার উপাধি ছিল "মিশ্রপুরন্দর"।

জগদানন্দ পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় পরিকর। ইনি সত্যভামার স্বরূপ বলিয়া জগতে খ্যাত। অতি প্রীতিভরে প্রভুকে বিলাসের সামগ্রী দিয়া লালন করিতে চাহিতেন; লোকভয়ে প্রভু তাহা করিতে দিতেন না; এই উপলক্ষে সর্ব্বদা উভয়ের রস-কোন্দল হইত। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে ইনি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে দেখিবার জন্য নীলাচল হইতে নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। ইনি সাধারণতঃ নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে:—"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥ প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন। বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন॥ দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল।"

জাহ্নবী—নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী।

দময়ন্তী—শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। রাঘব পণ্ডিত প্রতিবৎসর উৎকলে যাইবার সময় ঝোলায় করিয়া ইঁহারই প্রস্তুত লড্ডুকাদি নানা মিষ্টান্ন মহাপ্রভুর জন্য লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তাহা ভোজন করিতেন। রাঘব পণ্ডিত দেখ।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—নিত্যানন্দের প্রিয় ভৃত্য। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা:— "নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময়॥" আবার চৈতন্য ভাগবতে আছে:—"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥"

নন্দন মাহিতী—জগন্নাথের সেবক।

নন্দন আচার্য্য—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নবদ্বীপবাসী জনৈক বিপ্র। তীর্থ পর্য্যটনের পর বৃন্দাবন হইতে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দ প্রথমতঃ ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হয়। বিশ্বম্ভরে ঈশ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিয়াও ইঁহারই গৃহে লুক্কায়িত ছিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে "নাড়া" "নাড়া" বলিয়া ডাকিয়া বাহির করেন। তাহাতে অদ্বৈত প্রভুর ভ্রম দূর হয়। ইনি খঞ্জ ছিলেন; গোবিন্দদাসের কড়চায় যথা:—
"নন্দন আচার্য্য আসে পড়ে অনুরাগে। খোঁড়া বটে, তবু আইসে সকলের আগে॥"

নন্দরাম দাস—কাশীরাম দাসের পুত্র ও দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদক। ইনি কি পদকর্ত্তাও?

নন্দাই—ইনিও রামাই গোবিন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। চরিতামৃতে যথা :—"রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ বাইশঝাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥" নিত্যানন্দ শাখা গণনায় অপর এক নন্দাইর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নাভাদেবী—অদ্বৈত প্রভুর মাতা।

নারায়ণ গুপ্ত—চৈতন্যচরিতামৃত মতে নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ এই চারি ভ্রাতা নিত্যানন্দ প্রভুর কিঙ্কর।

নারায়ণী—শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বৃন্দাবনদাসের মাতা।

নিত্যানন্দ—১৩৯৫ শকে একচক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে ও পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম। ইহার পত্নীদ্বয়ের নাম বসুধা ও জাহ্নবা দেবী। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের জন্ম। জাহ্নবা দেবী অপুত্রা। ইনি বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামীকে দত্তকগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু গৌরলীলার কেন্দ্রস্থান, স্বয়ং সঙ্কর্ষণ বলরাম। মাধাই ভগ্ন কলসীর কাণা ফেলিয়া নিতাইর ললাটদেশে আঘাত করিয়াছে; কপাল কাটিয়া অজস্র রক্তপাত হইয়া নিতাইর "পদ্মমালা ভেসে" গিয়াছে। সমস্ত শরীর রুধির প্লাবিত; কিন্তু দয়াল নিতাইচাঁদ বলিতেছেন "ও ভাই মাধাইরে, মাল্লি মাল্লি কল্লি ভাল। তবু একবার চাঁদবদনে হরি বোল॥" প্রভু নিত্যানন্দের রুধির প্লাবন দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুর্য্য-বিস্মৃত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় লইয়াছেন; প্রভুর আহ্বানে সুদর্শন চক্র মাধাইকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। তখন মহাপ্রভুকে অনুযোগ করিয়া নিত্যানন্দ বলিতেছেন "দীনের অধীন হ'য়ে, নামে প্রেমে জগত ভাসাইতে আসিয়া, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কেন? সুদর্শন সম্বরণ করুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। এ অবতারের অমোঘ অস্ত্র হরিনাম, তাহাই প্রয়োগ করুন।" জাহ্নবামাতা স্বয়ং রেবতী। ইহার প্রভাব সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অনেক আখ্যায়িকা আছে। আমরা এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদা জাহ্নবামাতা অর্দ্ধোলঙ্গবেশে কূপজল উত্তোলনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন; এমন সময় অকস্মাৎ বীরভদ্র তথা উপস্থিত হইলেন। দেবীর হস্তদ্বয় জলপাত্রে আবদ্ধ ছিল; অপর দুই হস্ত বহির্গত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। কথিত আছে, বীরভদ্র এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া দেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীদেবীর জনক, শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন।

নৃসিংহদাস—নিত্যানন্দের পরিকর। উপাধি কবিরাজ ছিল।

নৃসিংহানন্দ—উড়িষ্যাবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র। ইনি নৃসিংহ উপাসক ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ইঁহার নাম নৃসিংহানন্দকারী রাখেন। আদির দশমে যথা :— শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তার নাম কৈল নৃসিংহানন্দকারী॥" চৈ, চ। নৃসিংহানন্দ শুনিলেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবেন ; তখন মানসে কুলিয়া গ্রাম হইতে রাজমহলের সন্নিকট কানাইর নাটশালা নামে গ্রাম পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর গমন জন্য এক পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে এই মানসিক পথের এইরূপ বর্ণনা আছে। "বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ। পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥ কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল। নিবৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল। পথের দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুইপার্শ্বে দিব্য পুষ্করিণী॥ রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল। নানাপক্ষী কোলাহল সুধাসম জল॥ শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা। কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বাঁধিয়া॥"

পদ্মাবতী—কবি জয়দেব পত্নী।

পরমানন্দপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর একজন প্রধান শিষ্য। ইঁহার আদিবাস স্থান ত্রিহুতে ছিল। শ্রীচৈতন্যের অন্তলীলায় নীলাচলে তাঁহার নিকট থাকিতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত—নিত্যানন্দের প্রিয়ভক্ত ও অত্যন্ত প্রেমিক।

পুরন্দর আচার্য্য—"চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। পিতা করি যাহে কহে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥" চৈ, চ।

পুরীদাস—পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুরের নামান্তর।

পুরুষোত্তম দত্ত—নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণের ছাত্র প্রধানতঃ দুই জন। তন্মধ্যে ইনি একজন এবং সঞ্জয় অপর জন॥

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—মহাপ্রভুর খুল্লতাত পুত্র ও "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য উদয়াবলী" প্রণেতা।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—ইঁহার জন্মস্থান সেটেরী। নবদ্বীপ হইতে নীলাচল যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপে অবস্থিতি করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে :—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য। এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যার নৃত্যকালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥"

বনমালী মিশ্র—লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের ঘটক।

বনমালী আচার্য্য বা পণ্ডিত—শ্রীবাস গৃহে যখন মহাপ্রভুর বলরাম আবেশ হয়; তখন ইনি তাঁহার হস্তে সুবর্ণ হল ও মুষল দর্শন করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে যথাঃ—"বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে। সুবর্ণ মুষল হল যে দেখিল হাতে।

বলরাম ও জগদীশ—অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র।

বলরামাচার্য্য—গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত।

বল্লভ মিশ্র—শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর পিতা ও মহাপ্রভুর প্রথম শ্বশুর ছিলেন। ইনি জনক রাজার ন্যায় সৎস্বভাব ও সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

বসুধা—সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা ও নিত্যানন্দের পত্নী।

বাণীনাথ—(১) বিপ্র বাণীনাথ মহাপ্রভুর উপশাখা (২) বাণীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা (৩) পণ্ডিত বাণীনাথ গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ।

বাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রামবাসী ও মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইঁহার মিলনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন। "যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে। তাহা হইতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥" চৈ-চ। মহাপ্রকাশ সময়ে ইনি গৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, জগতের সমস্ত জীবের পাপ লইয়া আমি যেন নরক ভোগ করিতে পারি।

বিজয়দাস—ইনি মহাপ্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিতুষ্ট হইয়া, মহাপ্রভু ইঁহার নাম "রত্নবাহু" রাখিয়াছিলেন। ইনি কি পদকর্ত্তা?

বিদ্যানিধি—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ইনি চট্টগ্রামবাসী, ধনাঢ্য ও পরম ভক্ত। মিলনের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহার জন্য সর্ব্বদা রোদন করিতেন এবং ইঁহাকে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু। পাদস্পর্শ হইবে বলিয়া ইনি কখনও গঙ্গা স্নান করিতেন না। চৈতন্য চরিতামৃতে যথা ঃ—"পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি। যার নাম লইয়া প্রভু কান্দিলা আপনি।"

বিদ্যা বাচস্পতি—শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। ইনি নবদ্বীপ হইতে

কুমারহট্ট আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভদ্র নগর হইতে আসিয়া ইহাঁর গৃহে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। পরে অসংখ্য লোক সমাগমে বিরক্ত হইয়া রাত্রিকালে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে গমন করেন।

বিষ্ণুদাস—(১) নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস আচার্য্যের ভ্রাতা বিষ্ণুদাসাচার্য্য চৈতন্য শাখা। (২) অদ্বৈত শাখায়ও অপর একজন বিষ্ণুদাস আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া—ইনি শ্রীসনাতন মিশ্রের দুহিতা ও মহাপ্রভুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র—নিত্যানন্দের পুত্র।

বুদ্ধিমন্তখান—নবদ্বীপস্থ একজন ধনবান্ লোক ও নিমাই পণ্ডিতের পরম হিতৈষী। ইনি গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ স্বব্যয়ে মহা সমারোহে সম্পন্ন করেন। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের মতে ইনি চৈতন্যের অতি প্রিয়, আজন্ম আজ্ঞাকারী ও সেবকপ্রধান ছিলেন।

ভগবানাচার্য্য—শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয়াংশ স্বরূপ এই মহাত্মা নবদ্বীপ ধামে শ্রীকরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর, ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া ন্যায়াচার্য্য নামে বিখ্যাত হয়েন। ইহাঁর [illegible] বয়স [illegible] যোগ্যাদর্শন করিয়া ইহাঁর পিতা মহা ধনী শতানন্দখান, [illegible] কন্যাকে ইহার সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু ভগবান্ কিছুতেই সংসারে আবদ্ধ না হইয়া, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের পদাশ্রয় করেন। পরে মহাপ্রভুর আদেশ ও অনুরোধ ক্রমে কিছুদিন সংসারাশ্রমে লিপ্ত হয়েন। এই সময়ে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে তাঁহার রঘুনাথ ও রমানাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। কিছুদিন পর স্বীয় পত্নী ও শিশু পুত্রদ্বয়কে স্বীয় শিষ্য ও শ্যালকের নিকট রাখিয়া পুনরায় নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট গমন করেন। ইহাঁর বিষয় চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে যথা:—"পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবানাচার্য্য। পরম পণ্ডিত তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য॥ সখ্যতা আক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার। স্বরূপ গোসাঞী সহ সখ্য ব্যবহার॥ একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহ করে নিমন্ত্রণ॥"

ভবানন্দ রায়—রায় রামানন্দের পিতা।

ভট্ট রঘুনাথ—ইনি বারাণসীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র। ১৪২৭ শকে ইহাঁর জন্ম, ও ১৫০১ শকে অপকট হয়। ইনি অষ্টাবিংশতি বর্ষ মাত্র গৃহাশ্রমে ছিলেন। মহাপ্রভু যখন তপনমিশ্রের গৃহে মাসদ্বয় অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তখনই

রঘুনাথ ভজন সাধন শিক্ষাতে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বৎসর যাইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট বাস করেন। পরে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ৪৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়া শ্রীধামেই অপ্রকট হয়েন। ইনি ষট্ গোস্বামী পাদের অন্যতম। চৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে:—"প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন। * * * তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস। রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন॥ বড় হৈলে নীলাচলে গেল প্রভুর স্থানে। অষ্ট মাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥ প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা। আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞীর নিকটে রহিলা॥ তাঁর ঠাঞি রূপ গোসাঞী শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তেঁহ হৈলা প্রেমে মত্ত॥"

ভারতী—কেশব ভারতী। শ্রীগৌরাঙ্গ কণ্টক নগরে ইঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গিরি, পুরী ইত্যাদি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় মধ্যে ভারতী-সম্প্রদায় নিকৃষ্ট এবং বোধ হয় নিকৃষ্ট দেখিয়াই মহাপ্রভু এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন। কেননা নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট, অশুচিকে শুচি, যবনকে ব্রাহ্মণ করাই পতিতপাবনের কার্য্য।

ভূগর্ভ—ইনি ও লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনের জঙ্গল কাটিয়া বাসোপযুক্ত করিবার জন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হয়েন।

ভুবন দাস—শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও রাধামোহন ঠাকুরের সহোদর।

মণ্ডল ঠাকুর—পরিচয় অপ্রাপ্য।

মধু পণ্ডিত—বৈষ্ণব বন্দনায় ইঁহার নাম মাত্র পাওয়া যায়, "শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দ অনন্ত আচার্য্য।"

মধুশিল—কণ্টক নগরে এই ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের শিখা মুণ্ডন করেন।

মহেশ পণ্ডিত—(১) এক মহেশ পণ্ডিত মহাপ্রভুর উপশাখা (২) দ্বিতীয় মহেশ পণ্ডিত নিত্যানন্দের শাখা ও অত্যন্ত প্রেমিক ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে আছে:—"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। ঢক্কা-বাদ্যে নৃত্য করে যৈছে মাতোয়াল॥"

মাধবেন্দ্র পুরী—অতি প্রভাবশালী সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ঈশ্বরপুরীর গুরু।

মাধো—একজন নীলাচলবাসী কবি, শ্যামানন্দের প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য।

মাধব দাস—এই নামে তিন মহাত্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন জনই কবি এবং অন্ততঃ দুইজন পদ কর্ত্তা। (১) কুলিয়া গ্রামবাসী মাধব দাস।

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া মহাপ্রভু কিছুদিন ইহার গৃহে বাস করেন। গুণরাজখানের "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" ইনি পরে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নাম দিয়া প্রকাশ করেন (?)। (২) মাধব ঘোষ, ইনি ভণিতায় "দীনমাধব" নামে পরিচিত। ইহার পদগুলিও সুন্দর। ইনি বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। (৩) মাধবাচার্য্য ইনি কালিদাস মিশ্রের পুত্র এবং মহাপ্রভুর শ্যালক। মাধব ঘোষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাসুদেব ঘোষ প্রবন্ধে, এবং মাধবাচার্য্য বা "দ্বিজ মাধবের" বিবরণ এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মাধব মিশ্র—গদাধর পণ্ডিতের পিতা।

মালিনী—(১) শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী। (২) অভিরাম গোপালের পত্নী।

মালতী—(১) কাহার কাহার মতে ইনি ও অভিরামপত্নী এক ও অভিন্ন। (২) রসিকানন্দের পত্নী।

মুকুন্দ সঞ্জয়—ইহাদিগের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের টোল ছিল। ইহারা প্রভুর অতি আজ্ঞাকারী ভৃত্য ছিলেন।

মুকুন্দ দাস—খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের ভ্রাতা, এবং রঘুনন্দন গোস্বামীর পিতা। ইনি গৌড় বাদসাহের ভিষক্ ছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—বৈদ্যবংশাবতংস ও নবদ্বীপবাসী বাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। ইহার পিতামাতার পূর্ব্ব বাস ছিল চট্টগ্রামে, অন্যমতে শ্রীহট্টে। মুকুন্দ মহাপ্রভুর বাল্যসুহৃদ্ ও সতীর্থ। ইনি পরম পণ্ডিত ও বিচারময় ছিলেন। যতদিন গৃহে ছিলেন, ততদিন বিচার-বিতণ্ডাতে ইহার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। যখন নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাভিমানে মত্ত, তখন মুকুন্দ অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত হরিসাধনে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় ইহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। চরিতামৃতে ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে :—"শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য গোসাঞী।" চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে ইহার সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আছে :—"সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥ যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণ গীত। হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ভিত॥ কেহ কাঁদে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥ হুঙ্কার করয়ে কেহ মাল সাট মারে। কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায় ধরে॥"

রঘুনাথ দাস—প্রসিদ্ধ ষট্ গোস্বামী পাদের অন্যতম। সপ্তগ্রামবাসী "বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর" হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস কায়স্থ ছিলেন। রঘুনাথ দাস

গোবর্দ্ধনের পুত্র। ১৪২৮ শকে ইহার জন্ম ও ১৫০৪ শকে অপ্রকট হয়েন। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে ১৪২০ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইহার সংসারবৈরাগ্য দর্শনে ইহার অভিভাবকগণ ইহাকে এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু প্রভূত বিত্তৈশ্বর্য্য ও যুবতী ভার্য্যা ইহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণে নীলাচল গমন করিলে, রঘুনাথ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে উন্মত্তবৎ অধীর হয়েন এবং অল্পকাল মধ্যে পলাইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হয়েন। ধনী সন্তান রঘুনাথ পদব্রজে দ্বাদশ দিবসে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। এই দ্বাদশ দিবস মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম অতুলনীয়। রঘুনাথ স্বরূপ গোস্বামীর সহিত সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া, অপরাহ্নে সিংহদ্বারে যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিক প্রদত্ত মহাপ্রসাদে অঞ্জলি পূর্ণ হইলেই গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, উহা দ্বারা কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ভূপতিত দলিত মহাপ্রসাদ সংগ্রহপূর্ব্বক ধৌত করিয়া তাহাই আহার করিতেন। এইরূপে ১৬ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতির পর স্বরূপ গোস্বামী ও মহাপ্রভুর অপ্রকটে ভগ্ন-হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তথা রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদের আদেশ ক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাস করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইহারই আশ্রয়ে বাস করেন। দাস গোস্বামী শেষকালে অন্ন জল পরি-ত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন তিন পলা মাঠামাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। ইহার কঠোর সাধন সাধক মধ্যে প্রায় অতুলনীয়। সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ নাম গ্রহণ, সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ, দিবারাত্র মানসে যুগলমূর্ত্তির ভজন, প্রহরেক কাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রালোচনা, ত্রিসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির সাধন, কোন কোন দিন দুই তিন দণ্ড মাত্র নিদ্রা এই সকল তাঁহার বৃন্দাবনের নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইনি গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর, নীলাচলে ১৬ বৎসর ও অবশিষ্ট ৪১ বৎসর বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। দাস গোস্বামী সংস্কৃতে "স্তবাবলী" "দান চরিত" ও "মুক্তা চরিত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, "মনোশিক্ষা" নামে ইহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ আছে। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "ব্রজরসপুর" একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করিয়াছি; ইহাও দাস গোস্বামিকৃত সন্দেহ নাই; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ নাই। এই রঘুনাথ দাস একজন বাঙ্গলা পদাবলীরচয়িতা; ইহার তিনটী পদ পদকল্পতরুগ্রন্থে আছে

রঘুনন্দন—রঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দদাসের পুত্র, নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অভিরাম গোপালের মন্ত্রশিষ্য। ইনি শৈশবে গোপীনাথ বিগ্রহকে লড্ডুক ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। রঘুনন্দনের মহিমাপ্রচার জন্য, মহাপ্রভু মুকুন্দদাসকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং ভক্তপ্রবর মুকুন্দদাস তাহার যে সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে সেই পংক্তি কয়েকটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন। তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়। আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥"

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কবিরাজ মহাশয়ের মতে ১৪৩২ শকে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। রঘুনন্দন বৃন্দাবনে মহারাস লীলায় কন্দর্পমঞ্জরী এবং ইনিই দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণপুত্র কন্দর্প। মাঘী বসন্তপঞ্চমীতে ঠাকুর রঘুনন্দনের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীখণ্ডগ্রামে প্রতিবর্ষে এক মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি মহাপ্রভুর বরপুত্র বলিয়া কথিত হয়েন এবং ইঁহার প্রণাম মন্ত্রেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা :—

"মুকুন্দ তনয়ে নিত্যং ব্রজ কন্দর্পরূপিণে।
কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়ৈব গৌরপুত্রায় তে নমঃ॥"

রঘুনন্দন কখন অপ্রকট হয়েন, তাহা জানা যায় না; তবে প্রবাদ এই যে মহাপ্রভুর অপ্রকট দিবসেই রঘুনন্দনও অপ্রকট হয়েন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ১৪৫৫ শকাব্দে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

পানিহাটির উত্তরে আকাইহাট গ্রাম, এস্থলে কালাকৃষ্ণদাসের সমাধির পশ্চিমাংশে নূপুরকুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ এই যে যখন বড় ডাঙ্গিতে অভিরাম গোপাল ও ঠাকুর রঘুনন্দন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন রঘুনন্দনের নূপুর আকাই হাটে আসিয়া পড়ে, ইহা হইতেই প্রাগুক্ত পুষ্করণীর নাম নূপুরকুণ্ড। আকাই হাটের ক্রোশত্রয় দক্ষিণে স্থিত কড়ুইগ্রামের মহান্ত বাড়ীতে সেই নূপুর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রত্নাবতী—গদাধর পণ্ডিতের জননী।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্যের পৌত্র, রঘুনাথ আচার্য্যের পুত্র, নিবাস মালীপাড়া। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রামচন্দ্র কবিরাজ—ইনি স্বয়ং একজন পদকর্ত্তা এবং বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর সময়ে ইহাঁর তুল্য সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে পণ্ডিত দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না সন্দেহ। ইনি পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতি ও রূপে কন্দর্প ছিলেন। ইহার রূপ ও বিদ্যায় মোহিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুর নরোত্তমের হৃদয়বন্ধু ছিলেন; এমন কি ইহাকে ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি "স্মরণ-দর্পণ" নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে :—"সদা সঙ্গ নরোত্তম, নাহিক তাঁহার সম, ত্রিভুবনে নাহি তার সীমা।

দুহে রাত্রি দিনে বসি, অমিয় সাগরে ভাসি, অপরূপ যুগল মহিমা॥"

বৃন্দাবনধামে রামচন্দ্রের দেহ ত্যাগ হয়। অনেক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ এই বৈদ্য কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন। রামচন্দ্রের পত্নীর নাম রত্নমালা। কর্ণানন্দ গ্রন্থে রামচন্দ্র সম্বন্ধে লেখা আছে :—

"রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত। বাচস্পতি সম কিবা সরস্বতী খ্যাত॥
সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভব যশস্বী প্রধান। মহা চিকিৎসক হৈল দিগ্বিজয়ী নাম॥"

রামাই পণ্ডিত—শ্রীবাসের ভ্রাতা। পদ্ধতি নামক গ্রন্থকার। ঐ গ্রন্থ রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে রচিত।

রাঘব পণ্ডিত—পানীহাটীনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক চৈতন্যদেব ইহাঁর গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই স্থলেই গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও রাঘবের গৃহে তিন মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাঘব প্রতিবৎসর স্বীয় ভগিনী দময়ন্তী দেবীর প্রস্তুত মিষ্টান্ন এক ঝালিতে করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর জন্য লইয়া যাইতেন, মহাপ্রভু তাহার কিছু কিছু বার মাস গ্রহণ করিতেন। এই বিষয় চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। তার মুখ্য শাখা এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যায় গোপন করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভু করে অঙ্গীকার। রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥"

রূপ ঘটক—ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা। কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে ;—

"শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ নাম বিনা যার নাহি কৃত্য॥"

রূপ গোস্বামী—কুমার দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সনাতন ও অনুপমের ভ্রাতা। রামকেলিগ্রামে ইঁহাদিগের নিবাস ছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত। ইনি বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও গৌড় বাদসাহ হুসেন সাহার উজীর ছিলেন। ইহাঁর উপাধি ছিল সাকর মল্লিক। ইনি যবনের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয়েন নাই। ইনি স্বীয় বাসভবনের নিকট শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে দুইটী জলাশয়শোভিত একটী কদম্বকানন প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তন্মধ্যে স্বীয় অগ্রজের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির ভজনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হইবার জন্য শ্রীরূপ ব্যাকুল হয়েন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃন্দাবন গমন সময়ে রামকেলি গ্রামে রূপসনাতনকে দর্শন দিয়া যান। অনতিবিলম্বে রূপ রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দীন বেশে নীলাচল যাইয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত হয়েন। পরে তদীয় আদেশে বৃন্দাবন যাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ নিচয় প্রণয়ন করেন। ইহাঁর রচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই :— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবদূত বা সন্দেশ, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, স্তবমালা, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, উজ্জ্বল-নীলমণি, ছন্দোহষ্টাদশ, উৎকলিকাবলী, শ্রীরূপচিন্তামণি, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর-বিন্দু, প্রযুক্তাখ্যচন্দ্রিকা, মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, রাগময়ীকণা, তুলস্যষ্টক, বৃন্দাদেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, মুকুন্দমুক্তাবলী স্তব, বৃন্দাবনধ্যান, চাটুপুষ্পাঞ্জলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর ও প্রেমেন্দুকারিকা। ১৪১১ শকে ইহাঁর জন্ম, ১৪৮০ শকে অন্তর্দ্ধান। ইনি গৃহাশ্রমে ২৭ বৎসর ছিলেন ও বৃন্দাবনে বৈরাগ্যাবস্থায় ৪২ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার কৃত "কারিকা" নামক একখানি বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ আছে।

লক্ষ্মী—(১) মিশ্র বল্লভাচার্য্যের কন্যা ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী। ইহাঁর শরীরে সর্ব্বদা স্বর্গীয় জ্যোতি ও পদ্মগন্ধ বিরাজ করিত। কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, তখন সর্প দংশনে লক্ষ্মী প্রাণ ত্যাগ করেন। কবিরাজ গোস্বামীর মত অন্যরূপ, যথা :—"প্রভুর বিরহ-সর্প

লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥" (২) শ্রীনিবাসাচার্য্যের মাতা।

লোকনাথ গোস্বামী—নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগুরু। ইনি বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করেন। পূর্ব্ব বাস যশোর জেলার অন্তর্গত তালখড়িয়া গ্রামে ছিল।

শিখী মাহিতী—মাধবী দাসী ও মুরারী মাহিতীর ভ্রাতা, এবং জগন্নাথ দেবের লিখনাধিকারী ছিলেন।

শিবাই—পদকর্ত্তা ও নিত্যানন্দ শাখা। কেহ কেহ বলেন শিবরাম বা শিবানন্দের নামান্তর শিবাই।

শুভানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের উপশাখা বিশেষ।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী জনৈক ভিক্ষুক, পরম পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর এই শুক্লাম্বর গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মমত কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট প্রকাশ করেন। এক দিন ঈশ্বরাবেশ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাঁর ঝুলী হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া ভক্ষণ করেন। আর এক দিন ব্রহ্মচারীর [illegible] মাগিয়া মহাপ্রভু ভোজন করেন। তণ্ডুলভক্ষণ ব্যাপারটী শ্রীচৈতন্যভাগবতে [illegible] আছে যথা :—

"এত বলি হস্ত দিল ঝুলীর ভিতর। মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর॥
শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ। ও তণ্ডুলে খুদ কণ বহুত প্রকাশ॥
প্রভু বলে তোর খুদ কণ মুক্তি খাও। অভক্তের অমৃত উলটী নাহি চাও॥"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে অন্নভক্ষণের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা :—

"শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্। যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান॥"

এই অন্নভিক্ষা বিষয়টী লইয়া বৈষ্ণবদাসানুদাস এ অধম একটী গীত রচনা করিয়াছিল, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"পহুঁ মেরে আজবতুয়া কারখানা।
হৈয়া চৌদ্দভুবনের অধিকারী, মেগে খাওয়া রোগ গেলনা॥ ধ্রু॥
বামন ভই বটুকরূপে, ছল কিয়া বলী ভূপে,
ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা মাগি, করিলা তাঁর লাঞ্ছনা।
আবার যজ্ঞপত্নীদের অন্ন, মাগিলা রাখালের জন্য,
সুবহক অন্নদাতা, তছু অন্ন মিলেনা॥

"শুক্লাম্বর পথের ভিকারী, শেষকালে খাও অন্ন তারি,

কি অদ্ভুত লীলা তোহারি, জগদাস তা বুঝল না ॥"

শ্রীজীব গোস্বামী—ইনি অনূপ বা অনুপমের পুত্র, কুমারদেবের পৌত্র। এবং সনাতন ও রূপগোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি আশৈশব শ্রীভগবানের একজন প্রধান ও প্রগাঢ় ভক্ত। ইঁহার বাল্যজীবনটী অতি সুন্দর ও মনোহর। শ্রীরূপ সনাতন যখন বৈরাগ্যাবলম্বনে সংসার পরিত্যাগ করেন, তখন সঞ্চিত ধনরত্ন উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিতরণের পরও এত ধন সম্পত্তি ছিল যে, শ্রীজীব ও তাঁহার জনক নৃপতির ন্যায় পরম সুখে দিন অতি-বাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু পিতা পুত্র একজনেরও বিষয় সম্পত্তির প্রতি মন ছিল না। শ্রীজীবের বয়ঃক্রম তখন অতি অল্প হইলেও সেই সময়েই তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। পিতৃব্যদ্বয়ের সংসার পরিত্যাগ হইতেই শিশুর মনের ভাব যেন কেমন কেমন হইল; তিনি নানা "রত্নাভরণ," "পরিধেয় সূক্ষ্মবাস" "অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা" সুখাদ্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলেন; বিষয়বিভবের তত্ত্বাবধান করা তো দূরের কথা, উহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে কষ্ট হইত। বালক শ্রীজীবের ভাব অপূর্ব্ব এবং তাঁহার ক্রীড়াও অপূর্ব্ব। যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

"শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে ॥

কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্পচন্দনাদি দিয়া ॥

বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লৈয়া ॥

কৃষ্ণবলরাম বিনে কিছুই না ভায়। একাকী ও দোঁহে লৈয়া নির্জ্জনে খেলায় ॥

শয়ন সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥"

অতি শৈশবেই শ্রীজীব কণ্ঠে তুলসীমালা, গাত্রে নামাবলী, ললাটে তিলক ধারণ করিতেন। কখন কখন নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেন; কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িতেন। বালক শ্রীজীব দিবানিশি ভাবিতেন, কতদিনে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে, কতদিনে সংসার পাশ ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে দেহ মন সমর্পণ করিব। পিতৃব্যদ্বয় সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; মাতা পরলোকে গমন করিয়াছেন; একমাত্র জনকই শ্রীজীবের বৈরাগী পথের কণ্টক ছিলেন। ভগবান অবিলম্বে তাঁহাকে স্বীয়পদে স্থান দিলেন। তখন শ্রীজীব সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে স্বপ্নযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে দর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাদের পদে আত্মসমর্পণ করিলেন।

অচিরকাল মধ্যে নবদ্বীপে গমন করিলেন। প্রভুদ্বয়কে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন; এবং প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ও বহুল ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনুমান ১৪৫৫ শকে ইঁহার আবির্ভাব এবং ১৫৪০ শকে তিরোভাব হয়। তাঁহার জীবিতকাল ৮৫ বৎসর তন্মধ্যে গৃহে ২০ বৎসর ও ব্রজে ৬৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইনি বৈষ্ণবজগতে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুমোদন ভিন্ন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ তৎকালে প্রচারিত হইতে পারিত না। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইঁহার প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই :—কৃপাম্বুধিস্তব, হরিনামামৃতব্যাকরণ, সূত্রমালা, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, সাধনমহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, ভাবার্থসূচকচম্পূ, গোপালতাপিনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণোক্ত গায়ত্রীভাষ্য, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, শ্রীরাধিকার করপদচিহ্ন, গোপালচম্পূ পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমার্থসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ এবং ক্রমসন্দর্ভ।

শ্রীবাস—ইঁহার নামান্তর শ্রীনিবাস। ইঁহারা চারি সহোদর, অপর তিন জনের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে চারি ভ্রাতাই ভক্তিপথাবলম্বী ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর উৎকলযাত্রার পর ইনি নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্ট বা হালিসহর যাইয়া বাস করেন। শচীদেবীর অন্তরঙ্গা মালিনী দেবী এই শ্রীবাসের ভার্য্যা।

শ্রীদাস—দ্বিজহরিদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র।

শ্রীধর—নবদ্বীপের একজন দরিদ্র ভক্ত বৈষ্ণব। তরি তরকারী বিক্রয় ইঁহার ব্যবসায় ছিল। এই জন্য লোকে ইহাকে "খোলা বেচা শ্রীধর" বলিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যতদিন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, সর্ব্বদা শ্রীধরের সঙ্গে কৌতুক পরিহাস করিতেন। শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রকাশ সময়ে মহাপ্রভু শ্রীধরকে নানা প্রকার কৃপা করেন। একদা মহাপ্রভু শ্রীধরের ভগ্ন লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা :—'খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস। যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥" "প্রভু যার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল। যার ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পীল জল ॥"

শ্রীমান পণ্ডিত—"শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য। দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥" চৈ, চ,

শ্রীমান সেন—"শ্রীমান সেন প্রভুর ভকতপ্রধান। চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন॥" চৈ. চ,

শ্রীনিবাসাচার্য্য—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চাখণ্ডীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যদাসের ঔরসে এবং জাজিগ্রামের বলরামাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর গর্ব্ভে অনুমান ১৪৩৮ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে ইনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; অতি অল্প বয়সেই ইনি এরূপ বিদ্বান্ হইয়া উঠেন, যেঃ—

"চাখণ্ডীতে বৈসে যত বিদ্যাবন্ত জন। শ্রীনিবাসে দেখি সবে সঙ্কুচিত হন॥"

ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর জাজিগ্রামের পথে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তিনি বালক শ্রীনিবাসকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাস সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, সুতরাং মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট সেই বালককে দেখিয়া সরকার ঠাকুরের এত আনন্দ। অপরদিগে মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত নরহরি সরকারকে স্বচক্ষে দর্শন ও তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বালক শ্রীনিবাস কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইলেন। এই স্থানেই শ্রীনিবাসের অধ্যয়ন শেষ হইল, তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে তথা ধাবিত হইলেন। কিন্তু পথে শুনিলেন, প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, সুতরাং নীলাচল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ও তদীয় রক্ষক শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের চরণ দর্শন করেন। তৎপর শান্তিপুর, একচক্রা, খানাকুল, রামচন্দ্রপুর, অগ্রদ্বীপ, দাঁড়িহাট, আকাইহাট, উদ্ধারণপুর, ঝামটপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সমস্ত শ্রীপাট দর্শন করেন। তৎপর বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিলেন; কিন্তু পিতৃবিয়োগ হওয়াতে কিছুদিন তাঁহাকে বাটীতে থাকিতে হয়। পরে যখন বৃন্দাবন গমন করেন, তখন শ্রীরূপসনাতন অপ্রকট হইয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে লেখা ছিল "বঙ্গদেশ হইতে শ্রীনিবাস নামে একটী ব্রাহ্মণকুমার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন। তাঁহাকে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইবে। আমার অপ্রকটকালে ইঁহার দ্বারাই সংসারে ভক্তি পথ প্রবল থাকিবে।" কিন্তু শ্রীনিবাসের বিলম্বে বৃন্দাবন গমন করাতে রূপসনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহা উপরেই বলা গিয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুঞ্জে রাখিয়া "গোস্বামী গ্রন্থ" শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

শ্রীজীবের অনুগ্রহেই দাস গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হইল এবং গোপালভট্টের নিকট শ্রীনিবাস দীক্ষিত হইলেন। শ্রীনিবাস অল্পদিন মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া শ্রীজীবের নিকট "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। পরে গোস্বামী গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচার জন্য এক সম্পুটে সেই সকল ভক্তিগ্রন্থ লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন; তাঁহার সমভিব্যাহারে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পুরীও গৌড়ে চলিলেন। বিষ্ণুপুরের আরণ্য প্রদেশে গোপালপুর নামক স্থানে বীরহাম্বিরের আশ্রিত কতিপয় দস্যু কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ সম্পুট অপহৃত হইলে, শ্রীনিবাস অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন এবং সঙ্গীদ্বয়কে দেশে বিদায় করিয়া স্বয়ং গ্রন্থানুসন্ধানে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর বলেন :—

"কারে নাহি জানে তিহোঁ, তারে নাহি জানে।
বাউলের প্রায় কেহ করে অনুমানে॥
কভু ভিক্ষা মাগি খায় কভু জল পান।
কোথা রহেন, কোথা জান নাহি স্থানাস্থান॥"

এইরূপে গ্রন্থান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীনিবাস রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। "তখন রাজসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। পাঠক স্থানে স্থানে অর্থ সঙ্গতি করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া শ্রীনিবাস তাহা বলেন, তখন রাজা তাঁহাকেই পাঠ করিতে বলিলেন। কিছুকাল পর শ্রীনিবাস পাঠে বসিলেন, এবং দুই চারি শ্লোক পড়িতে না পড়িতেই কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজা ও সভাসদগণ তাঁহার এইরূপ প্রেম ও পাণ্ডিত্য ও পাঠপ্রণালী দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন।"* তৎপর শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া তদীয় গ্রন্থরাশি প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং সগোষ্ঠী তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইনি "রেণেটী" সুরের কীর্ত্তন 'গানের' প্রবর্ত্তক। ইহার অসংখ্য শিষ্য মধ্যে ১২ জনই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর অনুরোধে শ্রীনিবাস ক্রমে দুই বিবাহ করেন। তাঁহার

---

* শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ৩৬৩ পৃঃ।

প্রথমা পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী, দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া। শ্রীনিবাসের ছয়টী সন্তান জন্মে, তিন পুত্র, তিন কন্যা। পুত্রদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর, মধ্যম রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ ঠাকুর। কন্যাদিগের নাম কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলতা, ও ফুলঝি ঠাকুরাণী। গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, তৎপুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের দুই স্ত্রী, তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে যাদবেন্দ্র ঠাকুর, দ্বিতীয় পক্ষে রাধামোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন, শ্যামমোহন ও মদনমোহন। ভুবনমোহন ঠাকুরের (পদকর্ত্তা ভুবনদাসের) বংশধরগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ মাণিক্যহার গ্রামে বাস করিতেছেন।

ষষ্ঠীবর—জনৈক কীর্ত্তনীয়া। ইহাঁর অপর নাম ষষ্ঠীবর। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের শাখাভুক্ত।

সত্যরাজখান্—কুলীন গ্রামবাসী। কুলীন গ্রাম বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মেমারি ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী। ইহাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি গোস্বামীর ব্যবসায় করেন। ইনি চৈতন্যের শাখাভুক্ত।

সদাশিব—(১) সদাশিব কবিরাজ, নিত্যানন্দের শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা:—"সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥ আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। নিরন্তর বাল্যলীলা করে তাঁর সনে॥" (২) সদাশিব পণ্ডিত, চৈতন্যের শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা:—
"সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ। প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥"

সনাতন মিশ্র—বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মতে ইনি নদীয়ার রাজপণ্ডিত ছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ইহাঁর চরিত্র এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা:—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান। দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
বৈষ্ণব পরম উদার বিষ্ণুভক্ত। অতিথিসেবন উপকারে অনুরক্ত॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহা বংশজাত। পদবী রাজ-পণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন। অনায়াসে অনেকের করেন পালন॥"

সনাতন গোস্বামী—শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর অগ্রজ। ইনিও আশৈশব কৃষ্ণভক্ত। বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রুত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইহাঁর বিষয়বুদ্ধিও প্রগাঢ় ছিল। এই জন্য গৌড়াধিপতি হুসেন সাহ ইহাঁকে সচিবপদে বরণ করেন। ইহাঁর উপাধি ছিল "দবির খাস।" বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ গোস্বামী ইহাঁর নিকট একটী সংস্কৃত শ্লোকাত্মক পত্র লিখিয়া

প্রেরণ করেন *। উহা প্রাপ্তিমাত্র মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে, সনাতন সম্মানিত পদ, বিপুল বিভৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশান ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথে নানা কষ্ট ও বিপদপাত সহ্য করিয়া অবশেষে হাজিপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়া, শ্রীকান্তপ্রদত্ত একখানি ভোট কম্বল গায় দিয়া দরবেশ বেশে কতক দিনে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। তথন সেই স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সনাতনের মিলন হইল। সনাতন প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভোটকম্বল পরিত্যাগ ও কন্থা ডোর কৌপীন ধারণপূর্ব্বক কাঙ্গাল বেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। এই স্থলে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে রূপগোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদ্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনুমান ১৪১০ শকে ইহাঁর আবির্ভাব ও ১৪৮৬ শকে তিরোভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্ব সাকল্যে ৪৩ বৎসর বাস করেন। ইহাঁর প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই :—হরিভক্তি-বিলাস, ভাগবতামৃত, দশম টিপ্পনি, দশমচরিত, গীতাবলী, রসময়কলিকা, বৈষ্ণব-তোষিণী ও দিক্‌প্রদর্শনী টীকা।

সার্ব্বভৌম—বাসুদেবাচার্য্য, নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি নবদ্বীপে স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার সমাপ্ত করিয়া, বারাণসীধামে বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে মিথিলায় যাইয়া পক্ষধর মিশ্রের ন্যায়চতুষ্পাঠীতে পাঠ সমাপ্ত করেন। তদানিন্তনকালে মিথিলা ভিন্ন ন্যায়ের চতুষ্পাঠী অন্য কুত্রাপি ছিল না। কারণ মৈথিলিক পণ্ডিতেরা কোন ছাত্রকেই ন্যায়ের গ্রন্থ স্থানান্তর করিতে দিতেন না। বাসু-দেবের ইচ্ছা হইল, তিনি ন্যায়ের গ্রন্থসমূহ লিপি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন এবং নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল খুলিবেন। যেন ন্যায় পড়িবার জন্য অন্ততঃ বঙ্গদেশের ছাত্রগণকে আর মিথিলায় যাইতে না হয়। মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তিনি যাহাতে ন্যায় গ্রন্থ স্থানান্তর করিতে না পারেন তাহার উপায় অবলম্বন করিলেন। বাসুদেব তদ্বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ন্যায়

* যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা:
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগতীত্যবধারয়।

প্রখরা স্মৃতিশক্তি তদানীন্তন কালে আর কাহারও ছিল না। ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির অধিকাংশ, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মিথিলা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া প্রথম নৈয়ায়িক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাঁর স্থাপিত ন্যায়-বিদ্যালয়ে স্মৃতি, দর্শন, ন্যায়, বেদান্ত, শ্রুতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র অধীত হইত। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্র আসিয়া ইহাঁর নিকট অধ্যয়ন করিত। রঘুনাথ শিরোমণি ইহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম "সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি"। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি শেষকালে সপরিবার নীলাচলে যাইয়া বাস করেন এবং মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। উৎকলে যখন যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান হইত, সার্ব্বভৌমই তাহার নেতা, মীমাংসক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে বেদান্তের ভক্তিসূচক ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাঁর মন বৈষ্ণব ধর্ম্মে আসক্ত হয়; পরে মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর পরমভক্ত ও পরম ভাগবত হয়েন। সার্ব্বভৌমকৃত মহাপ্রভুর স্তবাবলী অতি সুন্দর, অতি প্রাঞ্জল, অথচ অতি গভীরার্থবিশিষ্ট। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে কিরূপে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা তদ্রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

"বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকপুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্ত মহং প্রপদ্যে॥"

[অন্বয়ার্থ। সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা অনাদি পুরুষ ভগবান্ বৈরাগ্য বিদ্যা ও নিজভক্তি যোগ শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে শরীর ধারণ করিয়াছেন। সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমি শরণাগত হইলাম।]

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

[অন্বয়ার্থ। যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত, এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ-কমলে আমার চিত্ত-ভ্রমর প্রগাঢ়-রূপে বিলীন হউক।]

সার্ব্বভৌমের একমাত্র পুত্র ও মুগ্ধবোধ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকাপ্রণেতার নাম দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ।

সীতা—অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—"প্রেমরস স্বরূপ সুন্দরানন্দ নাম।

নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥" চৈ, চ।

পুনশ্চ তত্রৈব "সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।

যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ম্ম॥"

"সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।

ফুটিল কদম্ব ফুল জামিরের গাছে॥" বৈষ্ণববন্দনা।

সুধানিধি—ভবানন্দ রায়ের চতুর্থ পুত্র।

সুবুদ্ধি মিশ্র—মহাপ্রভুর শাখা। ইনি চৈতন্য-মঙ্গলপ্রণেতা জয়ানন্দের পিতা।

স্বরূপ দামোদর—ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, নিবাস নবদ্বীপ। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং দণ্ডীদিগের স্থানে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহা পণ্ডিত হয়েন। ইনি একদিকে প্রগাঢ় বৈদান্তিক, অপরদিকে মায়াবাদী দণ্ডী। কিন্তু মহাপ্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে নীলাচলে আকৃষ্ট হইয়া, কি বলিয়া তদীয় শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করেন, তাহা তদ্রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকেই প্রকাশ পাইবে :—

"হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,

শাম্যচ্ছস্ত্রে বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শাশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! ভবদয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

[অন্বয়ার্থ। হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! যে অনায়াসেই সমস্ত দুঃখ সংহার করে, যে অতি নির্ম্মল রসপ্রদ ও সমস্ত শাস্ত্রের বাদানুবাদ নিবর্ত্তিত করিয়া যে পরমানন্দ প্রদান করে এবং চিত্তে প্রেমোন্মাদ ও সর্ব্বজীবে অভিন্নভাব সমর্পণ করতঃ নিরন্তর ভক্তিসুখে নিমগ্ন করে, সেই বিশুদ্ধ মাধুর্য্য সহকারে তোমার পরিপূর্ণ করুণা আমার প্রতি বর্ষিত হউক।]

ইনি অত্যন্ত নির্ম্মল চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এমন কি প্রয়োজন হইলে প্রভুকে শাসনও করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা :—"দামোদর পণ্ডিত শাখা গাঢ় প্রেম চণ্ড। প্রভুর উপরে যেহোঁ করে বাক্যদণ্ড॥" নীলাচলে প্রভুর মর্ম্মভক্ত দুইজন ছিলেন। পুনশ্চ চরিতামৃতে যথা :—"সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন। পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥" স্বরূপ দামোদর ও

তদীয় ভ্রাতা শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর কিরূপ স্নেহ ছিল, তাহা চরিতামৃতের এই শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে :—"সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে। শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে ॥"

হলায়ুধ—ইনি চতুঃষষ্টি মহান্তের অন্যতম। বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—"হলায়ুধ ঠাকুর বন্দ করিয়া আদর।"

হেমলতা—শ্রীনিবাসাচার্য্যের দুহিতা।

এই সংগ্রহে যে সকল পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে; তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দিয়াছি। অবশিষ্ট কয়েক জনের বিস্তীর্ণ বা সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

আত্মারাম দাস।

ইনি নিত্যানন্দ ভক্ত। জাতিতে বৈদ্য, নিবাস শ্রীখণ্ডগ্রামে। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইঁহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী দাসী ছিল।

উদ্ধবদাস।

এক উদ্ধবদাস শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলীরচয়িতা উদ্ধবদাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত ও টেঞা বৈদ্যপুরনিবাসী। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইনি শকাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার এবং ইনি পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলিতা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন।

কবিকর্ণপুর বা পরমানন্দ সেন।

কুলীনগ্রাম নিবাসী শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র :—

"চৈতন্য দাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥" চৈ, চ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের সাত কি আট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামে কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া সম্ভবতঃ কবি কর্ণপুরের মাতুলালয়। পরমানন্দ সেনের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, তখন সস্ত্রীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং মহাপ্রভুকে পুত্রটি দেখান। শিশু শ্রীচৈতন্যের পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া আছে, খেলিতে খেলিতে মহাপ্রভুর সুন্দর পদাঙ্গুষ্ঠ স্বীয় আননে অর্পণ করিয়া লেহন করিতে

লাগিল। সেই চরণ-সরোজের মকরন্দের এমনই গুণ যে, সেই নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক বহির্গত হইল :—

"শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মাহেন্দ্রমণিদাম,
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি ॥"

অন্বয়ার্থ। যিনি কর্ণের কুবলয়, চক্ষুর অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্রমণি, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিল ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই প্রবাদের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে। যথা :—

"আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তেহো করিল প্রকাশ ॥
সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকৃত হন ॥"

অথবা এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগেই বা প্রয়োজন কি? যে পদে পতিত-পাবনী সুরধনীর জন্ম, যে চরণস্পর্শে পাষাণী মানবী, যে পদস্থাপনে কাষ্ঠতরণী স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদাঙ্গুষ্ঠ লেহনে নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে সংস্কৃত শ্লোকস্ফুরণ আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি? বলিতে কি মহাপ্রভুর কৃপায় পরমানন্দ সেন আজন্ম কবি। "কবিকর্ণপুর" উপাধিটী মহাপ্রভুরই প্রদত্ত এবং মহাপ্রভুই তাঁহাকে "পুরীদাস" নামে অভিহিত করেন ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, চৈতন্যচরিতকাব্য, শ্রীচৈতন্য-শতক, স্তবাবলী, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, বৃহৎ বা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও অলঙ্কারকৌস্তুভ। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ও চৈতন্যচরিত-কাব্য ১৪৯৪ শকে রচিত। গণোদ্দেশদীপিকা ১৪৮৮ শকাব্দায় লিখিত অনেকে অনুমান করেন, এই গণোদ্দেশদীপিকাই কবিকর্ণপুরের শেষ রচিত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হয়; এই গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের বিবিধ গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, কবিকর্ণপুর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন।

বৈষ্ণবাচারদর্পণ গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপুর। কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখা শূর ॥
বৃদ্ধ পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যার মুখে দিলা। পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা ॥"

কবিকর্ণপুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

"একবার রথযাত্রার সময় শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তোমার একটী আশ্চর্য্য পুত্র জন্মিবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দ পুরী গোসাঞী রাখিবে। ইহার ছয় বৎসর পর শিবানন্দ সেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন চৈতন্য প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভুও ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র পিতৃমুখশ্রুত প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌরাঙ্গ প্রভু কে? আমাকে দেখাইয়া দিন্।' তাহাতে শিবানন্দ সেন যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীবরেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহু।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥"

অস্যার্থ। বিদ্যুদ্দামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্র গতি, স্বর্ণ পরিঘ সম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ কিরণ কান্তিবাসা, ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন। তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

বিশ্বকোষকার আরো বলেন, "কিছুদিন পর মহাপ্রভু যখন শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়া দুই তিনটী ভক্তসহ যাইতেছেন, তখন শিবানন্দ সস্ত্রীক মহাপ্রভুকে বহু যত্নে বাসায় লইয়া গেলেন; তথা শিবানন্দ পুত্রকে প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। পরমানন্দদাসকে দেখিয়া প্রভু প্রীত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ অর্পণ করিতেছিলেন; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছানুসারে হউক, বা বালস্বভাব বশতঃই হউক, বালক মুখব্যাদান করিয়া প্রভুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্যে ধারণ করিলেন। এই বিষয়টী আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূরনিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

"বৎস্যাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়ারসনয়া প্রাণস্য সৎকাব্যতাম্।
দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুধৈর্হ্ প্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া।"

অস্তার্থ। বৎস, তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সংস্কৃত কবিত্ব প্রাপ্ত হইলে। এই দেবদুর্লভ কবিত্ব ভক্তজন মধ্যে প্রচার করিও।" এই সময়েই প্রভু বলেন, "পরমানন্দ তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবি কর্ণপুর হইল।"

সংস্কৃত কাব্যে কর্ণপুরের অতি উচ্চ স্থান। বাঙ্গলা রচনায়ও অনেক পদকর্ত্তা অপেক্ষা তাঁহার আসন উচ্চতর।

কানুদাস বা কানুরাম দাস।

এই নামে বৈষ্ণব গ্রন্থে তিন মহাত্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শেষজনই পদকর্ত্তা ছিলেন।

(১) প্রভু নিত্যানন্দের একশাখা সদাশিব কবিরাজ; সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমদাস; এবং পুরুষোত্তমদাসের পুত্র কানুঠাকুর বা কানুদাস।

(২) কানুদাস বা কানু পণ্ডিত শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর আত্মজ। শ্রীমান গদাধর পণ্ডিতের অপ্রকটের একবৎসরান্তে তদীয় শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস যে এক বৃহৎ মহোৎসব দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য মোহান্তদিগের মধ্যে শ্রীকানুপণ্ডিত পদার্পণ করেন। যখন শ্রীপাট খেতুরীতে মহামেলা হয়, তখন কানুপণ্ডিত শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে নবদ্বীপ আসিয়া শ্রীমতী জাহ্নবাঠাকুরাণীর সহিত খেতুরীতে গমন করেন।

(৩) রসিকমঙ্গল গ্রন্থ মতে কানুদাস শ্যামানন্দ পুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। ইনি একজন নীলাচলবাসী কবি ছিলেন। দীনেশবাবু বলেন, "ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত।"

কৃষ্ণদাস।

এই নামে তিনজন পদকর্ত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ দীন কৃষ্ণদাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) দীন কৃষ্ণদাস—অম্বিকানগরে শ্রীকংসারি মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সুবলমঙ্গল গ্রন্থানুসারে তাঁহার ছয় পুত্র ছিল; যথাঃ—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য। এই সূর্য্যদাসই নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর এবং বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর পিতা ছিলেন। কৃষ্ণদাস

পদরচনা সময়ে "দীনকৃষ্ণদাস" বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। ইঁহার রচিত পদ সকল জ্যেষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমাসূচক। বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে এই পদ-কর্ত্তার নামের উল্লেখ আছে, যথা :—"গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।"

(২) দুঃখী কৃষ্ণদাস—ইঁহার নামান্তর শ্যামদাস বা শ্যামানন্দপুরী। উৎকল দেশে দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে সদ্গোপকুল শ্রেষ্ঠ, সুচরিত্র, কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম দুরিকা। রসিকমঙ্গল গ্রন্থ মতে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের বাস পূর্ব্বে গৌড়ে ছিল, পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডেশ্বর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতির চরিত্র সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "গোপবংশে জন্ম হইলেও ব্রাহ্মণযোগ্য সদাচার ও পবিত্রতা তাঁহাদিগের দেহের ভূষণস্বরূপ ছিল। তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা, অমায়িকতা ও তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্য প্রতিবাসিবর্গের শিক্ষার জন্য এক উচ্চ আদর্শ ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভদ্র অভদ্র, ধনী দরিদ্র, সকলের নিকট সমভাবে আদরণীয় ছিলেন।" শ্যামানন্দের পূর্ব্বে এই নিরীহ দম্পতির অনেকগুলি সন্তান সন্ততি নষ্ট হয়। পরে ১৪৫৬ শকাব্দের চৈত্র-পূর্ণিমা তিথিতে শ্যামানন্দের জন্ম হয়। স্ত্রী সমাজে বিশ্বাস যে পিতামাতার "মরঞ্চা দোষ" হয়, তাঁহাদের পুত্র কন্যার নাম তাচ্ছল্যসূচক রাখিতে হয়, যথা "দুঃখী", "আপুর্ন্নী", "ফেলানী বা ফেলু" ইত্যাদি। শ্যামানন্দ মাতাপিতার মৃতাবশিষ্ট পুত্র বলিয়া, তাহার নাম "দুঃখী" রাখা হইল। ভক্তিরত্নাকরে যথা :—"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার। এখন "দুখীয়া" নাম রহুক ইহার॥ মাতাপিতা দুঃখ সহ পালন করিল। এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হইল॥" কোন কোন পদের ভণিতায় ইনি আপনাকে "দুঃখিনী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্যামানন্দ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। কিন্তু এই সময়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ জন্য তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রথমেই অম্বিকানগরে আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের স্থাপিত গৌর নিতাই মূর্ত্তিদর্শনে প্রেমে বিগলিত হইলেন; এবং বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। নবদ্বীপাদি প্রভুর লীলাস্থান গুলি দর্শন করিবার পর ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগের তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। আমরা রসিকমঙ্গল গ্রন্থ হইতে শ্যামানন্দের তীর্থ পর্য্যটন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বক্রেশ্বর বৈদ্যনাথ প্রথমে চলিলা। গয়া কাশী শিবস্থান সহরেতে গেলা॥"

মহাপ্রয়াগ গঙ্গা দক্ষিণে বাহিনী। ত্বরিতে মথুরা গিয়া উত্তরে আপনি ॥
হস্তিনা পাণ্ডবপুরী দেখি হরষিতে। দ্বারকা মিলিয়া প্রভু বড়ই ত্বরিতে ॥

*   *   *   *   *   *

তবে সিন্ধুপুরে কপিলের স্থানে গেলা। মৎস্য তীর্থে শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী আইলা
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক বিন্দুসরোবর। প্রভাস দর্শনে প্রভু চলেন সত্বর ॥
ত্রিতকুপায়ন তীর্থ বিশালা আইলা। ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা গেলা ॥
প্রাচী সরস্বতী নৈমিষারণ্য দেখিয়া। অযোধ্যানগরে প্রভু উত্তরে আসিয়া ॥
গুহক চণ্ডাল রাজ্য সরযূ কৌশিকী। পৌলস্ত্য আশ্রমে গেলা গোমতী গণ্ডকী ॥
ষোড়শ তীর্থেতে স্নান মহেন্দ্র পর্ব্বতে। গঙ্গাজন্ম হরিদ্বারে আইলা ত্বরিতে ॥
বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ। আনন্দে দেখেন প্রভু ব্যাসের আশ্রম ॥
তথা হৈতে কতদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে। পম্পা ভাগীরথী প্রভু আইলা ত্বরিতে ॥
পরেতে আইলা প্রভু সপ্ত গোদাবরী। ধেনু তীর্থে, শ্রীপর্ব্বতে, দ্রাবিড় নগরী ॥
বেঙ্কটাদি নামে গেলা কামকোষ্ঠীপুরী। কাঞ্চি হরিদ্বারায় দক্ষিণে মধুপুরী ॥
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরিলা। মলয় পর্ব্বত অগস্ত্যের যজ্ঞশালা ॥
বৈদ্যের ভবনে গেলা কলিঙ্গানগরে। দক্ষিণ সাগরে গেলা শ্রীঅনন্তপুরে ॥
ভ্রমি ভ্রমি পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে। মনের আনন্দে প্রভু করেন বিহারে ॥
গোকর্ণাখ্য, কুলালক, ত্রিগর্ত্তক নাম। দুর্ব্বেশনঃ আর্য্যা, নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণীধাম ॥
রেবা, মাহিষ্মতীপুরী, মল্লতীর্থ গেলা। সূর্পারক, প্রতিচিরি, সেতুবন্ধ গেলা ॥

*   *   *   *   *   *

অবন্তি জীয়ড় নরসিংহ গোদাবরী। দেবীপুর ত্রিমল্ল কূর্ম্মনাথের পুরী ॥
মনের আনন্দে প্রভু গেলা নীলাচলে। উত্তরিলা গিয়া পুরুষোত্তম নগরে ॥
কতদিন রহি গঙ্গাসাগরেতে গেলা। তথা হৈতে আসি জন্ম স্থান পরশিলা ॥
তবে প্রভু গেলা পুনর্ব্বার মথুরায়। রহিলা অনেক দিন আপন লীলায় ॥"

তৎপর দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যাইয়া বিশ্রাম ঘাট, ধীর সমীর, বংশীবট, চিরঘাট, আমলীতলা, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি সমস্ত লীলাস্থল দর্শন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম সমভিব্যাহারে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মহা পণ্ডিত হইলেন। এদিকে সাধনারাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সিদ্ধ হইলেন। শ্যামানন্দপ্রকাশ ও অভিরাম-লীলামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, দুঃখী কৃষ্ণদাস একদিন শ্রীরাসমণ্ডল পরিষ্কার করিবার সময়ে শ্রীরাধিকার একগাছি নূপুর প্রাপ্ত হয়েন; শ্রীরাধা স-

ললিতা দ্বারা ঐ নূপুর গাছি পুনঃ গ্রহণ করেন ; ললিতা নূপুরগাছি লইয়া যাইবার সময় উহা কৃষ্ণদাসের ললাট স্পর্শ করান ; ঐ নূপুর-চিহ্ন তিলকরূপে চিরকাল কৃষ্ণদাসের ললাটে বিরাজ করে। শ্রীজীব গোস্বামী সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক কৃষ্ণদাসের মহিমায় চমৎকৃত হইলেন এবং তদবধি তাঁহার নাম শ্যামানন্দ রাখিলেন। যথা প্রেমবিলাসে ঃ—

"সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ। আজ হৈতে তোমার নাম হৈল শ্যামানন্দ॥"

শ্যামানন্দপ্রকাশ বলেন ঃ—

"শ্রীজীব ললিতা কৃপা গুপতে করিলা। গুরুকৃপা শ্যামানন্দ নাম প্রকাশিলা॥"

শ্যামানন্দপ্রকাশমতে তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্যামানন্দ নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—"শ্রীরাধার একটী নাম শ্যামা। নূপুরপ্রদানে শ্যামার আনন্দ বিধান করিয়াছেন; অথবা শ্যামাই যাঁহার আনন্দেহেতু।"

শ্রীজীব গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে শ্যামানন্দ গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। শেষ জীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থিতি করিয়া তৎপ্রদেশস্থ লোকদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নরোত্তমবিলাসে যথাঃ—

"উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা সবার করিলা নিস্তার॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহু শিষ্য কৈলা।
তা সবার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা॥"

শ্যামানন্দের অসংখ্য শিষ্য মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। শ্যামানন্দ শ্রীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম অদ্বৈততত্ত্ব, উপাসনাসারসংগ্রহ ও বৃন্দাবনপরিক্রম।

(৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—ভক্তদিগ্‌দর্শনীর তালিকা অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ এবং ১৫০৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে লীলা সম্বরণ করেন। ইনি অম্বষ্ঠ-কুলজাত, পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। নিবাস নৈহাটীর সন্নিকট ঝামটপুর গ্রামে ছিল। ইনি শ্রীমৎ নিত্যানন্দপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণ ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্যামদাস নামে ইঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভগীরথ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কবিরাজি করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যখন কৃষ্ণদাসের বয়ঃক্রম ৬ বৎসর ও শ্যামদাসের ৪ বৎসর, তখন ভগীরথের মৃত্যু

হয়। ইহার অনতিবিলম্বে সুনন্দাও পরলোক গমন করেন। ঝামটপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ভগীরথের এক অপুত্রা বিধবা সহোদরা ছিলেন; তাঁহার মৃত পতির কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে অনায়াসে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই মহিলা মাতৃ-পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে নিকটে লইয়া গিয়া পালন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তদীয় পিতৃষসার মৃত্যু হইলে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিলেন। পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেই সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বন করিবেন মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির হইল। বাল্যে কৃষ্ণদাস গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ কেতাবতি বাঙ্গলা মাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃষসার মৃত্যুর পর ভ্রাতার প্রতি সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া প্রায় বিংশতি বৎসর সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। ইহার প্রণীত "চৈতন্যচরিতামৃত" "গোবিন্দলীলামৃত" "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা" "স্বরূপবর্ণন" "বৃন্দাবনধ্যান" ও ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত "সূচক" পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদিতে ইহার কিরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। কাহার কাহার মতে কৃষ্ণদাসের রচিত আরো পাঁচখানি গ্রন্থ ছিল; যথা, চৌষট্টি দণ্ডনির্ণয়, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, ও রাগময় করণ*। শেষখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণদাসের নামে অনেক ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার একখানিও ইহার রচিত নহে, কেননা সহজিয়াদের ধর্ম্মের নামে কুকর্ম্ম কৃষ্ণদাসের ন্যায় ধার্ম্মিকের দ্বারা কীর্ত্তিত হইতে পারে না। **

প্রবাদ আছে, নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণদাসের মনোগত ভাব জানিতে পাইয়া, স্বয়ং ঝামটপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদাসকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় ভৃত্য মীনকেতন রামদাসকে দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। এই প্রবাদটী তত্ত্বনিধি মহাশয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কৃষ্ণদাস নিঃসম্বলে কেবল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নানাদেশ পর্য্যটন ও নানাতীর্থ দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীমৎ রূপগোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গোস্বামীদিগের উৎসাহে কৃষ্ণদাস প্রথমে "গোবিন্দলীলামৃত" তৎপর "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা" লিখেন। উভয়া

---

* দীনেশ বাবুর পুস্তকে কি ইহাকেই "রাগময়ী-কণা" বলিয়াছেন?

** ইহার রচিত আরো কয়েকখানি গ্রন্থ—পাষণ্ডদলন, বৃন্দাবনপরিক্রম, রাগরত্নাবলী, শ্যামানন্দপ্রকাশ, সারসংগ্রহ।

গ্রন্থপাঠে স্বামিপাদগণ পরম পরিতোষ লাভ করেন। পরে গোস্বামীদিগের অনুমতিক্রমে তিনি "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হয়। এই সময়ে কৃষ্ণদাসের শারীরিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকর্ত্তাই লিখিয়াছেন। যথাঃ—

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি॥"

যাহা হউক ১৫০৪ শকে বৃদ্ধ কবিরাজ জরা ও ব্যাধির করকবল হইতে পরিত্রাণ পান। ঐ শকে ভক্তিগ্রন্থ সকল (তন্মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল) লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌড়ে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক গ্রন্থনিচয় অপহৃত হওয়াতে, শ্রীজীবের নিকট আচার্য্যরত্ন সংবাদ প্রেরণ করেন। এই তত্ত্বশ্রবণে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণ পরম দুঃখিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস এতই শোকাকুলিত হয়েন, যে শোকাবেগে রাধাকুণ্ডনীরে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

অনেকে পুত্রশোকেও প্রাণ পরিত্যাগ করে না; কিন্তু গৌড়মণ্ডল বৈষ্ণবগ্রন্থ-রসাস্বাদে বঞ্চিত হইল, এই খেদে কৃষ্ণদাস তনুত্যাগ করিলেন। একি সামান্য স্বদেশহিতৈষিতা! সামান্য লোকপ্রিয়তা। সামান্য পরহিতেচ্ছা!! কবিরাজ গোস্বামী অতি বৃদ্ধবয়সে মরিয়াছিলেন; কিন্তু যদি অপেক্ষাকৃত যৌবন সময়েও প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহাতেও আক্ষেপের কারণ ছিল না। কেননা, কবিরাজ গোস্বামী মরিয়াও এই মর জগতে অমর। যে পর্য্যন্ত জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম থাকিবে; যে পর্য্যন্ত জগতে মহাগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত জগতে ভক্ত ও পণ্ডিতের আদর থাকিবে; ততদিন কৃষ্ণদাস অমর। "সরকার ঠাকুর" বলিতে যেমন শ্রীখণ্ডের নরহরিকে বুঝায়; "আচার্য্যরত্ন" বলিতে যেমন শ্রীনিবাসাচার্য্যকে বুঝায়; "ঠাকুর মহাশয়" বলিলে যেমন নরোত্তম দাসকে বুঝায়; "কবিরাজ গোস্বামী" বলিলে তদ্রূপ একমাত্র কৃষ্ণদাসকেই বুঝায়। ইনি বৈষ্ণব-কবি-কুলের "রাজা"ই বটেন! আবার "কবিরাজ" অর্থে যদি চিকিৎসক বল, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, ইনি একজন অসাধারণ কবি-রাজ (বৈদ্য)। কারণ, ভবরোগে চৈতন্যচরিতামৃতের মত বীর্য্যবান্ ঔষধ আর কি আছে? চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এই, যখন শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত ভক্তিগ্রন্থনিচয় প্রেরণ

করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী গ্রন্থের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি সকল গ্রন্থের উপর রহিয়াছে, যদিও শ্রীজীব ইহা অনেক গ্রন্থের নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীজীব যেন ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের অনেক ভাটিতে যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থ ডুবিল না, ভাসিতে ভাসিতে উজান বাহিয়া মদন-গোপালের ঘাটে আসিয়া লাগিল। ইহাতে শ্রীজীব বৈষ্ণব-জগতে দেখাইলেন উক্ত গ্রন্থ মদনগোপালের প্রিয় সামগ্রী ও অমর। এই প্রবাদ সত্য হউক আর না হউক, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় যে সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশ্বকোষ-সম্পাদক বলেন "কৃষ্ণদাসের স্বহস্তলিখিত চরিতামৃত অদ্যাবধি রাধা দামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া আসিতেছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝামটপুরগ্রাম কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান। অদ্যাপি এখানে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিসেবা, কবিরাজ গোস্বামীর খড়ম এবং ভজন স্থান আছে। ১৮২০ শকাব্দে বিপিন দাস মহান্ত ঝামটপুরের সেবাধিকারী ছিলেন। এই মহান্ত মহাশয়ের মুখে শুনা গিয়াছে, কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত একখানি চরিতামৃত ঝামটপুরে আছে।*

---

* চৈতন্যচরিতামৃত একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ বটে, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ইহাতে কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইহাতে উদ্ধৃত গ্রন্থতালিকা দৃষ্টে পাঠক বুঝিবেন। তালিকাটী ১৩০৩ সালের অনুসন্ধানে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম।

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা (২) অমরকোষ (৩) আদিপুরাণ (৪) উত্তর চরিত (৫) উজ্জ্বলনীলমণি (৬) একাদশীতত্ত্ব (৭) কাব্যপ্রকাশ (৮) কৃষ্ণকর্ণামৃত (৯) কৃষ্ণসন্দর্ভ (১০) কূর্ম্মপুরাণ (১১) ক্রমসন্দর্ভ (১২) গরুড়পুরাণ (১৩) গীতগোবিন্দ (১৪) গোবিন্দলীলামৃত (১৫) গৌতমীয় তন্ত্র (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক (১৮) দানকেলিকৌমুদী (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২০) নাটকচন্দ্রিকা (২১) নৃসিংহ পুরাণ (২২) পদ্যাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্মপুরাণ (২৫) পাণিনিসূত্র (২৬) বরাহপুরাণ (২৭) বিষ্ণুপুরাণ (২৮) বিদগ্ধমাধব (২৯) বিশ্বপ্রকাশ (৩০) বীরচরিত (৩১) বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র (৩২) বৃহন্নারদীয় পুরাণ (৩৩) ব্রহ্মসংহিতা (৩৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (৩৫) বৈষ্ণবতোষিণী (৩৬) বেদান্ত দর্শন (৩৭) ভগবদ্গীতা (৩৮) ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ (৪০) ভক্তিলহরী (৪১) ভাবার্থদীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবত পুরাণ (৪৪) ভাগবতসন্দর্ভ (৪৫) মলমাসতত্ত্ব (৪৬) মহাভারত (৪৭) মনুসংহিতা (৪৮) যামুনাচার্য্যকৃতালকমন্দার স্তোত্র (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুবংশ (৫১) রূপ গোস্বামীর কড়চা (৫২) লঘু ভাগবতামৃত (৫৩) ললিতমাধব (৫৪) স্তবমালা ৫৫) শাশ্বততন্ত্র (৫৬) স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা (৫৭) সাহিত্যদর্পণ (৫৮) সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (৫৯) হরিভক্তি বিলাস (৬০) হরিভক্তিসুধোদয়।

দৈন্য ভগবদ্ভক্তের প্রধান লক্ষণ, এই জন্য গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই আপনাকে "দাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে যে ১৩ জন গোবিন্দের নামোল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পাঁচ-জনকে পদকর্ত্তা বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু "গোবিন্দ দাস" ভণিতাযুক্ত কোন্ পদটী যে কাহার, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, আমরা এস্থলে গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ কবিরাজ ও গোবিন্দ ঘোষের পরিচয় সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, পাঠকদিগের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলাম।

(১) গতিগোবিন্দ—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বিরচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থে গতি-গোবিন্দের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। যথা :—

"আচার্য্যের তিন পুত্র কন্যা তিনজন।
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন, মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ সর্ব্বগুণে বর্য্য॥"

এই গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ কবিরাজের সমকালবর্ত্তী, কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। একটী পদের ভণিতায় আপনাকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা :—"মনের আনন্দে শ্রীনিবাস সুত, গতিগোবিন্দ ভোর রে॥" গতিগোবিন্দের পুত্রের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ আচার্য্য; ইঁহারা পৈত্রিক নিবাস যাজীগ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণপ্রসাদের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর টেঞার এক ক্রোশ পশ্চিমস্থিত মালিহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম "বীররত্নাবলী"।

(২) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি বোরাকুলী গ্রামবাসী। পূর্ব্ববাস মহুলাগ্রামে ছিল। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও ভক্ত। ভক্তিরত্নাকরে যথা :—

"আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী। গীতবাদ্যবিস্তায় নিপুণ ভক্তিমূর্ত্তি॥"

তত্বনিধি মহাশয় বলেন "গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত চর্চ্চার ভাব ও প্রাবল্য দর্শনে, সকলে তাঁহাকে ভাবক চক্রবর্ত্তী নামে ডাকিতেন।" ইঁহার কৃত পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, বাছিয়া বাহির করিবার যো নাই। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা ৯ম পল্লবে "শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ" বর্ণনের একটী সুদীর্ঘ পদ আছে। বৈষ্ণবদাস তৎসম্বন্ধে বলেন "অথ চাতুর্ম্মাস্য বিস্তাপতিঠকুরস্য বর্ণনং ততো যন্মাস গোবিন্দ কবিরাজ ঠকুরস্য,

ধ্যে প্রথম চারিটী বিদ্যাপতিকৃত, তৎপরবর্ত্তী দুইটী পদ গোবিন্দ কবিরাজ বিরচিত এবং শেষ ছয়টী পদের রচয়িতা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, "এই বারমাস্যার পদগুলি বিদ্যাপতির ছিল; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর তাহা পূর্ণ করেন এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়াতে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কর্ত্তৃক ছয়টী পদরচিত হয়।"

(৩) গোবিন্দ কবিরাজ—ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, সারাবলী, কর্ণানন্দরস, মুক্তাচরিত, অনুরাগবল্লী, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত গ্রন্থে ইঁহার কোন না কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমরা দুই তিন খানির বিশেষ সাহায্য লইব। ভক্তমাল মতে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ, রামচন্দ্র কবিরাজ কনিষ্ঠ এবং ইঁহারা বুধরী গ্রামবাসী। উক্ত গ্রন্থ মতে ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই প্রথমে শাক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের বিবাহান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথে শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত দেখা হয়। রামচন্দ্র অতি রূপবান্ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "এমন সুন্দর পুরুষ যদি কৃষ্ণভজন করেন, তবে রূপ সফল হয়।" পরদিন রামচন্দ্র আচার্য্যের নিকট গমন করেন এবং আচার্য্য কর্ত্তৃক দীক্ষিত হয়েন। গোবিন্দের বয়ঃক্রম যখন ৪০ বৎসর, তখন ভয়ানক গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। কোনও চিকিৎসাতে কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না; গোবিন্দ জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। সংসারে গোবিন্দের একমাত্র পরম সুহৃদ রামচন্দ্র কবিরাজ। তিনি তখন গুরুপাট যাজীগ্রামে ছিলেন। একদা গোবিন্দ মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়া, স্বীয় পরমারাধ্যা দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিলেন; তখন দেবী তাঁহাকে আকাশবাণীতে কহিলেন, "বিপত্তে শ্রীমধুসূদন নামই সার। অতএব সেই বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীগোবিন্দের নাম স্মরণ কর, তিনি তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।" এই প্রবাদটীর তিনখানি গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। যথা :—

"হেনকালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥"

ভক্তিরত্নাকর।

"গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥"

প্রেমবিলাস।

"আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার। গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার॥"

ভক্তমাল।

আকাশবাণী শ্রবণ মাত্র, গোবিন্দ পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিলেন, "আপনি অনুনয় বিনয় করিয়া আচার্য্যপ্রভুকে বুধরী গ্রামে লইয়া আসিবেন। আমি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত। আচার্য্যপ্রভুর দ্বারা আমাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া উদ্ধার করাইবেন।" পত্র পাইয়া রামচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইলেন। বিষাদ ভ্রাতার পীড়ার জন্য; হর্ষ তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে মতি হইবার জন্য। রামচন্দ্র আচার্য্যপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন :—

"প্রভু তুমি আমাদের কুলের দেবতা। তোমা বিনা কেহ নাই মোসবার ত্রাতা॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল। কাতর হইয়া মোরে পত্র পাঠাইল॥"

ভক্তমাল।

দয়ার্দ্রহৃদয় আচার্য্যরত্ন সশিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত যাজীগ্রাম হইতে বুধরী গমনপূর্ব্বক গোবিন্দকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহামন্ত্র গ্রহণের পরেই গোবিন্দ রোগমুক্ত হইলেন।

উপরি উদ্ধৃত ভক্তমালের পয়ার হইতে জানা গেল, গোবিন্দ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে গোবিন্দকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। প্রেমবিলাসে যথা :—

"রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম। কেবল লালসা প্রভুর চরণ দর্শন॥
তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয় শ্রীগোবিন্দ। একোদরে দুই ভাই পরম স্বচ্ছন্দ॥"

নাভাজীকৃত মূল ভক্তমালে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে কি না আমরা বলিতে পারি না। বাঙ্গলা ভক্তমাল কৃষ্ণদাস বাবাজীকৃত; তিনি অনেক পরের লোক; সুতরাং তাঁহারই ভ্রম হইবার অধিক সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে প্রেমবিলাসরচয়িতা গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসাময়িক লোক; সুতরাং তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিলেও তিনি প্রেমবিলাসের সকল কথা প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না। কারণ তিনি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক কবি। তিনিও যখন গোবিন্দকে কনিষ্ঠ বলেন, তখন গোবিন্দের বয়োকনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ নাই। প্রেমবিলাসের [illegible] আর একটী কথা পাইতেছি। অর্থাৎ "রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তিলিয়া

বুধরী-নিবাসী চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং উক্ত বুধরী গ্রামে দুই সহোদরের জন্ম হয়।”

চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীখণ্ডবাসী এক চিরঞ্জীব সেনের উল্লেখ আছে; যথা :—

মুকুন্দদাস, নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥”

এই চিরঞ্জীব সেন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত। ভক্তিরত্নাকর-মতে প্রেমবিলাসোল্লেখিত চিরঞ্জীব সেনের ন্যায় ইনিও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং কণ্টক-নগরের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীতীরস্থিত কুমার-নগর ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত নীলাচলে গমনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেন। ইঁহারও রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ নামে দুই পুত্র ছিল। ভক্তি-রত্নাকরপ্রণেতা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী আরো বলেন, রামচন্দ্রের মন্ত্রগ্রহণের কিছুকাল পরে, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গদাধর দাস প্রভৃতির অপ্রকট বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বিবাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রস্থান করেন। ইহার এক মাস পর খণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী আচার্য্যরত্নকে গৌড়ে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। বৃন্দাবন যাইবার সময় রামচন্দ্র গোবিন্দকে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক “গঙ্গাপদ্মাবতী মধ্যস্থান পুণ্যক্ষেত্র তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ করেন।” তদনুসারে গোবিন্দ অনতিকাল বিলম্বে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বুধরীগ্রামে যাইয়া বাস করেন।

প্রেমবিলাসরচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ দাস স্বয়ং শ্রীখণ্ডবাসী এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় যে, ইনি অনেক সময়ে শ্রীনরহরি সরকারের দক্ষিণ পার্শ্বে চিরঞ্জীব সেনকে ও বামভাগে সুলোচন দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে এই চিরঞ্জীবের পুত্র, তাহা গ্রন্থের কুত্রাপিও উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও বুধরীবাসী চিরঞ্জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহারা আরো অনুমান করেন যে, পরম বৈষ্ণব চিরঞ্জীব সেনের পুত্রদ্বয় মহাশাক্ত ছিলেন, এ কথা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল যুক্তি যে খুব সারবান, তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস হয় যে, দুই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। তাহা না হইলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জীবনবৃত্তান্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক [illegible] ঐক্য থাকিতে পারে না। গোল বড় বিষম, কিন্তু আমরা [illegible]
[illegible]

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলি, যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে মূল বৃত্তান্তের যখন সম্যক্ মিল, তখন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনই ইহাদিগের পিতা এবং প্রেমবিলাসোক্ত চিরঞ্জীব আর ইনি অভিন্ন ব্যক্তি। আমরা আরো অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমারনগর মাতামহালয়েই হইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বলিয়াছিলেন, "তিলিয়াবুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়" বোধ হয় তাহার অর্থ এই যে, "আমি বুধরী গ্রামবাসী"। হয়ত শ্বশুর দামোদর সেনের সহিত কোন বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াতে চিরঞ্জীব সেন শ্বশুরালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শিশুপুত্রদ্বয় লইয়া কিছুদিন বুধরী গ্রামেবাস করিয়া থাকিবেন এবং বুধরী থাকিতে থাকিতেই রামচন্দ্র ও গোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন; তখন হয়ত চিরঞ্জীব সেন ইহলোকে নাই। হয়ত মাতামহের পরলোকগমনের পর সহোদরদ্বয় মাতামহ বিত্ত পাইয়া পুনরায় কুমারনগরে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার কুমারনগর বসবাস করিবার অল্পকাল পরেই হয়ত রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। তখন কুমারনগরে "বাসের সঙ্গতি ভাল নয়", এবং তাহা "উৎপাতপূর্ণ", সুতরাং "সদা মনে অতিশয় আশঙ্কা" উপস্থিত হওয়াতে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-বাস বুধরীতে যাইয়া বাস করিবার জন্য রামচন্দ্র গোবিন্দকে উপদেশ প্রদান করিয়া যান। আমাদিগের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাঁড়াইল।—

(১) চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্ববাস শ্রীখণ্ডগ্রামে; শ্বশুরালয় কুমারনগরে।

(২) চিরঞ্জীব কুমারনগরবাসী দামোদর সেনের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই কিছুদিন বাস করেন। এইস্থলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে চিরঞ্জীব দুই পুত্র লইয়া তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই বুধরীগ্রামে চিরঞ্জীবের মৃত্যু হয়।

(৪) ভ্রাতৃদ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর, বুধরী হইতে পুনর্ব্বার কুমারনগরে যাইয়া বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় পূর্ব্ববাস বুধরীতে যাইয়া বাস করেন এবং সেইস্থলেই গোবিন্দের জীবনাবসান হয়।

আমরা বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপরে যে সকল অনুমিতি বা যুক্তির আশ্রয় লইয়াছি, তাহা যে সত্য, নির্দ্দোষ ও অভ্রান্ত, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করি না। এবং আশা করি অতঃপর কোন তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তত্ত্বের নির্ভুল মীমাংসা করিবেন।

রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে প্রথম ভ্রাতা বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ও দ্বিতীয় ভ্রাতা চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, একথা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিনা। শ্রীনিবাসাচার্য্যের একটী কথায় রামচন্দ্রের মন এমন ফিরিয়া গেল যে, তিনি সেইজন্য শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইলেন; আমাদের এরূপ বিশ্বাস হয় না। বরং আমাদের বিশ্বাস যে তিনি বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না, শাস্ত্রপাঠে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এমন সময়ে আচার্য্যরত্নের কথায় ও তাঁহার মহিমা জানিতে পারিয়া তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোবিন্দের ধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা অযৌক্তিক নহে! তিনি বলেন, "গোবিন্দ বাল্যাবধি শক্তি-উপাসক ছিলেন। পিতা চিরঞ্জীব গৌরভক্ত হইলেও, গোবিন্দ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বীয় মাতামহ দামোদর পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন। এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন।" আমাদিগের তথাপি বিশ্বাস, যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রারম্ভ হইতেই পিতৃধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তবে গোবিন্দের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের যে আখ্যায়িকা দুই তিনখানি গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত প্রকটন করিতেছি, তখন শাক্ত বৈষ্ণবে ঘোর দ্বন্দ্ব। উভয়ে উভয়কে জব্দ করিবার জন্য স্বমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেন। গোবিন্দের জীবনীতে যেরূপ বিবরণ দেখিতেছি, প্রায় তৎসদৃশ বিবরণ চণ্ডীদাসের জীবনেও দৃষ্ট হয়। এই সকল আখ্যায়িকার সহিত সত্যের সংশ্রব কতটুক আছে, আমরা তাহা স্থির করিতে অশক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা যে কেবল বিশ্বাস করি এরূপ নহে, উহা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাই বলিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বঘটিত কোনপ্রকার গোঁড়ামিতে আমরা যোগ দিতে পারি না।

গোবিন্দের মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেনকে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী মহাকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥"

গোবিন্দদাস স্বপ্রণীত সঙ্গীতমাধব নাটকেও মাতামহের কবিত্ব শক্তির বিশেষ [illegible] করিয়াছেন। যথা :—

"পাতালে বাসুকী বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা, খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই যে আচার্য্যপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্র, গোবিন্দদাসের বদন-সরোরুহ হইতে নিম্নলিখিত অমৃতধারা নিঃস্যন্দিত হইয়াছিল :—

"ভজহুঁরে মন, নন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে"। ইত্যাদি।

এই কবিতা শ্রবণমাত্র আচার্য্যপ্রভু গোবিন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনের সঙ্গে তাঁহাতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক কহিলেন :—

"গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।
নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুণ চয়॥
স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে রচিলা॥"

শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে গোবিন্দদাস নির্য্যাসতন্ত্রমতে সাধন করিতে ও রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্য্যাসতন্ত্র একখানি কুলার্ণব গ্রন্থ; ইহাতে গোপী ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বিধি আছে। এই ভজনের বলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দ সর্ব্বদা স্ব স্ব হৃদয়ে নিকুঞ্জলীলা সন্দর্শনপূর্ব্বক, তাহা কবিতায় বর্ণন করিতেন। কিছুদিন পর আচার্য্য প্রভু গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দকে বিদ্যাপতির একটী অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দদাস সে পদ এমন সুন্দর করিয়া পূরণ করেন, যে আচার্য্যপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দ সংস্কৃতে "সঙ্গীতমাধব নাটক", রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অষ্টকালীয় একান্নপদ ও গৌরলীলাত্মক বহু বাঙ্গলাপদ রচনা করেন। সংস্কৃত পদও কয়েকটী দৃষ্ট হয়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত (রাজোপাধিধারী) গোবিন্দদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহারই অনুরোধে "সঙ্গীতমাধব নাটক" রচনা করেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। "পদকল্পতরু ও পদকর্ত্তৃ-মহাজনগণ" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশক্রমে তিনি বিদ্যাপতির কোন কোন অসম্পূর্ণ পদ পূর্ণাঙ্গ করেন। বিদ্যাপতির 'প্রেম কি অঙ্কুর' পদ এইরূপেই

হয়। এইরূপ পদের টীকাস্থলে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে লিখিয়াছেন, যথা :—'বিদ্যাপতিকৃত ত্রিচরণগীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণকৃতং।' 'বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ এই যুক্ত নামের ভণিতাসমন্বিত পদগুলি গোবিন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত বা পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত গোবিন্দদাসের অপর অনেক পদেও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা :—"গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥" এই রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইঁহার বন্ধু ছিলেন বলিয়া পদের শেষে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোবিন্দের কোন পদে এইরূপ আছে যথা :—

'রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ, গোবিন্দদাস পরমান।'

এস্থলে তিনি পক্কপল্লীর কবি-নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন মাত্র।"

ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাসের "কবিরাজ" উপাধি প্রদানের দুইটী স্বতন্ত্র উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের উপাখ্যান হইতে তাহার প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

প্রথম উপাখ্যান। শ্রীনিবাসাচার্য্য কিছুদিন গোবিন্দের গৃহে অবস্থিতি করিয়া তদীয় কবিত্বশক্তির নব নব উন্মেষাবলোকনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহাকে মহাপ্রভুর লীলাময় পদ রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতন্য-লীলা-গীতামৃত বিতরণে স্বীয় ইষ্টদেবকে পরিতুষ্ট করিতেন। তাহাতে আচার্য্যরত্ন প্রীত হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান। গোবিন্দদাস জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন; তথায় পরমেশ্বরী দাস গোবিন্দকে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। গোস্বামী পাদগণ গোবিন্দদাসবিরচিত "সঙ্গীতমাধব" নাটক শ্রবণ ও তদীয় অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। গোস্বামী প্রভুগণ মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

গোবিন্দ কবিরাজের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর এতই স্নেহ হইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ব্রজধামবাসী মহান্তগণের সংবাদসম্বলিত পত্র গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিতেন। উঁহার কোন কোন পত্রে গোবিন্দকে তাঁহার [illegible]

পদ প্রেরণ করিতে লিখিতেন। গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে যে, খেতুরীর মহোৎসবে একদা প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোকুলদাস কীর্ত্তনিয়ার মুখে গোবিন্দের একটী কীর্ত্তন শ্রবণান্তর এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে;—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥"

কথিত আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদাস মিথিলা দেশের অন্তর্গত বিসপী (বিসফী) গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি মন্দির সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এবং তথা কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী গোবিন্দের অনুরোধে কিছুদিন তদীয় আলয়ে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন। রামচন্দ্রও গোবিন্দ দেবীর সঙ্গে সঙ্গে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস মধ্যে মধ্যে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের ও যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে গমন করিতেন এবং প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পদকর্ত্তা বসন্তরায় গোবিন্দদাসের পরম বন্ধু ছিলেন। মধ্যে মধ্যে রসঘটিত তরজার লড়াই উভয়ের মধ্যে হইত। একজন কবিতায় প্রশ্ন করিতেন, অপরজন কবিতায় উত্তর করিতেন। এই সকল মধুর পদ পদসমুদ্রে আছে। শেষ বয়সে কবি তাঁহার পদগুলি একত্র সংগ্রহ করেন। ভক্তিরত্নাকরে যথা:—

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদ রত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে॥"

গোবিন্দ কবিরাজ মধ্যে মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে যাইয়া স্বীয় বন্ধু বসন্তরায়ের সঙ্গে কবিতায় তরজার লড়াই করিতেন, এই সকল বিবরণ ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু ইতিহাসের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভক্তিনিধি মহাশয়ের এই কথা কল্পনা-বিজৃম্ভিত। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় ছিলেন; এবং গোবিন্দদাসের কোন্ কোন্ পদে বসন্তরায়ের উল্লেখ আছে, এই দেখিয়া ভক্তিনিধি মহাশয় কল্পনার আশ্রয় লইয়া এক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পাঠকগণ জানেন, এই দুই বসন্তরায় ভিন্ন ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় কায়স্থ ও শাক্ত ছিলেন; গোবিন্দদাসের বন্ধু বসন্তরায় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভক্তিনিধি মহাশয় "দ্বিজরাজ" উপাধিটার প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই প্রাগুক্ত ভ্রমে [illegible] হইতেন না। ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন, "নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, নিত্যা-

নন্দ তনয় বীরচন্দ্র প্রভৃতি পূজ্যতম মহাপুরুষগণ গোবিন্দ কবিরাজের মুখে তৎকৃত গীত শ্রবণে পুলকিত হইতেন।"

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে মন্ত্র গ্রহণ করেন। এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন, এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "রোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপ 'ভজন' ও 'বর্ণন' করিয়া 'ছত্রিশ বৎসর' কাল কীর্ত্তন গান করেন।" উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন; তৎসঙ্গে ৩৬ বৎসর কীর্ত্তন-ব্যবসায় কালযোগ করিলেও মৃত্যু সময়ে তাহার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হয়। গোবিন্দের বয়স যখন ২৫ কি ২৬ বৎসর, তখন তদীয় পত্নী মহা-মায়ার গর্ভে তাঁহার দিব্যসিংহনামে এক পুত্র জন্মে। গোবিন্দের লোকান্তর গমনের পর দিব্যসিংহ জীবিত ছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই মাত্র জানা যায় যে তিনি পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন।* দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। দীনেশ বাবুর মতে পদকল্পতরুর "কবিনৃপবংশজ ভুবন-বিদিত যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" এই ব্যক্তি। গোবিন্দের "কর্ণামৃত" নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও আছে।

(৪) গোবিন্দঘোষ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা দশম পরিচ্ছেদে মহা-প্রভুর শাখাগণনায় একবার ইঁহার নাম আছে; যথা:—

"গোবিন্দমাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাসবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী॥"

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র লেখা আছে যে, প্রভু নিত্যানন্দ যখন গৌড়মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে আইসেন, তখন বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ তাঁহার সঙ্গে আইসেন, কিন্তু "প্রভু সঙ্গে (নীলাচলে) গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ।" চরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৩ পরিচ্ছেদে আবার গোবিন্দ ঘোষের নাম পাওয়া যায়। যথা:—

"গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস মাধব যাঁহা গায়॥"

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম। ক্ষীরোদ

[illegible] নাম চৈতন্যভাগবত [illegible] খণ্ড ৮ম অধ্যায় অনুসারে "গোবিন্দানন্দ"। কেহ যদি বলেন "গোবিন্দানন্দ" অন্য কাহারও নাম, গোবিন্দঘোষের নাম নহে। তাহার প্রতিবাদ আমরা করিব না। কিন্তু আমাদের অনুমান যে সম্ভবপর তাহার যুক্তি দেখাইতেছি। বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ তিন সহোদর। তন্মধ্যে নিমাঞীসন্ন্যাসের একটী পদে বাসুঘোষ আপনাকে "বাসুদেবানন্দ" বলিয়াছেন আর নিজের নাম কেহ ভুল বলে না। চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে মাধবঘোষকে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্পষ্টাক্ষরে "গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং অবশিষ্ট ভ্রাতার নামের শেষে "আনন্দ" থাকিবারই সম্ভাবনা।

বৈষ্ণবাচরদর্পণে লিখিত আছে ঃ—

"শ্রীগোবিন্দঘোষ বলি যাঁহার খেয়াতি ॥
গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস।
শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ ॥"

প্রচলিত প্রবাদানুসারেও অগ্রদ্বীপ গোবিন্দানন্দ ঘোষের পাট ও তত্রত্য গোপীনাথ বিগ্রহ ঐ গোবিন্দঘোষের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অজ্ঞাতনামা জনৈক বিজ্ঞ লেখক ভূতপূর্ব্ব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "শ্রীপাট বিবরণে" এ বিষয়ে বড় গোল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "অগ্রদ্বীপে শ্রীমাধবঘোষের পাট এবং অত্রস্থ শ্রীগোপীনাথ ঐ মাধবঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা যে একটী অতি প্রাচীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিলে এই সেবা বাসুদেব ঘোষের বলিয়া প্রতীতি হয়।" আমরা এই বিজ্ঞ লেখকের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার বাক্যের প্রথমাংশ ভিত্তিশূন্য ও প্রমাণশূন্য। দ্বিতীয় অংশও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তাহার কারণ "বাসুদেব ঘোষ" ও "মাধবঘোষ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। "প্রাচীন-পদ"টী গোপীনাথদেবের বন্দনা*। উহা ১২৩৯ সালে রচিত, উহার রচয়িতার নাম

---

* "প্রণাম করিএ এবে করি জোড় হাত। অগ্রদ্বীপের মাঝে বন্দো গঙ্গা গোপীনাথ ॥
ধন্য ধন্য অগ্রদ্বীপ অবনী ভিতর। যাহার নিকটে বহে গঙ্গা নিরন্তর ॥
সেইস্থানে বাসুঘোষ করিলেন বাস। জীব তরাবার লাগি সেবার প্রকাশ ॥
ভকতবৎসল হরি ফেরেন ভক্ত সাথ। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভু গোপীনাথ ॥
একত জাহ্নবী আছেন পতিতপাবনী। আর তাহে অবতীর্ণ হৈলেন চক্রপাণি ॥
* * * *

ভট্টবাঞ্ছারাম। প্রবন্ধটী ১৩০৫ সালে লিখিত, সুতরাং উক্ত পদের বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর। এরূপ স্থানে পদটীকে "অতি প্রাচীন" বলা উচিত হয় নাই; কেননা অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় ৬৬ বৎসর "প্রাচীন"ও নহে। আবার ভট্টবাঞ্ছারাম একজন নগণ্য লেখক, তাঁহার লেখার উপর নির্ভর করিয়া অতি প্রামাণিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ অগ্রাহ্য করা, যারপর নাই অন্যায়।

গোবিন্দঘোষেরা কায়স্থ ছিলেন, সদ্গোপ ছিলেন না। গোবিন্দঘোষকে, লোকে সাধারণতঃ "ঘোষ ঠাকুর" বলে। ঠাকুর (ঠক্কুর) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের উপাধি, নবশাকের নহে। তিন ভ্রাতা প্রথমে গৃহত্যাগী উদাসীন ছিলেন, নবদ্বীপেই বাস ছিল। পরে বাসুঘোষ তমলুকে, মাধব ঘোষ দাঁইহাট, এবং গোবিন্দঘোষ অগ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। মাধব ও বাসু বিবাহ করেন নাই, গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের আদেশে অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া গৃহী হয়েন এবং তাঁহার একটী পুত্রও জন্মিয়াছিল। বিশ্বকোষকার বলেন "কেহ কেহ বলেন অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কাহারও মতে বৈষ্ণবতলায় তাঁহার জন্ম স্থান। এখনও তথায় ঘোষ উপাধি-ধারী যে কয়েক ঘর কায়স্থের বাস আছে, ঘোষ ঠাকুর সেই কুলে জন্ম গ্রহণ

বাসুঘোষ বড় ভক্ত শুন সর্ব্বজন। যার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে করয়ে ঘোষণ ॥
যাহাকে বলিলেন পিতা প্রভু নারায়ণ। মধুকৃষ্ণা একাদশী অপ্রকট হন ॥
গোপীনাথ কুশ ধরি মচ্ছোব করান। দেশ বিদেশের লোক করেন আহ্বান ॥
ভক্তবৎসল প্রভু ভক্ত আজ্ঞাকারী। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন পীতাম্বর ছাড়ি ॥
কিবা সে মাধুর্য্যরূপ তাহে কারিগরি। সভাতে বসিয়া প্রভু হাতে কুশ ধরি ॥
কুশ ধরি সেই হরি করেন তর্পণ। এই লীলা করেন প্রভু নন্দের নন্দন ॥
মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি দেন গঙ্গাজল। অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল ॥
ভকতের প্রাণ তিনি ভকত তাহার। ভক্ত লাগি অগ্রদ্বীপে কৈলা অবতার ॥

* * * *

মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি রাজবেশ ধরি। কিবা সে মাধুর্য্য হয় বামেতে কিশোরী ॥
কিশোরাকিশোরী সভে কর দরশন। দেখিয়া দোঁহার রূপ জুড়ায় নয়ন ॥
কাতর হইয়া ভট্ট বাঞ্ছারাম বলে। আমার পিতাকে প্রভু রেখ পদতলে ॥
আমি অতি হীনমতি না জানি ভজন। যেন সকুটুম্ব পরিবারে পায় শ্রীচরণ ॥"

ইতি শ্রীগোপীনাথের বন্দনা সমাপ্ত। সন ১২৭৯ সাল, ২২এ কার্ত্তিক।

করেন। আবার কেহ বলেন, ঘোষ ঠাকুর উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায়, তিনি জীবনে উদাস হইয়া গঙ্গাতীরে অগ্রদ্বীপ আসিয়া বাস করেন।"

আমরা উপরে বলিয়াছি, গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট ছিলেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন অন্যান্য বহু ভক্তের সহিত গোবিন্দও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিয়াছিলেন। কোন গ্রামে ভিক্ষাগ্রহণের পর গৌরাঙ্গ মুখশুদ্ধি চাহিলেন, গোবিন্দ ঘোষ গ্রাম হইতে একটী হরীতকী আনিয়া, তাহার অর্দ্ধখণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রদান করিলেন, অপরার্দ্ধ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপ যাইয়া আহারান্তে গৌরাঙ্গ পূর্ব্বদিনের ন্যায় মুখশুদ্ধি চাহিলেন, গোবিন্দ পূর্ব্বসঞ্চিত হরীতকীর অর্দ্ধাংশ শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রদান করিলেন। তিনি হরীতকীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক গোবিন্দ ঘোষের পরিত্যাগকাহিনী অল্পবিস্তর প্রভেদের সহিত চারিজন লেখক বর্ণন করিয়াছেন। আমরা টীকায় তৎসমস্ত উদ্ধার করিয়া দিলাম। *

---

* (১) "একদা গৌরাঙ্গদেব আহারান্তে মুখশুদ্ধি চাহিলেন, গোবিন্দ ঘোষ তাঁহাকে একটী হরীতকী প্রদান করিলেন। তখন চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু তুমি আজ হইতে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ।

(২) "একদিন ভোজনের পর গৌরাঙ্গ মুখশুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া একটী হরীতকীর একখণ্ড তাঁহাকে দিলেন। পরদিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন, এবং মুখশুদ্ধি চাহিলেন; গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ হরীতকী বাহির করিয়া দিলেন। তখন চৈতন্য কহিলেন, "তোমার এখনও সংসারবাসনার তৃপ্তি হয় নাই। অতএব আমার সহিত তোমার যাওয়া হইবে না।"—

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—নবদ্বীপমহিমা।

(৩) "একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা করিয়া মুখশুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন, তখন নিকটে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন। তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন এবং একটী হরীতকী আনয়ন করিয়া প্রভুকে তাহার অর্দ্ধখণ্ড দিলেন, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধ খণ্ড বহির্ব্বাসে রাখিয়া দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে গমন করিলেন। আহারান্তে আবার সেইরূপ হস্ত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ তাহার বহির্ব্বাসে

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে গোবিন্দ অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ গোবিন্দকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি বিষাদ করিও না, তোমার দ্বারা আমি ভগবানের মহিমা প্রচার করাইব বলিয়া তোমাকে দৃশ্যতঃ পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু অচিরে তোমার সহিত মিলিত হইব, সে মিলন তোমার জীবনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে।" বিশ্বকোষ-কারও বলেন, "অনেক কহিয়া বলিয়া চৈতন্যদেব ঘোষ ঠাকুরকে গৃহে প্রতি-প্রেরণ করিবার কালে বলিয়া দিলেন—" যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আমার দেখা পাইবে। যদি কোন অলৌকিক জিনিস পাও, অতিযত্নে রাখিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পর একদিন ঘোষ ঠাকুর গঙ্গাস্নান করি-তেছেন, এমন সময় একটী জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠে ঠেকিল। গোবিন্দ দেখিলেন, ওখানি একখানি শবদাহের ক্ষুদ্র কাষ্ঠ, কিন্তু খুব ভারী। কাষ্ঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখাই-লেন, "গোবিন্দ! ভুলিও না, সেই কাঠখানি আনিয়া যত্নে তুলিয়া রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।" গোবিন্দ সেই রাত্রে কাঠখানি গৃহে আনিয়া দেখিলেন, উহা কৃষ্ণশিলা। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন, দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহার কুটীরদ্বারে বহু ভক্ত সহ উপস্থিত। গোবিন্দ

যে অর্দ্ধখণ্ড হরীতকী বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। * * তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, গোবিন্দ! এখনও তোমার সঞ্চয় বাধা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, অতএব তুমি আমার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না।"— চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা।

(৪) "একদিন আহারান্তে হরীতকীর জন্য হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ ঘোষ দৌড়িয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে হরীতকী আনিয়া প্রভুকে দেন। পরদিনও প্রভু হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ পূর্ব্বদিবস-আনীত হরিতকীর কয়েকটী রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই একটী প্রভুকে দিলেন। হরীতকী তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া প্রভু গোবি-ন্দের প্রতি চাহিলেন এবং যখন জানিলেন যে, গোবিন্দ হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন বলিলেন, তোমার সঞ্চয়বুদ্ধি যায় নাই, তুমি এই স্থানেই থাক এবং গোপীনাথের সেবা প্রকাশ কর, গোবিন্দ সেই আদেশেই অগ্রদ্বীপ থাকিয়া যান।"— শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি—শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

ভিখারী, তিনি লোকসংঘট্ট দেখিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য চিন্তিত হইলেন। কিন্তু যাঁহার অনুগ্রহে একগাছি শাককণা দ্বারা বহুশিষ্য-সমভিব্যাহারী দুর্ব্বাসার পারণ নিষ্পন্ন হইয়া ধ্বংসোন্মুখ পাণ্ডববংশ রক্ষা পাইয়াছিল, তিনি স্বয়ং যখন গোবিন্দের দ্বারে উপস্থিত, তখন গৌরভক্তগণের আহার জন্য ভক্তপ্রবর গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের চিন্তার কারণ থাকিতে পারে না। গৌরাঙ্গের আগমনবার্ত্তা পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু আনিয়া উপস্থিত করিল। গৌরাঙ্গের ভোজন হইল, ভক্তগণ সহ গোবিন্দ ঘোষ প্রসাদ পাইলেন। গোবিন্দের সংরক্ষিত শিলা দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে এক বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে, আমি তাহার প্রতিষ্ঠা করিব, তুমি তাহার সেবাইত হইবে।" এইরূপে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গোবিন্দ ঘোষকে কহিলেন, "তুমি এইখানে থাক, এই ঠাকুরের সেবা কর এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হও। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান্ তোমা দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল।" এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দ বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্র সন্তানও জন্মিল। কিছুদিন পর গোবিন্দের পত্নী পরলোক গমন করিলেন। তখন গোপীনাথের সেবা ও পুত্রের পালন উভয়েই গোবিন্দের স্কন্ধে পতিত হইল। গোবিন্দ কষ্টে সৃষ্টে কিছুদিন উভয় ভারই কুলাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্যক্ মন এখন আর গোপীনাথের প্রতি নাই। একদিকে গোপীনাথের প্রতি ভক্তির আকর্ষণ, অপরদিকে শিশুপুত্রের প্রতি অপত্যস্নেহের আকর্ষণ। দুই আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গোবিন্দ কেমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ভক্তবর চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর সুন্দর প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "তাঁহার মন এখন দুইজনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে মনের মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন—এই গোপীনাথ, আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন, এই তাঁহার পুত্র; কখনও গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন; কখনও পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে

দেন। কখনও গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রকে সেবা করেন; কখনও পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন।” এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান্ পুত্রটীকে হরণ করিয়া, পিতার আত্মার উদ্ধার সাধন করিলেন। কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দের শিশু পুত্র শিশু রঘুনন্দনের ন্যায় গোপীনাথ বিগ্রহকে মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেবাগ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই কথা লোকসমাজে প্রচার করিবামাত্র মুখে রক্ত উঠিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, পুত্রশোকে অধীর হইয়া গোবিন্দ গোপীনাথের সেবা বন্ধ করিলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে বা আকাশবাণীতে গোবিন্দকে কহিলেন, “যার এক পুত্র মরে, সে কি অনাহারে অপর পুত্রকেও মারে?” গোবিন্দ কহিলেন, “আমার পুত্রের দ্বারা আমার ও আমার পিতৃপুরুষগণের জলপিণ্ডের আশা ছিল; তোমার সেবা করিয়া আমার কি লাভ হইবে?” ভগবান্ ভক্তের ভক্ত—ভক্তের দ্বারে সদা বাঁধা। গোবিন্দকে কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—“আমি চিরদিন তোমার মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করিব। আমার ক্ষুধায় উদর জ্বলিয়া যাইতেছে, শীঘ্র খাইতে দাও”। তখন ঘোষঠাকুর ভক্তি-গদগদচিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় গোপীনাথের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে হউক, বা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অনুরোধেই হউক, বর্ষে বর্ষে ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের মুখে শুনিয়াছি, শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িবার সময় গোপীনাথের গলায় কাছা ও হস্তে কুশ থাকে। মন্ত্র শেষ হইবামাত্র, স্বতঃই শ্রীহস্তের অঙ্গুলি হইতে কুশ নিপতিত হয়। বিংশশতাব্দীর সভ্যতালোকে আলোকিত মহাত্মারা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন ও এ অধীনকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মনে করা উচিত, যে তাঁহারা যে স্থলে প্রাকৃত চক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দর্শন করেন, সেস্থানে ভক্তগণের দিব্যচক্ষু “জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজমুরলীধরম্” অথবা “নবজলধররুচিং শ্যামলং শ্যামকান্তিং” অবলোকন করিয়া বিমলানন্দে পরিপ্লাবিত হয়েন।

ঘোষ ঠাকুরের জীবনে আর একটী প্রবাদ সংযুক্ত আছে। ঘোষ ঠাকুর মৃত্যুর একদণ্ড পূর্ব্বে শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, “আমি চলিলাম আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর (গোপীনাথের) সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা, আমার প্রাণ বাহির হইলে,

যথাসময়ে গোপীনাথ দেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, দেবপ্রাঙ্গণের একপার্শ্বে সমাধি দিও।" এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দ গোবিন্দচরণে লীন হইলেন। গোবিন্দ সহোদরদ্বয়ের ন্যায় সঙ্গীতরসজ্ঞ ও পদকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁর পদগুলিও করুণ-রসাত্মক। ইনি মহাপ্রভুর একজন প্রধান কীর্ত্তনিয়া ছিলেন।

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা দ্বিতীয় নরহরি দাস।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মাব্দ ১৫৮৬, মৃত্যুর শাক ১৬২৬ কি ১৬২৭। ঘনশ্যামের পিতা ও ঘনশ্যাম এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য; সুতরাং ঘনশ্যামের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কেহ কেহ বলেন, ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; কারণ গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে, শ্রীনিবাসের প্রাদুর্ভাবকাল তাহারও পূর্ব্বে; কিন্তু গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের বন্দনা যখন ঘনশ্যাম করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদের সুতরাং শ্রীনিবাসেরও পরবর্ত্তী লোক। ইনি গৌড়দেশে "সুরনদী" (গঙ্গা) তটে, "নদীয়াপুর মাঝে" জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর নিবাস কাঁটোয়ার নিকট ছিল, সম্ভবতঃ ইহাঁর বংশীয় লোক অদ্যাপি তদ্গ্রামে বাস করিতেছেন। সুতরাং ঘনশ্যামের জন্ম "নদীয়াপুর মাঝে" কেমন করিয়া হয়, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত এই "নদীয়া" নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান; অথবা ঘনশ্যামের নদীয়াতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়া কাঁটোয়াতে যাইয়া বাস করেন। আবার যখন ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঘনশ্যামের পিতা বিপ্র জগন্নাথ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের কোন অনুমানই ঠিক হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বলেন; "ঘনশ্যাম বড় অধিক দিনের লোক নহেন।" আমরা একবাক্যের অর্থ বড় একটা বুঝিলাম না; কারণ আমাদের হিসাবে ঘনশ্যাম দুই শত বৎসরের অধিক দিনের লোক। এই গেল সময় ও বাসস্থান লইয়া গোল।

ইহার উপর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় নাম সম্বন্ধে আর এক গোল বাধাইয়াছেন।

ঘনশ্যাম নিজ রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্রে বিখ্যাত। তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরিদাস, আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্র দিন॥"

উপরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দুইটী কথা বিবেচ্য;—প্রথমতঃ কবির নামের কথা, দ্বিতীয়তঃ কবির চরিত্রের কথা। প্রথম কথা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহার স্বরচিত গ্রন্থ ও পদাবলীতে দুই নামই সমান প্রচলিত; কিন্তু কবি নিজে জানেন না, তাঁহার দুই নাম হইল কেন? অথচ, ক্ষীরোদ বাবু বলিতেছেন, ইহাঁর "প্রচলিত নাম" ঘনশ্যাম, এবং বৈষ্ণবদত্ত" বা "গুরুদত্ত" নাম নরহরি। এই বৃত্তান্ত তিনি কোথা পাইলেন? বা এরূপ কথার যুক্তি বা প্রমাণ কি? দ্বিতীয়তঃ কবির চরিত্রের কথা। কবি নিজে বলিতেছেন "আমার আপন পরিচয় দিতে, আপনারই লজ্জা হয়", আবার বলিতেছেন, "আমি গৃহাশ্রমে উদাসীন, এবং মহাপাপে দিবারাত্র মগ্ন।" ইহাতে আপাততঃ বুঝা যায় যে, কবি দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক কখনই সংসারী হয়েন নাই, কেবল মদ ও বেশ্যাদি লইয়া সর্ব্বদা নানাবিধ পাপে মগ্ন ছিলেন; এবং ইত্যাদি কারণবশতঃই স্বীয় পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু ঘনশ্যামের গ্রন্থাদি পাঠে আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের মনের ধারণা এই যে, তিনি পরম পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান্ ও ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনে গিয়া কিছুকাল গোবিন্দজীর সূপকার হয়েন। সূপকারের পদ ঘৃণিত, তাই কি কবি কহিতেছেন, "নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।"? সূপকার যদি বেতনগ্রাহী হয়, তবে এ পদ ঘৃণিত ও লজ্জাকর বটে; কিন্তু ঘন-শ্যাম স্বেচ্ছায় বিনা বেতনে গোবিন্দজীর সেবা করিবার জন্য এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ত লজ্জার কারণ হইতে পারে না, বরং খুব গৌরবেরই কারণ। অনেক ধার্ম্মিক ও সাধুচরিত্র লোকই দারপরিগ্রহ না করিয়া চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করেন; ঘনশ্যামও নিশ্চয় তাহাই

করিয়াছিলেন। তবে ঘনশ্যাম লর্ড বাইরণের ন্যায় বিনা কারণে আপনাকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন কেন? তিনিও কি বাইরণের ন্যায় ঐরূপ করা বাহাদুরি মনে করিতেন? না—তাহা কখনই নহে। তাঁহার ঐরূপ বর্ণনা কেবল বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি মাত্র। ঘনশ্যাম একজন প্রসিদ্ধ পদাবলীরচয়িতা। তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ আছে; যথা—পদ্ধতিপ্রদীপ, গৌরচরিতচিন্তামণি, ছন্দসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীনিবাসচরিত, নরোত্তমবিলাস, ও ভক্তিরত্নাকর। 'ছন্দসমুদ্র' পাঠ করিলে ইহাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরও প্রভূত বিদ্যাবত্তার ও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচায়ক। পদাবলীতে ইহাঁর সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতার প্রমাণ আছে। ঘনশ্যামের প্রধান দোষ এই যে, ইহাঁর পদগুলি সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে; অনেক স্থানে বড় খট মট লাগে। একজন সংবাদপত্রের সমালোচক পুস্তক-সমালোচনার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি কোন পুস্তকের দোষগুণ বাহির করিয়া সমালোচনা করিতেন না; বস্তুতঃ তাহা করিবার হয়ত তাহার অভ্যাস বা ক্ষমতাই ছিল না। তিনি হয় লিখিতেন, এই গ্রন্থ (ক) শ্রেণীর, ঐটি (খ) শ্রেণীর ইত্যাদি। নতুবা লিখিতেন, এই গ্রন্থকার প্রথম আসন, ঐ গ্রন্থকার দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ইত্যাদি। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় একজন প্রচুর বিদ্বান্, ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর লেখক ও সমালোচক বলিয়াও সাধারণ্যে পরিচিত। কিন্তু ঘনশ্যামের গ্রন্থসমালোচনাকালে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রাগুক্ত সংবাদপত্রের সমালোচকের পন্থাবলম্বনপূর্ব্বক হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তিনি বলেন, "নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাঁহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।"

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন; তবে গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি? তাঁহারা যদি প্রথম

শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে ঘনশ্যামের লেখা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা "ন্যূন নহে" অর্থাৎ "তুল্য" বা "শ্রেষ্ঠ" তখন জ্যামিতির সূত্র অনুসারে, ঘনশ্যামও প্রথম শ্রেণীর, বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন। আর তাঁহারা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট। ক্ষীরোদ বাবুর শেষ বাক্য অধিকতর অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট। ক্ষীরোদ বাবু বলেন, "তাঁর রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।" এই বাক্যটী সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে ইহার ২টী অর্থ হইতে পারে।

(১) নরচরিত্রে যেরূপ স্বাভাবিকতা, তাঁহার রচনায়ও তদ্রূপ স্বাভাবিকতা আছে। "রচনায় স্বাভাবিকতা" এই বাক্যাংশের অর্থ আমরা এই বুঝি যে, যেখানে বা যখন যেরূপ স্বাভাবিক রচনা হইতে পারে, ঘনশ্যামের রচনায় সেই রূপ স্বাভাবিকতা আছে, বা ঘনশ্যামের রচনা সেইরূপ স্বাভাবিক। কিন্তু "নরচরিত্রে স্বাভাবিকতার" অর্থ কি? উহার অর্থ কি যে নরচরিত্র যেরূপ স্বাভাবিক হইতে পারে সেইরূপ? কিন্তু নরচরিত্র কখন বা দেবচরিত্র কখন বা দানবচরিত্র তুল্য, ইহার মধ্যে স্বাভাবিক কোন্‌টী? এবং "রচনার" "সহিত" "নরচরিত্রের" সাদৃশ্যইবা কি?

(২) যে নরের চরিত্র স্বভাবতঃ যেরূপ, তাঁহার রচনায় ঠিক সেই রূপ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইহাই যদি প্রকৃত অর্থ হয়, তবে মনে আর একটা খট্‌কা বাধে। তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। ঘনশ্যাম যেমন শ্রীনিবাসচরিত্র, নরোত্তমচরিত্র প্রভৃতি নরচরিত্র বর্ণন করিয়াছেন; তেমনই গৌর-নিতাই-চরিত্র, রাধা-কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি দেবচরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। যদি তাঁহার রচনায় একটীর স্বাভাবিকতা রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে কি অপরটীর স্বাভাবিকতা রক্ষা পায় নাই? তবে তিনি বা তাঁহার পক্ষে কেহ যদি বলেন, "সমালোচক যখন ব্রাহ্ম, তখন তাঁহার কাছে শ্রীনিবাস, নরোত্তমের ন্যায়, গৌর-নিতাই ও রাধা-কৃষ্ণও নর।" তবে আমরা নিরুত্তর।

• ক্ষীরোদ বাবুর সমালোচিত সমালোচনাটী কিরূপ হইলে নির্দ্দোষ হইত, তাহা বলিতে গিয়া আমরা আমাদের ধৃষ্টতা দেখাইব না। তবে

আমাদের মত এই যে ঘনশ্যাম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাহার পদের নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায়শেখর, লোচনদাস, বাসুদেবঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে ঘনশ্যামের কৃতীত্ব এইখানে যে, তিনি দেশকাল-পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। ঘনশ্যামের রচনার দোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাঁর রচিত আর একখানি গ্রন্থের নাম গোবিন্দরতিমঞ্জরী।

চণ্ডীদাস।

সপ্তম বর্ষের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকার কোন অজ্ঞাতনামা লেখক একটী পদাংশ প্রচার করেন, তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কালনিরূপণ এবং রচিত পদের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। যথা -

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ। নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেতে অঙ্কে নিয্যা। আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিয্যা॥"

অর্থাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদায় পদের সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র। ইহাই যদি চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ও পদ-রচনার সময় যথার্থ হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হয়েন। চণ্ডীদাস দ্বিজ-কুলোদ্ভব; এবং স্বীয় পদে আপনাকে "বড়ু" (বটু) বা "দ্বিজ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর গ্রামে ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি শাঁকুলিপুর থানার অধীন। সিউড়ী হইতে পূর্ব্বাংশে প্রায় ১২ ক্রোশ; গঙ্গাটীকুরীর ৭ ক্রোশ পশ্চিম ও কীর্ণহারের দুই বা আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ। বাল্য কালে শাক্ত ছিলেন, এবং গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করিতেন; পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পদাবলী রচনা করেন। পদাবলী ভিন্ন চণ্ডীদাসের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না

জানা যায় না। তবে সাহিত্যপরিষৎ কার্য্যালয় হইতে যে "শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ" কাব্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা চণ্ডীদাস কৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। উক্ত সাহিত্যপত্রিকায় এপর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদ প্রকাশিত হইয়াছে, অন্মধ্যে 'রাসলীলা' ও চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে পদগুলি খুব মূল্যবান্। রামিণী নামে এক রজককন্যা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিতেন, এই উপলক্ষে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর মধ্যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র প্রণয় জন্মে, সে প্রেম চণ্ডীদাসের আপন কথায় "কামগন্ধ" ছিলনা। চণ্ডীদাস কেবল পদকর্ত্তা ছিলেন না, একজন বিখ্যাত কীর্ত্তিনিয়া ছিলেন; প্রবাদ এই যে নিকটস্থ মতিপুর গ্রামে একদা কীর্ত্তন করিতে যান, সেই স্থানে নাটমন্দিরপতনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এ প্রবাদ সত্য নহে, চণ্ডীদাস বৃদ্ধাবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া বাস করেন, তথায় এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার একজন আদি কবি এবং মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। কোন কোন পদে দেখা যায়, গঙ্গার তীরে একদা উভয়ের দেখা ও রসবিচার হইয়াছিল। ১২৮০ সালে সোমপ্রকাশে একজন লিখেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩০৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।" একথা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না।

চৈতন্যদাস।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময়ে চৈতন্যদাস নামে অনেক ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বনিধি মহাশয় যথার্থই বলেন, "চৈতন্যদাস ভনিতাযুক্ত পদগুলি আমার বোধে একব্যক্তির রচিত নহে, পূর্ব্বাপর একাধিক কবির পদ মিশিয়া গিয়াছে।" আমরা এস্থলে ছয় জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(১) শ্রীনিবাস শাখায় এক চৈতন্য দাসের নাম পাওয়া যায়। যথাঃ—

"তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীচৈতন্যদাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে॥"

অচ্যুত বাবুর মতে ইনি একজন পদকর্ত্তা।

(২) কুলীনগ্রাম-বাসী শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্য দাসও একজন কবি ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৩) নরোত্তমবিলাসে আর এক চৈতন্য দাসের পরিচয় দেখিতে পাই যথাঃ—

"শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।"

ভক্তিরত্নাকরেও ইহাঁর উল্লেখ আছে, যথাঃ—

"সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্ব মতে যোগ্য যেহোঁ।
গৌরপ্রিয় বংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥"

প্রেমদাস কবির মতে ইনি পরম উদার, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত।

(৪) আউল মনোহর দাসের পরের নাম চৈতন্যদাস ছিল।

(৫) শ্রীনিবাসাচার্য্যের পিতা চাকন্দীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যদাস সম্বন্ধে, নরোত্তম বিলাস বলেন :—

"শ্রীনিবাস প্রকট হইবে যার ঘরে।
তাহা মহাপ্রভু ব্যক্ত করিলা সংসারে।"
"শ্রীচৈতন্যদাস পিতা মাতা লক্ষীপ্রিয়া।
প্রভুকে দেখিলা দোঁহে নীলাচলে গিয়া॥"

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কণ্টকনগরের ৩ কি ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে চাকন্দী গ্রাম। এই গ্রামে অতীব নিরীহ ও পরম কৃষ্ণভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে ঘটনা উপলক্ষে গঙ্গাধরের নাম চৈতন্যদাস হয়, তাহা অতি অদ্ভুত। গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কণ্টকনগরে মধুশীলের দ্বারা মস্তকমুণ্ডন করাইয়া ডোরকৌপীন ধারণপূর্ব্বক শ্রীল কেশব ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ছিল এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ সময়ে গঙ্গাধর কোন কার্য্যানুরোধে কণ্টকনগরে উপস্থিত ছিলেন। গৌর নিমাইচাঁদকে নবীন বয়সে ভিখারী হইতে দেখিয়া গঙ্গাধর শোকে একান্ত অধীর হইয়াছিলেন এবং দিবানিশি কেবল "হা চৈতন্য" বলিয়া রোদন করিতেন। গঙ্গাধর নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন বলিয়া,

গ্রামস্থ সমস্ত লোক তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। অকস্মাৎ গঙ্গাধরের প্রেম-বিকারদর্শনে সকলে নানাপ্রকার যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই সময় হইতে সকলে তাঁহাকে চৈতন্যদাস বলিয়া ডাকিত। গঙ্গাধর যাজীগ্রামনিবাসী শ্রীবলরাম শর্ম্মার দুহিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। অধিক বয়সে বিবাহ করাতে প্রথমে গঙ্গাধরের সন্তানাদি জন্মে নাই। প্রতিবৎসর গঙ্গাধর ধর্ম্মপত্নী সহ নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতেন। কতিপয় বর্ষান্তর মহাপ্রভুর বরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে মহাপ্রভুর প্রেমাবতার স্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম হয়।

বনবিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর ১৪৪৪ কি ১৪৪৫ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় দস্যুদল রাখিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। কেবল যে বনবিষ্ণুপুরের রাজাই দস্যুতাদোষে দোষী ছিলেন, এরূপ নহে। তদানীন্তন জমিদারদিগের অন্যূন বার আনা দস্যুদলপতি ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, “বাঙ্গলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে চৌদ্দ আনা দস্যু ও দুই আনা উৎকোচগ্রাহী ছিল।” বাঙ্গালার ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের দশাও ঐরূপ ছিল। সে যাহা হউক, ১৫০৫ শকে বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুদল কর্ত্তৃক বৈষ্ণবগ্রন্থ সমস্ত বহুমূল্য রত্নভ্রমে অপহৃত হয়। কথিত আছে, সেই গ্রন্থরত্ন দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা রাজার মন বিশুদ্ধ হয়। তিনি স্বীয় দ্বারপণ্ডিত শ্রীব্যাসাচার্য্যের হস্তে গ্রন্থরত্ন সমর্পণপূর্ব্বক, তাহাদিগের রীতিমত অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিলেন। বাবা আউল মনোহর দাস সেই গ্রন্থরত্নভাণ্ডারের ভাণ্ডারী নিযুক্ত হইলেন। গ্রন্থরত্ন অন্বেষণ করিতে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিরুপম রূপলাবণ্য ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অভূতপূর্ব্বব্যাখ্যা ও পাঠশ্রবণে দস্যুরাজ বীর হাম্বীরের কঠিনহৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমে বিগলিত হইল। তিনি যার পর নাই দীনভাবে ও আর্ত্তিসহকারে আচার্য্যরত্নের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন—পরশপাথর স্পর্শে লৌহ সোণা হইল। তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইল চৈতন্যদাস। ইনি উভয় নামেই অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

“শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল॥”

ভক্তি-রত্নাকরপ্রণেতা ইহাই বলিয়া বীর হাম্বীরের আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছেন।

জগন্নাথদাস।

আমরা এই নামে চারি মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। ১ম, মহাপ্রভুর উপশাখা-গণনায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এক জগন্নাথদাসের এইরূপ উল্লেখ আছে :—"পুরুষোত্তম, শ্রীগালিম জগন্নাথদাস।" ইনি ব্রাহ্মণ ও "আচার্য্য" উপাধিধারী ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে ইনি গঙ্গাতীরে বাস করেন। ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানি না। ২য়, পুরীজেলার অন্তর্গত কপিলেশ্বরপুরে ভগবান্ পুরাণ পাণ্ডা ও পদ্মাবতী দেবী নামে দ্বিজদম্পতী বাস করিতেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে জগন্নাথ ঐ দম্পতী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পকাল মধ্যেই এই বালক কলাপাদি ব্যাকরণ ও যজুঃ এবং সামবেদ অধ্যয়ন করেন। জগন্নাথ অতি রূপবান্ ও সুকণ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি এমন সুন্দর ভাগবত পাঠ করিতেন যে, তদীয় পাঠশ্রবণে মহাপ্রভু পরম প্রীত হইতেন। কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ জগন্নাথ ভক্ত-কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এইজন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-ভক্তগণনায় ইহাঁর নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে, আমরা এস্থলে একটীর বিবরণ লিখিলাম। জগন্নাথদাস শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করেন; তাহাতে তত্ত্ববিরুদ্ধ কোন কোন স্বমতও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু দুঃখিত হইয়া অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথ তুমি যে ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছ, তাহা বড় লোকের উচিত, অতএব তুমি 'অতি বড় লোক'। এই হইতে জগন্নাথ "অতি বড়" নামে পরিচিত হইলেন। ইহাঁর শিষ্যগণ "অতিবড়ী" সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। জগন্নাথ "ব্রহ্মাণ্ডভূগোল," "প্রেমসাধন," "দৃতিবোধ" আদি ভক্তগ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ইনি ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। ৩য়, বৈষ্ণববন্দনাগ্রন্থে আরো এক জগন্নাথদাসের উল্লেখ আছে; ইনিও উড়িষ্যাবাসী। যথা,—

"বন্দো উড়িয়া জগন্নাথদাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়।
জগন্নাথদাস বন্দো সঙ্গীতে পণ্ডিত। যার গীত শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয়, ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের কীর্ত্তনিয়া ছিলেন, এবং সঙ্গীতসাধনায় এরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ ও বলরামদেব তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দন বলেন, ইহাঁর চরিত্র বড়ই মধুর ছিল; যথা—"জগন্নাথ দাস বন্দো মধুরচরিত।" তত্ত্বনিধি মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় জগন্নাথকে এক ও অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শেষোক্ত জগন্নাথদাসই যে পদকর্ত্তা ছিলেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয়। ইহাঁর "রসোজ্জ্বল" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

৪র্থ, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিক্রমপুর-রাজধানীর সন্নিকট কাষ্ঠকাটা (যাহার বর্ত্তমান নাম কাঠাদিয়া) নামক স্থানে প্রধান রাজমন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের বংশে বহুপুরুষ পরে রত্নাকরমিশ্রের জন্ম হয়। সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে রত্নাকরের দুই পুত্র জন্মে। সর্ব্বানন্দের পুত্রই 'কাষ্ঠ-কাঠা' জগন্নাথদাস। এই জগন্নাথ দাস চৈতন্যচরিতামৃত মতে গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য ও শাখাভুক্ত। জগন্নাথের শিশুকালে সর্ব্বানন্দের মৃত্যু হয়। পিতৃহীন শিশু পিতৃব্য প্রকাশানন্দের দ্বারা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়েন। জগন্নাথ পিতৃব্যের আদরের ধন ছিলেন; কাজেই লেখা পড়া করিতেন না। প্রকাশানন্দের অতিশয় যত্ন ও চেষ্টায় জগন্নাথ বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ অতি সত্বরই পাঠ বন্ধ করিলেন। জগন্নাথ নানা জনের মুখে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হইলেন। তিনি অধ্যয়ন ব্যতীত মহাপণ্ডিত ও বিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় বলেন, "এপ্রকার গম্ভীরভাবে (জগন্নাথ) বক্তৃতা করিতেন যে, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমোহিত হইতেন। তাৎকালিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও জগন্নাথের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয় বাদবিতণ্ডা করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। কোন্ শক্তি-প্রভাবে তর্কসময়ে জগন্নাথের জিহ্বায় শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গতবাদি-নিরস্তকারিণী বাণী বহির্গতা হয়, তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন না। * * জগন্নাথ একজন অতি বড় বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সুখ্যাতি দেশ ছড়াইয়া পড়িল। প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে বিচারে পরাভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি জনসমাজে পণ্ডিত জগন্নাথদাস আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন।" এরূপ সম্মানিত পদ লাভ

করিয়াও জগন্নাথের ধর্ম্মপিপাসা বলবতীই রহিল। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথকে স্বপ্নযোগে কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আছি, তুমি আসিয়া আমায় দর্শন কর। জগন্নাথ তখন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় দিবারাত্র পর্য্যটনের পর শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর পদে শরণ লইলেন, এবং তাঁহারই আদেশক্রমে গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য হইলেন। জগন্নাথের গৃহত্যাগের পর, তাঁহার পিতৃব্য তল্লাস করিতে করিতে শান্তিপুর আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাইলেন এবং মহাপ্রভুর অনুমতিক্রমে জগন্নাথকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে জগন্নাথ নবাব সরকারে এক বড় চাকুরি পাইলেন এবং দারপরিগ্রহ করিলেন। পরে নবাব সরকার হইতে জায়গীর স্বরূপ আড়িয়ালগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সস্ত্রীক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কাঠদিয়ায় এখনও জগন্নাথের পাট বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথের বংশধরগণ সম্প্রতি কাঠদিয়া, আড়িয়াল, পাইকপাড়া, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। আড়িয়ালনিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী, এই জগন্নাথদাসের জনৈক বংশধর। এই লক্ষ্মীকান্ত দাস গোস্বামীর মতে জগন্নাথ দাস শ্রীচম্পকলতা সখীর যুথের তিলকিনী সখী। কাঠকাটা জগন্নাথদাস পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

জগদানন্দ দাস।

এই নামে দুই মহাত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১ম জগদানন্দ পণ্ডিত ও ২য় জগদানন্দ ঠাকুর।

(১) চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ও অন্ত্যলীলায় জগদানন্দ পণ্ডিতের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে যথা :—

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিনি সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন॥
দুইজনে খট মট লাগয়ে কোন্দল॥"

অন্ত্যের দ্বাদশে যথা :—

উপক্রমণিকা

"জগদানন্দ মিলিতে যায় যে যে ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সে মানে পাইল চৈতন্য॥"

জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর নীলাচলে গমন করেন, তখন যে চারি ভক্ত তাঁহার সমভিব্যাবহারে যান, তন্মধ্যে পণ্ডিত জগদানন্দ একজন।

চরিতামৃতের মধ্যের তৃতীয়ে যথা :—

"নিত্যানন্দ গোসাঞী, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ॥"

জগদানন্দ প্রভুর নিকটে থাকিয়া নানা প্রকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে নবদ্বীপ আসিয়া শচী মাতা ও ভক্তগণকে প্রভুর কুশল সংবাদ জানাইতেন। একদা পণ্ডিত একহাঁড়ী চন্দনাদি তৈল সযত্নে নবদ্বীপ হইতে বহিয়া প্রভুর জন্য লইয়া যান; কোন ক্রমে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ না করাতে জগদানন্দ দুঃখিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন, "এই তৈল জগন্নাথদেবের মন্দিরে দাও, তথায় জ্বালাইলে, জগন্নাথদেব পরিতুষ্ট হইবেন।" সে কথা শুনিয়া পণ্ডিত নিঃশব্দে গৃহাভ্যন্তর হইতে তৈলভাণ্ড আনিয়া প্রাঙ্গণে আছাড় মারিয়া ভাণ্ড ভঞ্জন করিয়া স্বীয় বাসায় যাইয়া অনাহারে তিন দিবস উপবাস করিয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের মান বাড়াইতে সদা ব্যগ্র, স্বয়ং জগদানন্দের গৃহে যাচিয়া ভিক্ষা লইয়া জগদানন্দের মনোদুঃখ দূর করিলেন। ইনি পদকর্ত্তা বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ নাই। পদকল্পতরুগ্রন্থে জগদানন্দ ভণিতাযুক্ত যে পাঁচটী পদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "এই পঞ্চপদ সেই মহাজন শ্রেষ্ঠের (পণ্ডিত জগদানন্দের) কৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনিই এই পদগুলি রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, কি উহা পরবর্ত্তী অন্য কোন ভক্তের কৃত, নিশ্চিতরূপে তাহা বলিতে পারি না।"

(২) জগদানন্দ ঠাকুর এই বিখ্যাত পদকর্ত্তার জীবনী নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বারা রচিত হইল।

(ক) জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত উখরা পোষ্টাফিসের অধীন আগর-

ডিহি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামী এ অধীনের নিকট যে পত্র লিখেন তাহা (খ) রাণীগঞ্জনিবাসী শ্রীগৌরদাস কবিরত্ন ষষ্ঠ বর্ষের নবম সংখ্যক বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা ও (গ) জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের প্রণীত জগদানন্দ চরিত।

জগদানন্দ ঠাকুর জাতিতে বৈদ্য, শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামীর বংশধর। জগদানন্দের পিতামহের নাম শ্রীপরমানন্দ ঠাকুর। পিতার নাম নিত্যানন্দ মহান্ত ঠাকুর। নিত্যানন্দের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ সর্ব্বানন্দ, কনিষ্ঠ জগদানন্দ। কিশোরীমোহন গোস্বামীর মতে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকাব্দার মধ্যে জগদানন্দের জন্ম; এবং ১৭০৪ শকের ৫ই আশ্বিন বামনদ্বাদশীতে তাঁহার সিদ্ধি হয়। তদুপলক্ষে প্রতিবর্ষে জোফ্‌লাই গ্রামে দিবসত্রয়-ব্যাপী এক বৃহৎ মেলা হয়। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের "সর্ব্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, এবং ইনি ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাপ্রণয়ন ও সংকীর্ত্তনের বহু মনোহর পদ রচনা করিয়াছিলেন।" গোস্বামী মহাশয়ের মতে "দুই ভ্রাতার বাসস্থানই বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌকী রাণীগঞ্জের পূর্ব্বাংশ দক্ষিণখণ্ড নামক গ্রামে ছিল।" কিন্তু গৌরদাস কবিরত্ন মহাশয়ের মতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরবর্ত্তী ইলবাজপুরের সন্নিকট জোফলাই জগদানন্দের বাস ছিল। কবির আদি পুরুষ রঘুনন্দন ঠাকুরের বাস যে শ্রীখণ্ড গ্রামে ছিল, তাহা আর এস্থলে বলিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের মতে জগদানন্দেরা চারি সহোদর ছিলেন। যথা—সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও জগদানন্দ। কথিত আছে, জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দ মহান্ত ঠাকুর আদিবাস শ্রীখণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক, আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে যাইয়া বাস করেন। এবং জগদানন্দ ভ্রাতাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জোফ্‌লাই গ্রামে যাইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। জগদানন্দ একদিন স্বপ্নে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আজীবন শ্রীগৌরাঙ্গপদে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং জোফ্‌লাই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার সেবা প্রকাশ করেন। ঐ মূর্ত্তি অদ্যাপি উক্ত গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, স্বপ্নে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিবার পর জগদানন্দ

'দামিনীদাম" ও "গৌরকলেবর" এই দুইটী পদ রচনা করেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামী বলেন, "শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এবং গম্ভীরার্থক, নানা ভাবপ্রকাশক, শ্রবণ-মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন।" উক্ত গোস্বামী মহাশয় জগদানন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটীও আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন ; যথাঃ—।

"শ্রীলশ্রীজগদানন্দো জগদানন্দদায়কঃ।
গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

আমাদের মনে হয়, এই শ্লোকের ভাব শ্রীকালিদাস বাবুর নিম্নলিখিত বাক্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। "জগদানন্দ সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করিয়া জগতের আনন্দ বিধানপূর্ব্বক জগদানন্দ নাম সার্থক করিয়াছিলেন।"

জগদানন্দ-পদাবলীর ভূমিকায় কালিদাস বাবু লিখিয়াছেন "যেমন প্রস্ফুটিত ও সৌরভময় গোলাপকে নাড়াচাড়া করিতে ভয় হয়, পাছে তাহার সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের হানি হয়, জগদানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাদৃশ ভয় হইতেছে, এজন্য এই স্থলে নীরব হইলাম।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক বলেন "আমাদের ভয় আরো বেশী। সুতরাং এ গ্রন্থের সমালোচনা করা হইবে না। আমাদের সমালোচনার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার আরো একটা হেতু আছে। ইতঃপূর্ব্বে আমরা জগদানন্দের দুই একটী পদ দেখিয়াছি,— তাহা গায়কদিগকে গাইতেও শুনিয়াছি; শুনিয়া বেণুনিনাদবিশ্রুত-মৃগের ন্যায় একবারেই বিমুগ্ধ হইয়াছি। বিমুগ্ধের আবার বিচার-বুদ্ধি কি? সমালোচনা বিচারের কার্য্য। আমরা জগদানন্দের মধুর-কান্ত কোমল-পদাবলী পাঠে আত্মহারা হইয়াছি। সুতরাং জগদানন্দের পদাবলীর সমালোচনা করা গেল না। যাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, যে প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া ভালমন্দ, পাপপুণ্য, হিতাহিত, সুখদুঃখ, মরণজীবন সমস্তই এক করিয়া দেয়, যে প্রবাহে প্রবলবলনে বিচারবুদ্ধি ফেনরাশির ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যায়, সেই প্রবাহের উদ্দীপক কারণের আবার সমালোচনা কোন্ কালে কে করিতে পারে?" কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও

কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্যব্যপদেশে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাই এবিষয়ের অতি সুন্দর সমালোচনা। শ্রীপত্রিকাসম্পাদক উক্ত মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিয়া যথার্থই কহিয়াছেন, "ইহাই যদি জগদানন্দের পদাবলীর সমালোচনা হয়, তবে আমরাও বলি তথাস্তু। আমাদেরও মনে হয়, জগদানন্দের পদাবলী প্রকৃতই কাব্য। ত্রিতাপদগ্ধ সংসারমরুতে যে কাব্য এক অলৌকিক অমৃত, যে কাব্যের মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তিতেও অখিল-সংপ্লাবিকা-সুধাধারায় মৃত জগৎ অনুপ্রাণিত ও আপ্যায়িত হয়, জগদানন্দের পদাবলী সেই শ্রেণীর কাব্য।"

কালিদাস বাবুর মন্তব্যটী এতই সুন্দর যে, একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা পাঠকের সন্তোষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কালিদাসবাবু বলেন, "সঞ্চরমাণ ভূবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্ব শক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত, ও সাধারণ এই চারি শ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলদুর্লভ অত্যদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক বিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্য-সমালোচক পণ্ডিতমাত্রেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বিঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্র পদাবলীগ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় প্রচুর শক্তিপ্রদর্শনে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বাহ্যচিত্র পদাবলী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্যান্য অন্তশ্চিত্র কবিতার চিত্রবর্ণাবলীর দ্বারা দুই একটী শব্দ অধিকতর কবির নামই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মক তারকব্রহ্মনাম জগদানন্দের চিত্র-গাথা ভিন্ন অন্যের চিত্র কবিতায় কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনাচাতুর্য্য, কি শব্দবিন্যাস, কি চিত্র, বোধ হয়, ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎ কালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর।" পদাবলী ভিন্ন জগদানন্দের "ভাষাশব্দার্ণব" নামে একখানি অসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ

আছে। জগদানন্দ যে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তাহার প্রমাণস্বরূপ দুইটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১। জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল। একদিন পশ্চিম-দেশীয় কয়েকটী সাধু আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন। ইহাঁরা কূপোদক ভিন্ন অন্য জল পান করিতেন না। জোফ্‌লাই গ্রামের কুত্রাপিও কূপ ছিল না। জগদানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর নাম স্মরণ করিয়া ভূমিতে একটী লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিলেন, আর তদ্দণ্ডে একটী কূপ হইল। এই কূপ কালে পুষ্করিণীরূপে পরিণত হইয়া অদ্যাপি জোফ্‌লাই গ্রামে বর্ত্তমান আছে, ইহাকে লোকে গৌরাঙ্গ-সাগর বলে।

২। শ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মপ্রচারার্থ জগদানন্দ এক সময়ে পঞ্চকোট, রাজ্যের অধীন আমলালা গ্রামে উপস্থিত হয়েন। ঐ গ্রামে একটী অগাধ-জলবিশিষ্ট বৃহৎ সরোবর ছিল; সরোবরের ঠিক মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় একটী সুন্দর নিভৃত স্থান ছিল। জগদানন্দ প্রতিদিন কাষ্ঠপাদুকা পায় দিয়া সেই সরোবর পার হইয়া ঐ দ্বীপে যাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভজন সাধন করিতেন। পঞ্চকোটাধিপ পাত্রমিত্র সহ আমলালা গ্রামে আগমন ও জগদানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনপূর্ব্বক, ভক্তির সহিত জগদানন্দকে আমলালা গ্রাম অর্পণ করেন। ঐ গ্রামে জগদানন্দ-স্থাপিত এক গৌরাঙ্গমূর্ত্তি আছেন, তাঁহার সেবাইতগণ অদ্যাপি সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। প্রাগুক্ত পুষ্করিণীটী "ঠাকুরবান্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। জগদানন্দের অমানুষিক প্রভাব দর্শনে অনেক ব্রাহ্মণকুমারও তাঁহার নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করেন।

জয়দেব।

জয়দেব বঙ্গ-কবি-কুলচূড়ামণি বটেন; কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য কালিদাসের কাব্যের ন্যায় সমস্ত সাহিত্য-জগতে সম্মানিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের তাহা কণ্ঠভূষণস্বরূপ। জয়দেব বীরভূম জেলার কেঁন্দুলী বা কেন্দুবিল্বগ্রামে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। ইনি লক্ষ্মণসেনের সভার

"পঞ্চরত্নের" অন্যতম। জয়দেব কিছু কাল নবদ্বীপে বাস করেন, সেই সময় তাঁহার "দশাবতারস্তোত্র" রচিত হয়; ঐ স্তোত্র পাঠ করিয়া লক্ষ্মণসেন এত মোহিত হয়েন যে, তাঁহাকে আপনার সভাসৎ-পদে বরণ করেন।

নবদ্বীপ বাসকালে একদা জয়দেব চম্পাপুষ্পের দ্বারা ভগবানের পূজা করিতে করিতে এক বিস্ময়কর রূপ দর্শন করেন, তদ্দর্শনে তাঁহার মনে ভাবী গৌরাবতারের বিষয়ই উদিত হয়। সেই অদ্ভুত রূপটী কি, তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। যথাঃ—

"একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া॥
শ্যামল সুন্দর রূপ দিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে॥
গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্পপুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান॥"

জয়দেব যেস্থলে এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তথা বহু চম্পকবৃক্ষ ছিল এবং সেই সময় হইতে গ্রামের এই অংশের নাম চম্পাহট্ট হয়।

জয়দেব শৈশব হইতে সংসারবিরাগী ও প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কেন্দুবিল্বগ্রাম হইতে গঙ্গা আঠার ক্রোশ দূরে ছিল। কথিত আছে, জয়দেব প্রত্যহ আঠার ক্রোশ গমনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাদেবী ভক্তের এই দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেন্দুলীতেই আসিয়া ছিলেন, জয়দেব নিজগ্রামেই গঙ্গাস্নান করিতেন।

নবদ্বীপ হইতে জয়দেব নীলাচলে গমন করেন। এখানে তিনি এক বৃক্ষতলে বাস করিতেন এবং দিবানিশি হরিভজন করিতেন। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল—এক ছিন্নকন্থা ও করোয়া। প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করিতেন, আর মহাপ্রসাদ সেবা করিতেন। "জয়দেব পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং পণ্ডিতসমাজে তাঁহার খুব আদর ছিল। আবার এদিকে পরম বিরক্ত, উদার, জিতেন্দ্রিয় ও দম্ভহীন বলিয়া ভক্তেরাও প্রীতি করিতেন। তাঁহার মনের বাসনা ছিল, চির-কুমারাবস্থায় জীবনাতিপাত করিবেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, তাহাই পূর্ণ হইল। একদা জয়দেব বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পদ্মাবতী নাম্নী

যুবতী কন্যাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া কহিলেন, "জগন্নাথ দেবের আদেশ, আপনি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।" জয়দেব মহা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছি, অতএব জগন্নাথ দেবের আদেশ সত্ত্বেও আমি দারপরিগ্রহ করিব না।" ব্রাহ্মণ জয়দেবের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা নিরর্থক জানিয়া, কন্যাটী রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন জয়দেব নিরুপায় হইয়া এবং পদ্মাবতীর বিনয়বাক্যে পরাস্ত হইয়া, কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই নববিবাহিতা পত্নী জয়দেবের ধর্ম্মের সহায় হইলেন; উভয়ে একত্র হইয়া ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এখন জয়দেব সংসারী, কাজেই বৃক্ষতল পরিত্যাগপূর্ব্বক একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন।

জয়দেব রাধামাধবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতেন। যেকুটীরে নিজেরা থাকিতেন, এবং রাঁধিতেন, সেই কুটীরেই বিগ্রহটী স্থাপন করিলেন। কালে কুটীরখানির বেড়া সংস্কার করা প্রয়োজন হইল। জয়দেব একবার বেড়ার বাহিরে আসিয়া বাঁধন বাড়ান, আবার ঘরের ভিতর যাইয়া বাঁধ দেন। ইহাতে জয়দেবের অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল, অথচ বেড়া বাঁধায়ও খুব বিলম্ব হইতে লাগিল। জয়দেব কুটীর মধ্য হইতে শুনিতে পাই-লেন,—পদ্মাবতী যেন বাহিরে থাকিয়া কহিলেন, "আপনি বাহিরে আসিয়া বাঁধ বাড়াইয়া দিন, আমি পিতৃগৃহে বেড়া বাঁধিতে শিখিয়াছি, ঘরে থাকিয়া আমি বেড়া বাঁধি।" জয়দেব তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যে বেড়া বাঁধা শেষ হইল। এমন সময় জয়দেব দেখিলেন, স্থানান্তর হইতে পদ্মাবতী গৃহে আসিতেছেন। জয়দেব অবাক্ হইলেন। কুটীরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, রাধামাধব বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে কালির ঝুল ও হস্তে বেড়া বাঁধা রজ্জু। তখন জয়দেব ও পদ্মাবতী প্রেমে গদ্গদ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গীতগোবিন্দের মহিমাপ্রকাশক অনেক উপাখ্যান আছে। আমরা দুইটী মাত্র উপাখ্যান এখানে বর্ণন করিব। তৎপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে দুই একটী বৃত্তান্তের উল্লেখ করিতেছি। শ্রীজগন্নাথ দেব গীতগোবিন্দ এত ভালবাসেন যে, তাঁহার সম্মুখে অদ্যাপি প্রত্যহ গীতগোবিন্দ পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া গীত ...য়া থাকে। আবার গীতগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গেরও অতি প্রিয়বস্তু ছিল। ...রিতামৃতে যথা :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

১। বৈষ্ণবসমাজে এই প্রবাদ আছে যে, জয়দেব গীতগোবিন্দে :—

"স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া, ভগবান্ শ্রীমতীর চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন, ইহা লিখিতে তাঁহার মন সরিল না, কাজেই শ্লোকটী অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় গৃহে আগমনপুরঃসর "দেহি পদপল্লবমুদারং" স্বহস্তে লিখিয়া গেলেন। জয়দেব তাহা দেখিতে পাইয়া প্রেমে গদগদ হইয়া গ্রন্থখানি শিরে ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন, এবং পদ্মাবতীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

২। শ্রীক্ষেত্রের কোন রাজা "গোবিন্দমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিয়া গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "অদ্যাবধি জগন্নাথদেব গীতগোবিন্দ না শুনিয়া আমার এই গ্রন্থের প্রতি আদর করিবেন"। পাণ্ডারা জগন্নাথের মন জানিবার জন্য উভয় গ্রন্থ তাঁহার নিকট সন্ধ্যাকালে রাখিয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের কপাট খুলিলে দেখা গেল, জগন্নাথদেব "গীতগোবিন্দ" বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং "গোবিন্দমঙ্গল" পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

জয়দেব বৃদ্ধকালে শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়া, তথায় দেহত্যাগ করিয়া, ছিলেন। জয়দেবের পত্নীর পূর্ব্বেই পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। জয়দেবের লোকান্তরগমনের পর তদীয় রাধামাধববিগ্রহ জয়পুরে নীত হন, অদ্যাপি জয়পুরে সে বিগ্রহ আছেন।

জ্ঞানদাস।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী গ্রামের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগর অবস্থিত। ঐ একচক্রা গ্রামের দুইক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া ও মাদঁড়া নামে দুইটী পল্লী আছে। তন্মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার পরিপূর্ণ কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ঠাকুরের বাস ছিল। তিনি অনুমান ১৪৫৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তিরত্নাকরে জ্ঞানদাসের বাসভূমির উল্লেখ আছে; যথাঃ—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥"

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস এক সময়ের লোক ও ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে উভয়ের জন্ম। কিন্তু হারাধনদত্ত মহাশয়ের মতে গোবিন্দদাসের জন্ম ১৪৫৯ শকে এবং জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ক্ষীরোদ বাবুর অনুমান (১৫২৫ খৃঃ অঃ বা ১৪৪৭ শকে) ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না; এবং আমাদিগের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ আছে, এবং প্রতিবৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় জ্ঞান-দাসের নামে তথায় তিন দিবসব্যাপী একমেলা ও মহোৎসব হয়। জ্ঞানদাস চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা বলিয়া পরিগণিত; যথা :—

"পীতাম্বরাচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর॥"

ভক্তিরত্নাকরে "মঙ্গল জ্ঞানদাস" ও চরিতামৃতে "জ্ঞানদাস মনোহর" দেখিয়া, কেহ কেহ অনুমান করেন, জ্ঞানদাসের "মঙ্গল" ও "মনোহর" দুইটী উপাধি ছিল। বাস্তবিক উহা স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম, কি জ্ঞানদাসের নামা-ন্তর তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "জ্ঞানদাসের অপর এক নাম ছিল মদনমঙ্গল" এবং অন্যত্র উক্ত মহাত্মা লিখিয়াছেন, "মনোহর, জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন।"

ইনি বাল্যকালেই নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন, এবং কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ইনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইনি মঙ্গলবংশীয় রাঢ়ীশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। হুগলি ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই বংশজাত অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন। হুগলি বদনগঞ্জ হইতে প্রায়

চারিক্রোশ ব্যবধানে বাঁকুড়া-জেলার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামে যে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা এই জ্ঞানদাস বা মঙ্গলঠাকুরের জ্ঞাতি। পদসমুদ্র ও নির্য্যাসতত্ত্বের সংগ্রহকর্ত্তা, বাবা আউল মনোহর দাস জ্ঞানদাসের চিরসহচর ও সতীর্থ ছিলেন। কোন স্থানে যাইতে হইলে, উভয়ে একত্র যাইতেন। নরোত্তমবিলাসে দৃষ্ট হয়, বিখ্যাত খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাস, অন্যান্য নিত্যানন্দ-শিষ্য-গণের সহিত গিয়াছিলেন, যথা :—

"শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়, মহীধর।
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥"

বিশ্বকোষকার বলেন, "এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া ভুবন-মঙ্গল হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ মদন-মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাস পরমসুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীই তাঁহার পরিচায়ক। জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে "গোস্বামী" শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।"

দৈবকীনন্দন দাস।

দৈবকীনন্দনের স্বপ্রণীত বৈষ্ণব-বন্দনাগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু প্রভু নিত্যানন্দের পার্ষদভক্ত ছিলেন। ইঁহার নাম পুরুষো-ত্তমদাস, ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র। বলা বাহুল্য যে, দৈবকীনন্দন স্বয়ং নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—

"ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥"

ইনি যে পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন, তাহা মনোহরদাস-কৃত "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।
দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।
তেঁহো যে করিল বড় বৈষ্ণববন্দনা॥"

দৈবকীনন্দন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা বৈষ্ণববন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিসহর ছিল। তত্ত্বনিধি মহাশয় ও শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষ "বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থ রচনার একটী ইতিহাস দিয়াছেন। তাহা এই ;—কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট এক গুরুতর অপরাধ করিয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। পরে মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারই উপদেশে অপরাধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি-লেন ; পণ্ডিত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং তাঁহাকে দুইটী আদেশ করিলেন, যথা :—

(১) "পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে"। অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যা-গমনপূর্ব্বক পুরুষোত্তম কবিরাজের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর।

(২) "বৈষ্ণবনিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণববন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥"

অর্থাৎ তুমি বৈষ্ণবাপরাধগ্রস্ত ; অতএব যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে বৈষ্ণববন্দনা কর। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "সেই বৈষ্ণবাপরাধী বিপ্রই এই মহাজন" অর্থাৎ দৈবকীনন্দন দাস। শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষও তাহাই বলেন।

উপরের ঘটনাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দৈবকীনন্দন মহা-প্রভুর সমসাময়িক। এ বিষয়ে "বৈষ্ণববন্দনা" গ্রন্থেই আর এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। মৃণালকান্তি যে একখানি হস্তলিখিত বৈষ্ণববন্দনা পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌর-প্রিয়া-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কয়েকটী পংক্তি আছে। যথা :—

"প্রভুপাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উলসিত হিয়া॥

বৈষ্ণব গোসাঞীর নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্রতীর্থ মুঞি করিল ভ্রমণ ॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিলুঁ শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিলুঁ নয়নে ॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিলুঁ শুনিলুঁ।
সর্ব্ব প্রভুর নাম মালাগ্রন্থন করিলুঁ ॥"

এই কয়েক পংক্তি হইতে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও তদীয় সমসাময়িক বৈষ্ণবদিগের নামই "বৈষ্ণববন্দনায়" স্থান পাইয়াছে।

• শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্টি হয়, "চাপাল গোপাল" বা গোপাল ঠাকুর নামক একব্যক্তি সংকীর্ত্তন সময়ে শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার না পাইয়া, ভবানীপূজার সামগ্রী সকল লইয়া শ্রীবাসের গৃহদ্বারে তাহা বিদ্রূপ করিবার জন্য রাখিয়া আইসে, সেই অপরাধে তাহার নিদারুণ কুষ্ঠব্যাধি হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, যথা :—

"একদিন বিপ্রনাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল ॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥
মদ্যভাণ্ডপাশে ধরি নিজঘর গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাতে দেখিল ॥"

এই হইল "বৈষ্ণবাপরাধ"। ইহার ভগবদ্দত্ত দণ্ড এই হইয়াছিল :—

"তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলায়ে অন্তর ॥"

এই গোপাল ঠাকুরই ঈদৃশ বৈষ্ণবাপরাধী, তাঁহারই কুষ্ঠব্যাধি হয়, এবং তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের ক্ষমাগুণে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং

অন্য লেখকেরা নীরব থাকিলেও আমরা যদি অনুমান করি যে, দৈবকীনন্দনের পূর্ব্বনামই "চাগাল গোপাল" ছিল, তবে বোধ হয় অসঙ্গত না হইতে পারে। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ায় "অপরাধভঞ্জন" প্রবন্ধলেখকও এইরূপ অনুমান প্রকারান্তরে করিয়াছেন।

ধনঞ্জয় দাস।

বৈষ্ণববন্দনায় দৈবকীনন্দন দাস ইহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি "পণ্ডিত" আখ্যাধারী ছিলেন; এবং প্রথমে বিলাসী গৃহস্থ ছিলেন। পরে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে, সর্ব্বস্ব গুরুদেবকে অর্পণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। বর্দ্ধমান-জেলার ছাঁচড়া পাচড়া গ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। বৈষ্ণববন্দনায় ইহাঁর পরিচয়, যথাঃ—

"বিলাস বৈরাগ্য বন্দ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥"

নরহরি দাস। (সরকার ঠাকুর)

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে নরহরি সরকারের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে সরকার ঠাকুরের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্তঘটিত কোন কথা পাওয়া যায় না। বৃন্দাবন দাস কি অপর মহাজনদিগের সম্বন্ধে যেরূপ অনেক স্থানীয় প্রবাদ আছে, ইহার সম্বন্ধে তাহারও অসদ্ভাব। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীমন্নারায়ণ দেব সরকার নামে একজন ধার্ম্মিক বৈদ্য বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, কনিষ্ঠ নরহরি। অনুমান ১৪০০ শকে ঠাকুর নরহরি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর, তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃতে পরম পণ্ডিত ছিলেন; এবং "ভক্তিচন্দ্রিকাপটল" ও

"ভক্তামৃত-অষ্টক" নামে গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। শ্রীখণ্ডে স্থাপিত ছয়টী বিগ্রহ মধ্যে মহাপ্রভুর ও প্রভু নিত্যানন্দের মূর্ত্তি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত। নরহরির জ্যেষ্ঠ সহোদর মুকুন্দ দাস গৌড়বাদসাহের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। মুকুন্দতনয় ঠাকুর রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নরহরির অপ্রকটের পর রঘুনন্দনই ছয়টী প্রতিমূর্ত্তির সেবার্চ্চনাদি করিতেন। নরহরি পূর্ব্বলীলায় মধুমতী সখী ছিলেন, গৌরাঙ্গ-লীলায় মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন; এবং মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজন করিতেন। নরহরি সরকার বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কপালে চন্দনলেপন করিতেন।

প্রবাদ আছে, একদা সরকার ঠাকুর কোন বৈষ্ণবের দ্বারা স্বীয় কাষ্ঠপাদুকা বহন করাইয়াছিলেন। এই তত্ত্বশ্রবণে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার প্রতি এতই বিরক্ত হয়েন,—স্বরচিত চৈতন্যভাগবতে সরকার ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। তবে মহাপ্রভুর পরিকরবর্ণনে প্রধান ভক্ত নরহরির উল্লেখ না থাকিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হইবে, এই ভয়ে প্রকারান্তরে সরকার ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—

"কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবার পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ চামর ঢুলায়॥"

আরো একটী প্রবাদ আছে যে, সরকার ঠাকুর বৃন্দাবন দাস-কৃত চৈতন্যভাগবত দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে স্বীয় গ্রন্থ দেখিতে দেন নাই। সেই জন্য নরহরি সরকার স্বীয় শিষ্য লোচনদাসকে চৈতন্যলীলাবিষয়ক এক গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করেন। লোচনদাস-কৃত "চৈতন্যমঙ্গল"ই সেই আদেশের ফল। এই সুললিত সঙ্গীতময় গ্রন্থ ১৪৫৯ শকে রচিত। এই প্রবাদ-দ্বয়কে কেহ কেহ আমূল মিথ্যা জ্ঞান করেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই উভয় স্থলেই প্রকৃত ঘটনা রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমবৈষ্ণব সরকার ঠাকুর কখন অন্য বৈষ্ণব দ্বারা স্বীয় কাষ্ঠপাদুকা বহন করান নাই। বোধ করি, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন জন্য কোন বৈষ্ণব স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস সরকার ঠাকুরের বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু যতই বিরক্ত হউন না কেন, তিনি কখনও এত অশিষ্ট হইতে

পারেন না যে, সরকার ঠাকুর তদীয় গ্রন্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সে গ্রন্থ দেখিতে দেন নাই। ভক্তনামধারী কোন ভক্ত ও ব্যাল্লীক যে এ সকল গল্পের স্রষ্টা, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সরকার ঠাকুরই প্রথমে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করেন; কেহ বলেন পদাবলীতে, কেহ বলেন স্বীয় "করচা" গ্রন্থে। আমাদিগের অনুমান হয়, নরহরি সরকারের "করচার" কথা মিথ্যা, অন্ততঃ কেহ কখন এই "করচা" খানি দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। পদ দ্বারা সরকার ঠাকুর গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তদ্রচিত এই পদাংশেই বর্ত্তমান। যথাঃ—

"কিছু কিছু পদ লেখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয় প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"

যে পদটীর শেষ দুই পংক্তি উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হয়। আমরা যে সময়ের ইতিহাস লিখিতেছি, তাহার প্রায় বিংশতি বর্ষ পরে বৃন্দাবনদাসের জন্ম; এবং প্রায় ৪০ বৎসর পরে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু সরকার ঠাকুর ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া, কি বলিয়াছেন; শুনুনঃ—

"গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পঁহু॥"*

১৪৬৩ শকাব্দে সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হয়। খণ্ডবাসী গোস্বামী প্রভুগণ এই সরকারবংশজাত। নরোত্তম দাস ঠাকুর "হাটপত্তন" নামক প্রবন্ধে অল্পাক্ষরে সরকার ঠাকুরের অতি সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, যথাঃ—

---

*এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া জনৈক বৈষ্ণবলেখক কোন সময়ে বলেন, "অমিয়-নিমাইচরিতই এইগ্রন্থ, এবং শিশির বাবুই এই গ্রন্থকার"। আবার স্বয়ং শিশির বাবু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় লেখেন, যে এই পদাংশ-নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকার ভবিষ্যতে জন্মিবেন। কিন্তু আমাদের অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ করি। কেন না, নরহরি সরকার প্রকারান্তরে মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত করচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন "ভাষায় রচনা হৈলে" ভাষা বলিতে বঙ্গভাষা বুঝিতে হইবে এবং বঙ্গভাষায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতই আদি গ্রন্থ।

"প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সরকার ঠাকুর ব্রজদেবীগণের ন্যায় প্রেম-মাতোয়ারা ছিলেন, এবং গৌরপ্রেমমদিরাপানে আপনি মাতাল হইয়া, গৌরাঙ্গ-প্রেমে জগৎকে মত্ত করিতেন।

অদ্বৈতবিলাস-গ্রন্থকার নরহরিদাসও একটী পদে সরকার ঠাকুরের বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—

"জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী যার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরগুণরাশি॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, সরকার ঠাকুর ভজনামৃত নামে একখানি সংস্কৃত সিদ্ধান্তগ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থের নাম নামামৃত-সমুদ্র।

নয়নানন্দ দাস।

নয়নানন্দ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রবীণ ও প্রিয়শিষ্য। গদাধরের কনিষ্ঠ বাণীনাথ মিশ্র, নয়নানন্দ সেই বাণীনাথের পুত্র। ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট-ভরতপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। ভরতপুর গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। পণ্ডিত যখন নীলাচলে যান, তখন নয়নানন্দকে এই বিগ্রহসেবায় নিযুক্ত করিয়া যান।

নয়নানন্দের আদি নাম ছিল ধ্রুবানন্দ; এবং চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি "মিশ্রনয়ন" নামে উল্লিখিত। নবদ্বীপবাসী রসিকলাল বাবাজীর নিকট যে প্রাচীন হস্তলিখিত প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়ঃ—— "পণ্ডিত গোসাঞীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ।
পুষ্পগোপাল, গোপালদাস, আর ধ্রুবানন্দ॥"

ধ্রুবানন্দের ন্যায় "পুষ্পগোপাল" ও "গোপালদাস" ও কি নয়নানন্দের নামান্তর? নয়নানন্দের রচিত একটী পদে আমাদিগের ন্যায় অনেক পাঠকের মনেই বিশেষ গোল বাঁধিবার সম্ভব। ঐ পদের শেষ দুই চরণ এই:—

"কহে নয়নানন্দ, নদীয়া আনন্দ, আনন্দে ভুবনভোরা
দুঃখিত জীবন, মাধবনন্দন, চরণে স্মরণ মোরা ॥"

গদাধর ও বাণীনাথই "মাধবনন্দন"। নয়নানন্দের পদের ভণিতায় তাঁহাদের কথা কেন? এবং এখানে "মোরা" শব্দই বা কেন ব্যবহৃত হইল?

নয়নানন্দ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপধামে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৌরাঙ্গ ও গদাধর ভাবভরে যখন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন; তখন ধ্রুবানন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ পদ রচনা করিতেন। এইরূপে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের যে লীলা দর্শন করিতেন, কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া ধ্রুবানন্দ তখনই তাহা পদে বর্ণন করিতেন। এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত উভয়েই ধ্রুবানন্দকে ভাল বাসিতেন। এবং গদাধর পণ্ডিতই ধ্রুবানন্দের নাম "নয়নানন্দ" রাখেন।

প্রাগুক্ত প্রবাদের অনুকূলে পদসমুদ্র-গ্রন্থে একটী পদ আছে, যথাঃ—
"পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ানমিশ্র। বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য ॥"
"পণ্ডিতের পাছে নয়ন থাকে সর্ব্বক্ষণ। প্রভু লীলা দেখি পদ করয়ে বর্ণন ॥"
"ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা! নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা ॥"
নীলাচল যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা। শ্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা ॥" *

খেতুরীর মহোৎসবে নয়নানন্দও উপস্থিত ছিলেন।

নরোত্তম দাস।

রাজসাহী জেলায় গোপালপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব দত্তবংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। গোপালপুর মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী হইতে উত্তরপূর্ব্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে খেতুরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে

* দ্বিতীয়, ৩য়, ও ৭ম, চরণে "প্রভু" অর্থে গদাধর পণ্ডিতকে, এবং চতুর্থ পদের "প্রভু" শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিতে হইবে

ও নারায়ণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। পুরুষোত্তম দত্ত নামে কৃষ্ণানন্দের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার সন্তোষদত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত, ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য্যপর্য্যালোচনার ও বিষয়রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সুতরাং সন্তোষ দত্তই গোপালপুরের রাজা হইলেন। কেহ কেহ সন্তোষ দত্তের নাম বসন্ত দত্ত কহেন এবং বলেন যে, তিনি শিয়ালা নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। তাহার বর্ত্তমান নাম শিয়ালা বসন্তপুর। এই গ্রাম খেতুরী হইতে অধিক দূর নহে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর নরোত্তম বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতিক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দ পুরির সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পূর্ব্বোক্ত খেতরী গ্রামের অনুমান একক্রোশ দূরে নরোত্তম ঠাকুরের "ভজন-খুলি" বা ভজনালয় ছিল; এই স্থান এইক্ষণ "ভজনটুলি" নামে প্রসিদ্ধ। এইস্থলে নরোত্তমের জন্য এক "ভজনবেদিকা" ও "ভজনাসন" প্রস্তুত হয়। উহাতে বসিয়া তিনি প্রত্যহ ভজন সাধন করিতেন। স্বদেশ-প্রত্যাগমনের কিছুদিন পর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ, ও রাধাকান্ত নামে ছয়টী বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্তদিবসব্যাপী এক সুবৃহৎ মহোৎসব হয়; যাহা বৈষ্ণব-জগতে "খেতরীর মহোৎসব" নামে খ্যাত। এই মহোৎসবে দেনুড় হইতে বৃন্দাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ; ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোকুলদাস, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস, ও নরহরি সরকার, ও একচক্রা হইতে পরমেশ্বরীদাস প্রভৃতি মহান্ত, ভক্ত মনোহরদাস, পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়ার সমাগম হয়। এইজন্য বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "এই উৎসব, অতীত-ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটী পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। * * এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।" এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত,

অলৌকিক, অসাধারণ ব্যাপার, তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ-কৃত নরোত্তমচরিত পাঠ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপরোক্ত ছয় বিগ্রহের মধ্যে রাধারমণবিগ্রহকে নরোত্তম স্বীয় প্রধান শিষ্য সয়দাবাদনিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে দান করেন। জেলা মুরশিদাবাদ বালুচরে শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামীর গৃহে অধুনা এই বিগ্রহের সেবা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রায় সমকালে, ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে খেতুরীতে এক মহামেলা হয়; তাহাতে বহুলোক আগমন করেন। নরোত্তমের জীবনে অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখা যায়; আমরা তত্তাবতের উল্লেখ করিলাম না। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকেরা প্রেমবিলাস, শ্রীনিবাস-চরিত্র, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধ-ভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, সদ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ ও উপাসনাপটল। কিন্তু "প্রার্থনা" নামক গ্রন্থের জন্যই নরোত্তম সাহিত্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফলতঃ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ন্যায়, প্রাণস্পর্শী, হৃদয়দ্রবকারী চিত্ত-উন্নতকারী প্রার্থনা জগতের কোনভাষায় ও কোন ধর্ম্মে আছে কি না, সন্দেহ। আবার নরোত্তমের "হাটপত্তন" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই বা কি সুন্দর, কি ভাবশুদ্ধ, কি মনোহারী! যেন সমস্ত বৈষ্ণব,-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাসিত করিয়া ঐ "হাটপত্তনের" পত্তন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হাটপত্তনের বহু অনুকরণ হইয়াছে, আমরা মূলগ্রন্থের টীকায় কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সাধু বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, ঐ হাটপত্তন পাঠ করিলে সমগ্র চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠের ফললাভ করা যায়। নরোত্তমদাস এক অসাধারণ ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তি বঙ্গভূমে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এইজন্য ইহাঁকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের হৃদয়বন্ধু ছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "উভয়ে এত প্রীতি

ছিল যে, স্ত্রী-স্বামী বা কোন যুবক-যুবতীর মধ্যেও তাদৃশ প্রণয় পরিদৃষ্ট হয় না।"

পরমেশ্বর দাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা-গণনায়, ইঁহার নাম, যথা:—

"পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ।"

আবার চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে ইঁহার চারিবার উল্লেখ আছে; যথা:—

(১) "পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥"

(২) "কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥"

(৩) "কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুইজন।
গোপালভাবে হৈহৈ করে অনুক্ষণ॥"

(৪) "নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥"

বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীপরমেশ্বর দাস* "কেত" বা কাউগ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। কাহার কাহার মতে ইনি শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য। খেতুরীর মহামেলাতে ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সঙ্গে গিয়াছিলেন। ঠাকুরাণী খেতুরীতে যাইতেছেন, তখন:—

"ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস॥" নরোত্তমবিলাস।

খেতুরী পরিত্যাগ সময়ে সন্তোষ রায় জাহ্নবা ঠাকুরাণীকে উপঢৌকন স্বরূপ যে যে সামগ্রী দিয়াছিলেন; তাহা পরমেশ্বর দাসের হস্তেই অর্পণ করেন। নরোত্তম বিলাসে যথা:—

---

* চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত ও নরোত্তম-বিলাসে এই নাম দেখি। কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইঁহার প্রকৃত নাম পরমেশ্বরী দাস।

"শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাস সমর্পিল তাহা॥"

আবার শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন রামচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, তখন বীরচন্দ্রের আদেশক্রমে পরমেশ্বর দাস তাঁহাদিগের প্রধান রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন। যেই মাত্র ঠাকুরাণীর শিবিকা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল; বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণ ঠাকুরাণীকে গ্রহণ জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। তখন পরমেশ্বর দাসই জাহ্নবা দেবীর নিকট গোস্বামীগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন:—

"ঈশ্বরীর আগে শ্রীপরমেশ্বর দাস।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ॥
শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতাদি এক সাথ॥
এ সকলে আইলেন আগুসরি লৈতে।
এত কহি সবারে দেখান দূর হৈতে॥" নরোত্তমবিলাস।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া শ্রীপাট খড়দহ লইয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্যরত্ন, শ্রীরঘুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর, ও রামচন্দ্র কবিরাজ, পরমেশ্বর দাসের প্রতি যার পর নাই ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। প্রবাদ—আছে যে, এই সকল মহাত্মারা একদা পরমেশ্বর দাসের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন; এবং সেই অবধি তাঁহাকে অপ্রাকৃত মনুষ্য বা নর-নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইনি কিছুদিন গরলগাছা গ্রামে বাস করিয়া ছিলেন। পরে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশ ক্রমে "তড়া আটপুর" গ্রামে গমনপূর্ব্বক "শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ" বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম "শ্যামসুন্দর" হইয়াছে। অধুনা শুনিয়াছি, চাঁচড়া রাজাদিগের সরকার হইতে শ্যামসুন্দরের সেবা সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বর দাসের প্রভাব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। আমরা দুইটী বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। একদা আটপুরে পরমেশ্বর দাস ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন; এমন সময়ে গ্রামের কোন দুষ্ট লোক একটী মৃত শৃগাল কীর্ত্তন

দলমধ্যে নিক্ষেপ করে। পরমেশ্বরদাস সেই শৃগালকে জীবিত করিয়া কীর্ত্তনে নাচাইয়াছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায়, যথা:—

"পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালেরে নাম দিল সংকীর্ত্তনস্থানে॥"

২। পরমেশ্বরদাস একদিন ঐ আটপুর গ্রামে দুইখানি দন্তধাবন-কাষ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তাহা অতি সত্বর দুইটী প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পুরুষোত্তম দাস।

চৈতন্য-চরিতামৃতের শাখাগণনায় চারিজন পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় জন অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য; তৃতীয় ও চতুর্থ জন প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য। যথা—

(১) পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আরো কৃষ্ণদাস।
(২) পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
(৩) নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যার মহোন্মাদ হয়॥
(৪) শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥

বৈষ্ণববন্দনা পুস্তকেও এই চারিজনের উল্লেখ দেখিতে পাই। চতুর্থ জনের পরিচয় প্রবন্ধান্তরে দিয়াছি। অপর তিন জনের যথা —

(১) বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী॥
(২) পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজন।
প্রভু যারে দিল আচার্য্য গোসাঞীর স্থান॥
(৩) রত্নাকরসুত বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম।
নদীয়ায় বসতি যার দিব্য তেজোধাম॥

প্রথম দুইজন সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ মিল আছে। "নবদ্বীপের

পুরুষোত্তম পণ্ডিত” আর “রত্নাকরসুত পুরুষোত্তম ‘যার নদীয়ায় বসতি’ যে এক ও অভিন্ন, তাহারও কোন সন্দেহ নাই।

সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসই পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য হইলেও ইহাঁর অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে গঙ্গাগতি মাধবাচার্য্য একজন ও দৈবকীনন্দন অপর জন। চৈতন্য-ভাগবতেও সদাশিব-পুত্র পুরুষোত্তমের উল্লেখ আছে, যথা :—

“সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। যার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দ-চন্দ্র যার হৃদয়ে বিহারে॥”

ইহাঁর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহর। উপরের চারিজন পুরু-ষোত্তম ব্যতীত, আমরা আর একজনের সংবাদ পাইয়াছি। যশোর জিলার অন্তর্গত বোধখানাগ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। ইহাঁর বংশধর গোস্বামিগণ অদ্যাপি অতি প্রসিদ্ধ। এই পুরুষোত্তমের উপাধি “স্তোককৃষ্ণ” ছিল।

প্রসাদ দাস।

তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকাতে লিখিয়াছেন, “পরবর্ত্তী ভক্তগণ মধ্যে প্রসাদ দাস নামে অনেকেই ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এক প্রসাদদাস বৈরাগীর নাম নরোত্তমবিলাসে পাওয়া যায়। রসিক-মঙ্গলে শ্যামানন্দ-পরিবার-গণনায়ও এক প্রসাদদাসের নাম দৃষ্ট হয় এবং কর্ণানন্দে আচার্য্য প্রভুর শাখাগণনায় একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে।” বিগত বর্ষে তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট যে এক পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, “করণকুলোদ্ভব করুণাময়দাসের বাড়ী বিষ্ণুপুর। ইহাঁর দুই পুত্র, উভয়েই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বাটীতে থাকিয়া, তদীয় সমস্ত লিপিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই জন্য ইহাঁ-দিগকে ‘বিশ্বাস’ বলিত। তৎপূর্ব্বে ইহাঁদের কুলাগত ‘মজুমদার’ উপাধি ছিল। এই বিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের কনিষ্ঠের নামই প্রসাদদাস। আচার্য্য প্রভুর কৃপায় এই প্রসাদদাসই ‘কবিপতি’ হইয়া উঠেন।

প্রেমদাস।

প্রসিদ্ধ কবি প্রেমদাসের আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, পদবী সিদ্ধান্ত-বাগীশ। নবদ্বীপের গোকুলনগর বা কুলিয়াগ্রামে কশ্যপমুনির বংশে কাশ্যপগোত্রে বিপ্রকুলে গঙ্গাদাস মিশ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইঁহার জন্ম, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইনি ষোলবর্ষ বয়ঃক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম প্রাপ্ত হয়েন। মথুরাদি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিবার পর বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দজীউর সূপকারপদে নিযুক্ত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, তিনি গোবিন্দজীউর পূজারি ছিলেন। প্রবাদ এই যে, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন প্রভু প্রেমদাসকে কবিত্ব বর প্রদান করেন। ইঁনি ১৬৩৪ শকে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের স্বাধীন পদ্যানুবাদ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ইহাতে অনেক নূতন কথা অতিরিক্ত সংযোজিত হওয়াতে কাব্যখানি অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। ১৬৩৮ শকে ইঁহার মৌলিক কাব্য বংশীশিক্ষা রচিত হয়। প্রমাণ যথা :—

"ষোলশত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে,
প্রেমদাস করিল লিখন।" (চৈঃ চঃ নাঃ)

পুনশ্চঃ—"শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে॥
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষাগ্রন্থ করিল বর্ণন॥" (বং শিঃ)

প্রাগুক্ত স্বপ্নদর্শনের পরই তিনি গৌরলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন।

এই দুই গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহার সুমধুর পদাবলী আছে এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে "পদাবলী সাহিত্যেই তাঁহার অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।" ফলতঃ প্রেমদাস কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না, একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়বিষয়ক পদটী পরম্পরিত রূপকের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল; এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনার পদটী প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার আদর্শ বলিলে হয়। প্রেমদাসের অনেক পদ

পড়িতে পড়িতে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়। প্রেমদাস ও প্রেমানন্দদাস যদি একব্যক্তি হয়েন, তবে ইঁহার "মনঃশিক্ষা" নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য আছে। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; এবং মনঃশিক্ষাপাঠে দেখা যায়, তিনি একজন ঘোর সংসারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। প্রেমদাসের অধিকাংশ পদাবলী পড়িলে হৃদয় শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারসে দ্রবীভূত হয়; এবং মনঃশিক্ষা পড়িলে মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া সংসারাসক্তি বিদূরিত হয়।

ভাষাচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে প্রেমদাস লিখিয়াছেন যে, "যবে ষোল বর্ষ বয়ঃ, তবে হৈল ভাগ্যোদয়, গিয়াছিনু মথুরামণ্ডলে।" বিশ্বকোষকার বলেন "যখন তাঁহার ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী তখন শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী। গোস্বামী প্রেমদাসকে বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, তাঁহাকে গোবিন্দের পাককার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেখানে তিনি কএক বৎসর ছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনয়ন করেন। বাড়ী আসিয়া প্রেমদাস শান্তিপুরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি নবদ্বীপে যান। নবদ্বীপে গিয়া তিনি রাত্রিকালে মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করেন। তখনই তাঁহার চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে ইচ্ছা হয়; তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উৎপত্তি। প্রেমদাস ইচ্ছা করিয়াই "সূপকার" বা "পূজারির" হীনপদ গ্রহণ করেন। তাঁহার যে কৃষ্ণদাস্যে অভিলাষ ছিল, তাহা এইরূপে পূর্ণ হয়। নতুবা তাঁহার ন্যায় নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও অভিজ্ঞ, পরন্তু "সিদ্ধান্তবাগীশ" উপাধিধারী পণ্ডিত, অন্ততঃ একটা টোল স্থাপন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। প্রেমদাস বংশীশিক্ষায় যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই:—

"———গোরা যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধপ্রপিতামহ, শ্রীগোকুলনগরে সেহ,
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা।*

* প্রেমদাস আপন বাসগ্রামের নাম এইরূপ লিখিয়াছেন:—"কুলনগর গ্রামে গৃহাশ্রম কৈলা" কোন জিলায় "কুল" গ্রাম ছিল দেখেন নাই।"—বিশ্বকোষ।

কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল-অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মনিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞাবলী,
কৃষ্ণদাস্তে মোর অভিলাষ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রেমদাসের প্রপিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতামহের নাম মুকুন্দানন্দ মিশ্র এবং পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। প্রেমদাসের অপর পাঁচ সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে ৩ জন শৈশবেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবশিষ্ট দুই জনের মধ্যে শ্রীগোবিন্দরাম জ্যেষ্ঠ ও রাধাচরণ মধ্যম. ইহাঁর "আনন্দভৈরব" ও "চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী" নামে আরো দুইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে।

বলরাম দাস।

বলরামদাস লইয়া সাহিত্য-জগতে বিষম গোল। আমরা নিম্নে ১৯ জন বলরামের তালিকা দিতেছি। ইহার মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয়ের বিস্তারিত জীবনী লিখিব, কারণ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই দুইজনই কবি ও পদকর্ত্তা।

(১) প্রেমবিলাসরচয়িতা নিত্যানন্দদাসের নামান্তর বলরামদাস। ইনি পূর্ব্বলীলায় "বড়াইবুড়ী" ছিলেন। ইহার বিষয় চৈতন্যভাগবতে যথা :—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে যথা ঃ—

"বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

আবার বৈষ্ণববন্দনায় যথা ঃ—

সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস॥"

(২) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছীগ্রামবাসী, নিত্যানন্দশিষ্য বলরাম দাস। ইনি পূর্ব্বলীলার সুমন্দিরা সখী। কবিরাজ গোস্বামিকৃত "স্বরূপ-বর্ণন" নামক গ্রন্থে যথা ঃ—

"মন্দির মার্জ্জন করেন সুমন্দিরা সখী।
এবে তাঁর বলরামদাস খ্যাতি লিখি॥"

"ভাবামৃত-মঙ্গল"গ্রন্থেও ইহাঁর দুইবার উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা ঃ—

"জয় প্রভু প্রিয় শ্রীবলরাম দাস।
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস॥"

পুনশ্চ ঃ—"জয় দ্বিজ বলরাম দোগাছিয়াবাসী।
গৌরগুণগানে যেই মত্ত দিবানিশি॥"

(৩) মহাপ্রভু যখন দক্ষিণাপথ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন এক বলরাম দাস রামশিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। গোবিন্দের কড়চায় যথা ঃ—

"রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হৈয়া পুলকিত॥"

(৪) বৈষ্ণববন্দনায় আর এক বলরাম যথা ঃ—

"কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্বের প্রচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥"

(৫) বৈষ্ণববন্দনায় দ্বিতীয় এক বলরাম যথা ঃ—

"বন্দ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম বশ যার হয়॥"

(৬) নরোত্তমবিলাসে "পূজারি বলরাম" ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক শিষ্য।

(৭) উক্তগ্রন্থে "বলরাম কবিরাজ নামে একজন।

(৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায় "কবিনৃপবংশজ, ভুবনবিদিতযশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম॥"

(৯) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য "কবিপতি" বলরাম।

(১০) উক্ত গ্রন্থে শ্রীনিবাসশাখায় আর একজন বলরামের নাম আছে।

(১১) অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্রের নাম বলরাম।

(১২) বলরাম দাস নামে জনৈক হিন্দু রাজা অযোধ্যাপ্রদেশের গোণ্ডা-জেলার অন্তর্গত বলরামপুররাজ্যস্থাপন করেন।

(১৩) নদীয়া গোয়াড়ীনিবাসী বলরামদাস নামে জনৈক চৌকিদার, বলরামভজাদলের প্রবর্ত্তক। ইনি জাতিতে হাড়ি ছিলেন। বলরামভজা-সম্প্রদায় এখন নদীয়া, বর্দ্ধমান ও পাবনা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে।

(১৪) বৈষ্ণববন্দনায় "বলরাম মাহাতির" নাম পাওয়া যায়।

(১৫) "দেব" আখ্যাধারী বলরাম। ইনি দাক্ষিণাত্যের জয়পুর-রাজবংশীয় জনৈক রাজা। নন্দীপুরে ইহাঁর রাজধানী ছিল।

(১৬) "বর্ম্মা" আখ্যাধারী বলরাম। দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের জনৈক রাজা।

(১৭) "কবিকঙ্কণ" উপাধিবিশিষ্ট বলরাম। ইনি মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থ অনুবাদ করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

(১৮) "পঞ্চানন" উপাধিধারী বলরাম। ইনি ধাতুপ্রকাশ ও তৎটীকা এবং প্রবোধপ্রকাশ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

(১৯) শ্রীল বাবু শিশির কুমার ঘোষের নামান্তর বলরাম দাস।

প্রেম-বিলাসরচয়িতা নিত্যানন্দদাসের পূর্ব্ব নাম বলরাম দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য, নিবাস শ্রীখণ্ডগ্রামে। ইহাঁর পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। ১৪৫৯ শকাব্দায় ইহাঁর জন্ম। ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য; এবং খেতুরীর মহোৎসবে যখন জাহ্নবা গমন করেন, তখন অন্যান্য নিত্যানন্দ-ভক্তগণ সহ বলরাম দাসও গিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও "বিজ্ঞবর।" যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

"মুরারি, চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর।
পরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর॥"

বলরামকে অনেকে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বলেন। কিন্তু তিনি যে

জাহ্নবা ঠাকুরাণীর শিষ্য, তাহা স্বয়ং প্রেমবিলাস স্বীকার পাইয়াছেন। যথা :—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি ॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "পদকর্ত্তা আত্মারাম দাসই কবি বলরামের পিতা।" প্রেমবিলাসে বলরাম যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥
আমি এক পুত্র, মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই ॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন ॥
বলরামদাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥"

এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া জানা গেল যে, বলরাম দাসের মাতা পিতা ভিন্ন সংসারে আপন বলিবার অন্য কেহ ছিল না। তাই শৈশবে মাতৃপিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি বাস্তবিক "অনাথ" হইয়াছিলেন। তাঁহার যে কেহ ছিল না, শুধু তাহাই নহে; আমরা অনুমান করি, তাঁহার কিছুও ছিল না, বস্তুতঃ তিনি অনাথ ও দরিদ্র বালক ছিলেন। আমাদিগের এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। কবির পিতা আত্মারাম দাস একজন নগণ্য কবি ছিলেন; প্রায় সকল দেশের কবিরাই নিঃস্ব, বাঙ্গালার কবি চিরকাল দীন দরিদ্র, ইহার প্রমাণ বা উদাহরণ দিবার প্রয়োজন দেখি না। আত্মারাম দাস কেবল পদরচনা বা কীর্ত্তন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহা তাঁহার পত্নী, শিশুপুত্রের ও আপনার ভরণ-পোষণেই ব্যয় হইত। সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, দিনপাত হওয়াই দুষ্কর ছিল। সুতরাং মৃত্যু-সময়ে যে তিনি বলরামের জন্য কিছু রাখিয়া

গাইতে পারেন নাই, সে কথা স্থির নিশ্চয়। অতএব বলরামের পক্ষে "অনাথ হইয়া" "অনিবার" ভাবিবারই সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে প্রেমবিলাস হইতে যে দুই চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাহ্নবা ঠাকুরাণী বলরামের দীক্ষা-গুরু। আমরা উহার দ্বিতীয় চরণ হইতে আরো কিছু বৃত্তান্ত অনুমান করিতে চাই। বলরাম দাস ঈশ্বরীর দয়া সম্বন্ধে কহিতেছেন যে, "ঠাকুরাণী আমার প্রতি এতই দয়া করিয়াছিলেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না॥" ঈশ্বরী যে বলরাম দাসকে কেবল "কৃপার ভাজন" অর্থাৎ শিষ্য করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। আমরা অনুমান করি, তিনি বলরামের অশন, বসন, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস একখানি উচ্চদরের কাব্যেতিহাস, উহার বিষয় যোজনা, শৃঙ্খলাকরণ, এবং বর্ণন সর্ব্ববিষয়েই গ্রন্থকারের প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থরচনা সামান্য লেখা পড়া জানা লোকের কর্ম্ম নহে। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, জাহ্নবা ঠাকুরাণী বলরামকে তৎকাল-প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রেমবিলাস ছাড়া, "গৌরাঙ্গাষ্টক" ও বাঙ্গালা "বীরচন্দ্রচরিত" নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে।* বলরাম দাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, এবং তাঁহার সন্তানাদি জন্মিয়াছিল কি না, জানা যায় না, কিন্তু তদ্রচিত একটী পদাংশ এই :—

"তৃতীয় সময়কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্রকলত্র গৃহবাস॥
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরিপদে না করিনু আশ॥"

এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া সুচতুর ও সুবিজ্ঞ বিশ্বকোষ রচয়িতা বলেন "এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া 'তাঁহার আত্মপক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাও হইয়াছিল।" ইহার উপর আমরা এইটুকু যোগ করিতে চাই যে, এই বিবাহ জাহ্নবা ঠাকুরাণীর অনুমতি ও সাহায্যে হইয়াছিল।

---

* ইহাঁর রচিত আর তিনখানি গ্রন্থের নাম "রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত ও হাটবন্দনা।"

ভাবামৃত-মঙ্গল-গ্রন্থোক্ত বলরাম দাস সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "ইনি স্পষ্টতঃ গৌরভক্ত ও ব্রাহ্মণ, স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত কবি বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন না॥" কিন্তু দোগাছী-নিবাসী বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় যখন বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ও আমার নিকট এক স্বতন্ত্র পত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দোগাছীনিবাসী নিত্যানন্দশিষ্য বলরাম দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, তখন ইনিও যে বিখ্যাত কবি ও পদকর্ত্তা, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমরা গুরুদাস বাবুর সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বনপূর্ব্বক এই পদকর্ত্তা বলরাম দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের মতে, বলরাম দাস ঠাকুর পাশ্চাত্য বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়; আদিনিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর বলরাম দাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরমধ্যবর্ত্তী দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বলরামদাস ঠাকুর যে শ্রীগোপালমূর্ত্তির সেবা করিতেন, ঐ মূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির অদ্যাপি দোগাছিয়া গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু একদা সশিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় প্রিয়শিষ্যের প্রগাঢ়ভক্তি ও গোপালসেবার স্থপদ্ধতিদর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বলরামদাসকে স্বীয় শিরোভূষণ (পাগড়ি) প্রদান করিয়া যান। ঐ পাগড়ী অদ্যাপি বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধরগণ পরমযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিবসে বলরামদাস ঠাকুরের তিরোধান উপলক্ষে দোগাছিয়াগ্রামে প্রতিবর্ষে এক মেলা হয়। ঐ মেলার সময় অনেক দূর হইতে বৈষ্ণবগণ আসিয়া ঐ পাগড়ি দর্শন-পূর্ব্বক জীবন সার্থক করেন।

বলরাম দাস কর্ত্তৃক শ্রীগোপালমূর্ত্তি প্রাপ্তি ও স্থাপনসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী মহাশয়ের উক্তি আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"নিত্যানন্দ প্রভু যখন বলরাম ঠাকুরকে দীক্ষাপ্রদান করেন, তখন তিনি তাঁহাকে গোপালমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলেন এবং গোপালের রূপ তাঁহার নিকট বর্ণন করেন। বলরামের হৃদয়ে সেইরূপ অঙ্কিত

হইয়াছিল। তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন, আর শ্রীমৎনিত্যানন্দ প্রভুর বর্ণিত মনোহর গোপালমূর্ত্তির রূপমাধুরী আস্বাদন করিতেন। কিন্তু কোথাও সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া আকুলহৃদয়ে কালযাপন করিতেন। দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ স্বীয় শিষ্যের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া বলরামকে বলেন, জগন্নাথ ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পার্শ্বে যে গোপালমূর্ত্তি আছেন, সেই তোমার মনোহর মূর্ত্তি। তাঁহাকে আনয়ন করিয়া পূজা করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

গুরুর আদেশক্রমে বলরাম দাস শ্রীক্ষেত্র হইতে গোপালমূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক দোগাছিয়াগ্রামে স্থাপন করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ গোপালের সেবার্চ্চনা করিয়া দেহপাত করেন। বলরামদাস গুরুর আদেশ ক্রমেই দারপরিগ্রহ করিয়া গোপালমূর্ত্তির সেবা করিতেন। বলরামদাস ঠাকুরের বংশপত্রিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।
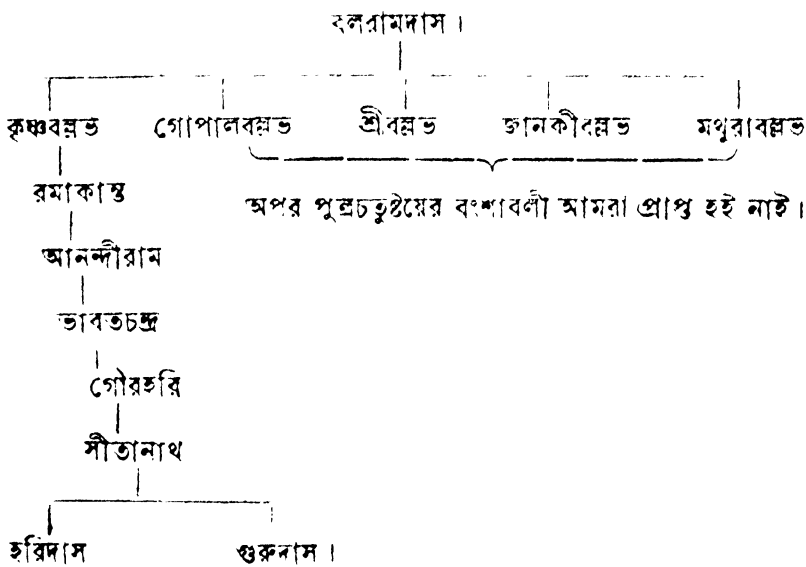
বল্লভদাস।

আমরা এই নামে দুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। ভক্তিরত্নাকর মতে :—

(১) বল্লভদাস বা বল্লভীকান্তদাস "ভক্তিমূর্ত্তি" ও "ভক্তি-অধিকারী।" ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবি-

রাজ উপাধিধারী। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বলেন যে, বল্লভদাসের এতই ভক্তি-বল ছিল যে, ইহাঁকে দেখিলে পাষণ্ডগণ ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর হইত। ইনি কুলীনগ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে :—

"বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥"

(২) বংশীবদন দাসের পুত্র চৈতন্যদাসের দুই পুত্র :—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র, যথা বংশীশিক্ষাগ্রন্থে —

"শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
তিন প্রভু, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥"

এই বল্লভদাস "বংশীলীলা" গ্রন্থে স্বীয় প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "বল্লভদাস ঠাকুর মহাশয়ের সম-সাময়িক এবং তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। একটী পদে লিখিয়াছেন,—

'নরোত্তমদাস, চরণে বহু আশ, শ্রীবল্লভ মনভোর।'

অন্য একটী পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাধাবল্লভই "বল্লভ-ভণিতায় এই পদগুলি রচনা করেন।" ইহাঁর "রসকদম্ব" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

বংশীবদন দাস।

প্রেমদাস-বিরচিত নিম্নলিখিত পদে বংশীবদনদাসের জন্মাদি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় :—

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্টো নাম,
মহাতেজা কুলীনসন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তার, রমণী-কুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান।

তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান ॥
দশমাস দশদিনে, রাকাচন্দ্র লগ্নমীনে,
চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥" ইত্যাদি

উপরি উদ্ধৃত পদের বা বংশীদাসের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতেছে। বর্ত্তমান পদে দেখা যায়, মহাপ্রভুর সম্বোধনে (ডাকে) বা আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশী বংশীদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্ম সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ আছে। আবার বৈষ্ণব-গ্রন্থনিচয়ের মতে স্বয়ং মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে বা আকর্ষণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবৈষ্ণব নাস্তিকদিগের মতে এ সকল কথা অর্থশূন্য বা কল্পনা-বিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। বাস্তবিক উহাদের গূঢ় অর্থ আছে। কারণ এগুলি যোগের কথা—সাধনরাজ্যের কথা। অমিয়-নিমাইচরিতে যে "শক্তি-সঞ্চার" ও "আকর্ষণ" শব্দের বিচার আছে, পাঠক যদি মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তবে এই সকল কথার মর্ম্ম অনেকাংশে বুঝিতে পারিবেন। জড়ের ন্যায় আত্মারও আকর্ষণশক্তি আছে, এবং জড় পদার্থ যেমন স্বীয় শক্তি অপর জড়পদার্থে প্রয়োগ করিতে পারে, আত্মাও তদ্রূপ অপর আত্মার উপর স্বশক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ। আত্মার এই গুণদ্বয় যোগমার্গাবলম্বিগণ, প্রেততত্ত্বজ্ঞগণ ও থিওসফিষ্টগণ কোন না কোন আকারে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিলে এই দুইটী গুণের কার্য্য সচরাচরই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাচীন নবদ্বীপ নব বা সপ্ত দ্বীপবিশিষ্ট ছিল। ইহার ঠিক মধ্যস্থানের দ্বীপের নাম ছিল মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা এবং উহার খুব নিকটবর্ত্তী দ্বীপের নাম কোলদ্বীপ বা কোলিয়া (কুলিয়া) পাহাড়। ইহাই বংশীবদন দাসের জন্মস্থান। এইস্থানে মহাতেজস্বী ও মহাকুলীন ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার ঔরসে বংশীবদনদাস জন্মগ্রহণ করেন। চৈত্রমাসে সায়ংকালে রাকাচন্দ্র মীনলগ্নে প্রবেশ করিবার সময়ে বংশীবদন

ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহাঁর শুভজন্মের প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে অদ্বৈত আচার্য্য সহ উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্ব্বাবতারের অতিপ্রিয় মোহনমুরলী বংশীবদনরূপে আবির্ভূত হওয়াতে প্রভুর মনে এতই আনন্দের উদয় হইয়াছিল যে, স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রিয়সমাগমে কাহার না আনন্দ হয়? মেঘ ও ময়ূরে নাকি বড় প্রীতি; তাই গগনে কাল-কাদম্বিনীর উদয় হইলে শিখী চন্দ্রককলাপ ঊর্দ্ধ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। জলদে ও উদ্ভিদেও নাকি বিশেষ বন্ধুতা; তাই বিন্দু বিন্দু বারিপাতেও তৃণসম্প ও বৃক্ষপত্র প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। নির্জ্জীব পদার্থ ও ইতর প্রাণীতে যখন পরস্পর এইরূপ প্রীতিজনিত আনন্দ, তখন জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ মানব কেন আনন্দের ঢেউ না খেলিবে। প্রভু আমাদের মানবরূপী, সুতরাং মানবের ন্যায় তিনিও প্রিয়সমাগমে যে আনন্দিত হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? বিশেষতঃ বংশীবদনের আবির্ভাবে জগৎ যে একজন প্রকৃত কবি লাভ করিয়াছিল, এরূপ নহে; বংশীবদন না জন্মিলে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিত। রায় রামানন্দ ও রূপসনাতন প্রভৃতি সঙ্গী ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া জীবদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু "রসরাজউপাসনা" সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বংশীবদন দাসকে সে সকল নিগূঢ় উপদেশ দিয়াছিলেন, বংশীবদন না জন্মিলে কলির জীব সে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিত না। সুতরাং এমন ভক্তের—যে ভক্তকে উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু জীবকে মধুর-নিগূঢ়-রসের শিক্ষা দিয়াছেন—জন্মহেতু প্রভুর অতুল আনন্দ না হইবার কথা কি?

বংশীবদনের জন্মসম্বন্ধে বংশীশিক্ষা গ্রন্থেও লিখিত আছে:—

"শ্রীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবন॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলীয়ায়।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায়॥
তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজন।
* * * *
চৌদ্দশতে ষোলশকে মধুপূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায়, ১৪১৬ শকে বংশীবদনের জন্ম। কিন্তু "বংশী-বিলাস" গ্রন্থে বংশীবদনের যে জন্মাব্দ আছে, তাহার সহিত "বংশীশিক্ষার" এই অব্দের মিল নাই। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রথমে পাটুলিগ্রামে বাস করিতেন; পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে ও অনুরোধে কুলিয়া-পাহাড়-গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বাসস্থান-পরিবর্ত্তন অন্ততঃ ১৪১৫ শকে ঘটিয়া থাকিবে, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম সাত কি আট বৎসর মাত্র। ইহাতে ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারেন যে, ৭ কি ৮ বৎসরের শিশুর অনুরোধে পরমবিজ্ঞ ও তেজস্বী ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় বাস-ভূমির পরিবর্ত্তন করিবেন, এ কথা ইতিহাসের চক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। সুতরাং বংশীদাসের জন্ম ১৪১৬ শকে না হইয়া ১৬২৭ কি ১৬২৮ শকে হইয়া থাকিবে। কিন্তু বংশীশিক্ষার অব্দ ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ নিতান্ত শিশু ছিলেন, তথাপি তিনি নররূপে শ্রীভগবান্। এই শিশুরূপী ভগবানের ইচ্ছায় এবং অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বাস-গ্রাম পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহাতে অলৌকিক বা অসম্ভব কিছু আছে কি? নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সমস্ত গোপ এবং গোপ-রমণীদিগকে বলিয়াছিলেন, "অদ্যাবধি তোমরা আর ইন্দ্রের পূজা করিও না, এই গোবর্দ্ধনের পূজা কর"। ব্রজের সমস্ত লোক অবিচারিতচিত্তে সেই শিশুর আদেশানুসারে যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। এই গৌরাঙ্গ যখন মাতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করেন, তখন একদিন কোন ব্যাধির ছল করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শচীদেবী কোন-ক্রমে তাহাকে শান্ত করিতে পারেন না, শেষে শিশু কহিলেন, "জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত অদ্য একাদশী উপলক্ষে বিষ্ণুর জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছে, সেই নৈবেদ্য আমাকে খাইতে দিলে আমি শান্ত হইব।" পরম বিষ্ণুভক্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্বান্ জগদীশ ও হিরণ্য, বালকের রোদন ও আব্দার শুনিয়া, সেই প্রস্তুত (নিবেদিত নহে) নৈবেদ্য শিশু নিমাঞীকে খাইতে দিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দশম ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে; যথা—

"জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥"

দশম পরিচ্ছেদে।

"ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশী দিনে॥"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে।

ইহার পর ঐতিহাসিক মহাশয় আর কি বলিতে চান?

কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বংশীবদনের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। তথায় বংশী নিজেও প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উত্তরকালে বংশীবদনদাস বিল্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন, ঐ বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার জ্ঞাতি। বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্ততিও জন্মিয়াছিল। তদীয় বংশধরগণের একটী বংশ-স্তম্ভ নিম্নে দেওয়া গেল। ইঁহার "দীপকোজ্জ্বল" নামে এক খানি গ্রন্থ আছে।
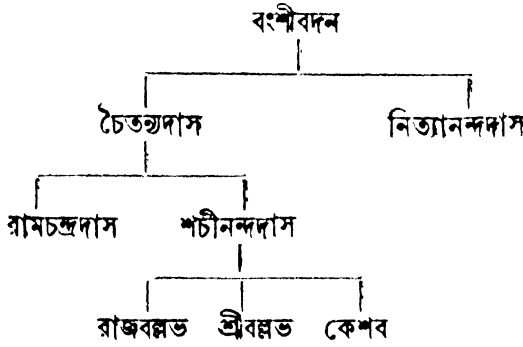
বংশীবিলাসগ্রন্থে বংশীবদনদাসের পাঁচটী নাম দৃষ্ট হয়; যথা—

"শ্রীবংশীবদন, বংশী, আর বংশীদাস।
শ্রীবদন, বদনানন্দ, পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চটী নাম গায় কবিগণ।
মুখ্যনাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভুর গৃহে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে নবদ্বীপে বাস করেন। তথা, শ্রীমতীর অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর এক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার সেবার্চ্চনা করিতেন। এই মূর্ত্তি অধুনা যাদবমিশ্রের বংশধরগণের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছে।

বংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, সুন্দর অথচ প্রগাঢ়। ইনি "দীপান্বিতা" প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যেরও রচয়িতা। বৈষ্ণববন্দনায় বংশীবদনের বন্দনা যথা:—

"শ্রীবংশীবদন বন্দ যুড়ি দুই কর। যাঁর বংশে অবতার কৈলা গদাধর।
গৌরাঙ্গের প্রাণ সম শ্রীবংশীবদন। যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্যচরণ॥"

বাসুদেব ঘোষ।

একটী পদের ভণিতায় বাসুদেব ঘোষ আপনাকে "বাসুদেবানন্দ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বাসু ঘোষের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে ছিল, ঐ স্থানেই বাসুদেবের জন্ম হয়। ইহাঁর অপর দুই সহোদরের নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। কোন কারণে বাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন; পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁরা তিনজনই শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক, তিন জনেই গৌরাঙ্গ-ভক্ত এবং গৌরাঙ্গ-গঠিত তিন সংকীর্ত্তনদলের মূলগায়ক ছিলেন। ইহাঁ-দিগের নবদ্বীপবাসের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। তিন ভ্রাতাই পদকর্ত্তা, এবং তিন ভ্রাতাই সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের নানা স্থানে তিন ভ্রাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গের গণ; কিন্তু গোবিন্দ ভিন্ন অপর দুই ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবার মধ্যেও গণ্য।

চৈতন্যচরিতামৃতে, যথা :—

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ।"

চৈতন্য-ভাগবতে, প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গীতবর্ণনে যথা :—

"গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়॥"

বাসুদেব গৌরাঙ্গ-লীলার অতি প্রধান পদকর্ত্তা। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "অনেক সময়ে তিনি প্রভুর অনুসঙ্গে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার

রচিত পদের ঐতিহাসিক গৌরবও সামান্য নহে।" বাসুর পদাবলী এমনই সুন্দর ও মনোমদ যে কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥"

ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর কৃত পদের অনুকরণে পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। পদসমুদ্রে যথা :—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃতপানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা॥
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাঞীহাটায় ও বাসুঘোষ তম্‌লুকে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচারদর্পণে বাসু ঘোষ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"গুণতুঙ্গা সখী এবে বাসু ঘোষ খ্যাতি।
গৌরাঙ্গের শাখা তমলুকেতে বসতি॥"

দেবকীনন্দন দাস বাসুদেব ঘোষের বন্দন উপলক্ষে কহিয়াছেন :—

"শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥"

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, সামান্যরূপ লেখা-পড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদ এত গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ অসম্ভব। আমরা একটী পদের দুইটী মাত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের বাক্যের সমর্থন করিতেছি। যথা :—

"দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর॥"

এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ জিতে, কেহ হারে। কেহ জিতে দুই চারি ইত্যাদি সমদানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষমদানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার জন্য গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, "আমি 'হরি' বা 'কৃষ্ণ' দ্বি-অক্ষরাত্মক নাম; বা 'হরেকৃষ্ণ' কি 'রাধাকৃষ্ণ' এই চতুরাক্ষরাত্মক নাম

জপ করিলেই ভবের পাশায় জিনিব। অথবা 'দুই' আর 'চারিতে' 'ছয়' হয়; সুতরাং ষড়রিপু জয় করিলেই সিদ্ধিলাভ করিব।" কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, "'পিরীতি' এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া, ভজন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। যে খেলাতে তত পটু নহে, অর্থাৎ যে 'পিরীতি' বা 'শৃঙ্গার' রসের মর্ম্ম জানিতে অধিকারী হয় নাই; তাহাকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই 'পঞ্চদান' লইয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে। অথবা 'তিন' আর 'পাঁচে' আট হয়। সুতরাং অষ্ট-সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনে সাধন করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে।" কিংবা মহাপ্রভু, ৩+৫=৮এর দ্বারা ইহাও সঙ্কেত করিতে পারেন যে, 'যদি কেহ সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে 'অষ্ট-সখীর' অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার প্রধানা অষ্ট-সখীর অন্যতমের অনুগা হইতে হইবে।" কেন না সখীর অনুগা হইয়া ভজন না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।

বৃন্দাবনদাস।

বৈষ্ণববন্দনাগ্রন্থে লিখিত আছে :—

"নারায়ণীসুত বন্দ বৃন্দাবন দাস। যাহার কবিত্বগীত জগতে প্রকাশ॥"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥"

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-সুতা নারায়ণী ঠাকুরাণী "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র" এবং বৈষ্ণবমাত্রেরই নমস্য। ইঁহার যখন মাত্র চারিবৎসর বয়ঃক্রম, তখন ইনি কৃষ্ণপ্রেমে এত অভিভূতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চৈতন্য ছিল না এবং সেই অচৈতন্য অবস্থায়ই—

"অশ্রু বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥"

বৃন্দাবন দাস এ হেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২৭ শকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনিবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-কন্যা নারায়ণী তখন বিধবা, তাঁহার বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে, তিনি বাল-বিধবা নারায়ণীকে "পুত্রবতী হও" বলিয়া অন্যমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ শুনিয়া নারায়ণী নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া কহিলেন, "প্রভো! একি সর্ব্বনেশে, আশীর্ব্বাদ?' অবধূত কহিলেন, "বৎসে! ভয় নাই। তুমি অসতী হইবে না, কেহ তোমার কুৎসাও করিতে পারিবে না, আমার আশীর্ব্বাদে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ-ভক্ষণে তোমার গর্ভসঞ্চার হইবে, এবং সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাসতুল্য এক পুত্ররত্ন জন্মিবে।" ইহার কিছুদিন পর মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হয়েন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হয়েন।

নারায়ণীর গর্ভ যখন সাত আট মাসের, তখন নবদ্বীপস্থ তদানীন্তন কাজী এই অদ্ভুত গর্ভসঞ্চারের সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে কাছারীতে লইয়া যান। প্রভু নিত্যানন্দ কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, "অবোধ! তুমি স্বেচ্ছায় কেন জ্বলন্ত পাবকে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছ? মাতা নারায়ণীর গর্ভে স্বয়ং বেদব্যাস উদিত, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?" নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ হইতে এই বাক্য বহির্গত হইতে না হইতে গর্ভস্থ শিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাজী একান্ত ভীত হইয়া শিবিকাযোগে নারায়ণীকে শ্রীবাসগৃহে প্রতিপ্রেরণ করিলেন। কিছু দিনান্তর নারায়ণী মাতুলালয় শ্রীহট্টে যাইয়া বাস করিলেন, এইস্থলেই করিব জন্ম।

বৃন্দাবন দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জারজ সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহার মাতাকে নানা নিন্দা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। লোকনিন্দা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি, তথা ভক্তিরসে মন নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশে দেড় বৎসরের শিশুসন্তান লইয়া শ্রীহট্ট মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণী ঠাকুরাণী ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে আসিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে বাস করিতে লাগিলেন। তথা হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন ও হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন এবং এই সময়

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নারায়ণীর সখীত্ব স্থাপিত হয়। যে রাত্রিতে মহাপ্রভু গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ জন্য কণ্টকনগরে গমন করেন, সেই দিন প্রিয়াজীর অনুরোধে নারায়ণী প্রভুর গৃহে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। শচীমাতার ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কালনিদ্রা হইয়াছিল, কিন্তু ভক্ত নারায়ণী প্রভুর মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া সমস্ত রজনী রোদন করিয়া কাটাইয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমেই নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছির বাসুদেবদত্তের গৃহে পুত্র সহ বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে "নারায়ণীর পাট" বর্ত্তমান।

১৪৩১ শকাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ পরিত্যাগ করেন। তখন বৃন্দাবনের বয়ঃক্রম দুই বৎসর। তবে চৈতন্য-ভাগবতের আদিলীলার ১০ম অধ্যায়ে ও মধ্যলীলার ১ম অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস এই খেদোক্তি—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন।
হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (সুখ) দরশনে ॥"

করেন কেন? পুনশ্চ মধ্যের অষ্টমে দুঃখ করিয়া—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হৈল।
হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥"

এরূপ বলেন কেন?

তাঁহার মাতা মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর স্বগৃহে ও শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া প্রভুর মুখদর্শন ও তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। তখন তিনি কি শিশু পুত্র ক্রোড়ে করিয়া যাইতেন না? তবে এইরূপ হইতে পারে যে, বৃন্দাবন নিতান্ত শিশু বলিয়া মহাপ্রভুকে চিনিতেন না এবং তাঁহার নৃত্যকীর্ত্তনের মর্ম্মও বুঝিতে পারিতেন না, সেই জন্য উপরোক্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় বৃন্দাবনের বয়স ২৬ বৎসর। তিনি মহাপ্রভুর পরম ভক্তচরিতচরিতরচয়িতা, এরূপ অবস্থায় কেন যে নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে একবারও দেখেন নাই, একথা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। এই নির্দ্দেশ যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের প্রাগুক্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

বৃন্দাবনদাস প্রভু নিত্যানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। এ কথা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। যথা:—

"ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥" চৈ, ভা, ।

বৃন্দাবন তদীয় সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ ১৪৫৭ শকে* নিত্যানন্দের আদেশে রচনা করেন। যথা :—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥" চৈ, ভা,।

কেবল যে নিত্যানন্দের আদেশে লিখিয়াছেন, তাহা নহে; কোন কোন কথা অবধূতের মুখে শুনিয়াও লিখিয়াছেন, যথা :—

"নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥" চৈ, ভা,।

চৈতন্য-ভাগবত রচনার দুই বৎসর পর, অর্থাৎ ১৪৫৯ শকে † বৃন্দাবন-দাস "নিত্যানন্দবংশবিস্তার ‡" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্ট বলিলে অসঙ্গত হয় না।

চৈতন্যভাগবতের নাম ১৫০৩ শক পর্য্যন্ত চৈতন্যমঙ্গল ছিল। পরে মাতার অনুরোধে বৃন্দাবনদাস উহার নাম পরিবর্ত্তন করেন। চৈতন্য-ভাগবতের নাম যে পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত ও প্রেমবিলাস পাঠে স্পষ্ট দেখা যায়। লোচনদাসের পুস্তকের নাম "চৈতন্যমঙ্গল" হওয়াতে পাছে বা ইহা লইয়া বৃন্দাবন ও লোচন বিবাদ করেন, এই জন্য নারায়ণী ঠাকুরাণী পুত্রকৃত গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের "ভাগবত" নামেরই উল্লেখ আছে। যথা :—

---

* ৺রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস" চৈতন্যভাগবত ১৪৭০ শকে (১৫৪৮খৃ:অ:) রচিত। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর "বঙ্গরত্নে" ঐ গ্রন্থ ১৪৭৯ শকে (১৫৭৫খৃ: অ:) রচিত।

† শ্রীযুক্তদীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃ: অ:) নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার রচিত হয়।

‡ দীনেশবাবু এই গ্রন্থের নাম "নিত্যানন্দবংশমালা" লিখিয়াছেন। আবার আমাদিগের জনৈক পত্রপ্রেরক ইহার নাম "নিত্যানন্দ-বংশাবলী" লিখিয়াছেন।
উহা "বৈষ্ণবপ্রতিভার" ২য় সংখ্যায় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

"বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবতের বারংবার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, চৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিত নাই, বা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীয় গ্রন্থে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব চরিতামৃতকে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিলেও বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাস-কৃত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম "বৈষ্ণববন্দনা", কাহার কাহার মতে "ভজননির্ণয়" ও "তত্ত্ব-বিকাশ" গ্রন্থদ্বয়ও বৃন্দাবনদাস-বিরচিত। আমরা প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি যে, খেতুরীর মহামেলায় বৃন্দাবনদাস গিয়াছিলেন। ১৫১১ শকে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে বৃন্দাবনদাসের অন্তর্দ্ধান হয়। রায় রঘুপতি ও বল্লভ বৃন্দাবন দাসের বন্ধু ছিলেন। বৃন্দাবন স্বীয় একটী পদে বন্ধুদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

"রায়রঘুপতি, বল্লভসঙ্গতি, বৃন্দাবনদাস ভাষই।" পদকল্পতরু।

১৪৪৩ কি ১৪৪৪ শকে প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচল গমন করেন। অন্যান্য বহুভক্তের মধ্যে এই কয়েক জনের উল্লেখ আছে :—অদ্বৈতাচার্য্য, সীতাদেবী, শ্রীবাস, তাঁহার তিন ভ্রাতা, মালিনী দেবী, সপত্নীক শিবানন্দ সেন ও তাঁহার পুত্রত্রয়। এতদ্ব্যতীত কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ডবাসী সমস্ত ভক্ত। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনদাসের অত্যন্ত আর্ত্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যান। বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার দুইক্রোশ ও নবদ্বীপ হইতে ছয় সাত ক্রোশ পশ্চিমে দেন্নুড় বা দেলুড় গ্রাম। ঐ গ্রামে আসিয়া যাত্রিগণ স্নানভোজনাদি সমাপন করেন। আহারান্তে প্রভু নিত্যানন্দ স্বীয় প্রিয়ভৃত্য বৃন্দাবনের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলেন, বৃন্দাবন তাঁহাকে একটী হরীতকী প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "গতকল্যকার সঞ্চিত এই একটীমাত্র হরীতকীই ছিল।" নিত্যানন্দ কহিলেন, "বৃন্দাবন, তুমি এখনও সঞ্চয়ী, অদ্যাপি তোমার সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং অচিরাৎ তোমাকে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হয় ত এই দেন্নুড় গ্রামে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ ও তদীয় লীলাবর্ণন কর।" লোকশিক্ষাই যে

এই ভক্তবর্জ্জনের অভিপ্রায়, তাহা গৌরভক্তগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। অনন্তর নিত্যানন্দ সেই হরীতকীটি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন; এবং তাহা হইতে কালে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষও জন্মিয়াছিল। বাঙ্গালা ১২২৩ সালে কোন এক নরাধম ঐ বৃক্ষটীকে ছেদন করিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি ঐ স্থানকে "হরীতকীতলার ডাঙ্গা" বলে। প্রভুর কঠিন আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনদাস তদীয় চরণে ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। তাহাতে বৃন্দাবন ক্ষুণ্ণ হইলেন না; কেন না গুরুপদে তাঁহার সুদৃঢ় ভক্তি ছিল, তিনি জানিতেন, গুরুদেব তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভুর কার্য্য করাইবার জন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং দেনুড়ে থাকিয়া সেই কার্য্য সম্পাদনই তাঁহার কর্ত্তব্য। নীলাচলে না যাইতে পারিয়াও বৃন্দাবন মর্ম্মাহত হইলেন না, কারণ তিনি জানিতেন, ভক্তের হৃদয়ই নীলাচল, বৃন্দাবন ও মথুরা। তিনি দেনুড় গ্রামে একটী বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে জগন্নাথ, রাধাগোবিন্দ, ও দ্বাদশ গোপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং বিগ্রহসেবা, নামসংকীর্ত্তন, ও ভজনসাধন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় সেই দেনুড় গ্রামেই অতিবাহিত করিলেন। বিশ্রাম-সময়ে মহাপ্রভুর চরিতবর্ণন করিতেন—উহাই চৈতন্যভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, ইনি বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনের পদাবলী নিভাজ খাঁটি জিনিস; উহাতে কোন জাল কবির পদ মিশে নাই। তিনি চৈতন্যভাগবতেও কোন কোন পদে অবৈষ্ণব পাষণ্ডগণের প্রতি তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সমালোচকদের মতে ইহা তাঁহার গুরুতর দোষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবন যে সময়ের লোক, তৎকালপ্রচলিত রীতি বিবেচনা করিলে এবং বৈষ্ণবসমাজের প্রতি, ও কবির মাতার প্রতি বিদ্বেষিগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা মনে করিলে, বৃন্দাবনের ক্রোধ যে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, ইহা আমরা মনে করি না। বৃন্দাবনের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম,—তত্ত্ববিলাস, দধিখণ্ড, বৈষ্ণববন্দনা ও ভক্তিচিন্তামণি।

বিদ্যাপতি

১২৯৬ শকে (১৩৭৪খৃঃ অঃ) মিথিলার অন্তর্গত বিসকী (বিসখী বা বিসপী) গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম। মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে সভাসদরূপে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাকে বিসকী গ্রামখানি দান করেন। এইগ্রাম সীতামারী মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা-নদী-তীরে অবস্থিত। বিদ্যাপতির বর্ত্তমান বংশধরেরা সৌরাট নামক অপর একটী গ্রামে সম্প্রতি বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতি দ্বিজকুল-সম্ভূত; ইঁহার গাঞী ছিল বিষয়ী বারবিস্কী"। বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-গ্রন্থ" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তিনি বলেন "বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন।

মহারাজ গণেশ্বরের পরমসুহৃৎ গণপতি ঠাকুর তৎপ্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীর" ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণপতি ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতা *। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এজন্য তিনি "যোগীশ্বর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর-প্রণীত প্রসিদ্ধগ্রন্থ 'বীরেশ্বর-পদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের "দশকর্ম্ম" করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্ত্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল 'মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহিক'।" বিদ্যাপতির "কবিরঞ্জন" ও "কবিকণ্ঠহার" দুইটী উপাধি ছিল বলিয়া অনুমান হয়। পদাবলী-সাহিত্যই ইঁহার

---

* "জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, মৈথিলী দেশে কর বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপা, কৃপা করি লেউ নিজপাশ।
বিসকী গ্রাম, দান করল মুঝে, রহতহি রাজসন্নিধান।
লছিমাচরণ-ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে, বিদ্যাপতি ইহ ভণ" পদসমুদ্র।

প্রমাণস্থল †। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির প্রভু " রূপনারায়ণ-পদাঙ্কিত-মহারাজ শিবসিংহ"—যাঁহাকে কবি "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিয়াছেন—এই উপাধিভূষণে রাজকবিকে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের আদেশে "পুরুষপরীক্ষা"; রাজ্ঞী বিশ্বাস-দেবীর আদেশে "শৈবসর্ব্বস্বহার ও "গঙ্গাবাক্যাবলী"; মহারাজ কীর্ত্তি-সিংহের আদেশে "কীর্ত্তিলতা"; এবং যুবরাজ রামভবের আদেশে "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় রচনা করেন। ইহাও জানা গিয়াছে,—তিনি "দানবাক্যাবলী" ও বিভাগসার" নামে সংস্কৃতে দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট বিদ্যাপতি পদাবলীর জন্যই বিশেষ বিখ্যাত। এই সকল পদাবলী মৈথিলী ভাষায়* রচিত হইলেও, বাঙ্গালী উহাদিগকে "জবরদখল" করিয়া বাঙ্গালা পদা-বলী বলিয়া রটাইয়া দিয়াছেন। কায়েমী স্বত্বানুসারে দেওয়ানি আদালতে ঐ পদাবলীগুলি মৈথিলী হইলেও দখলিস্বত্বানুসারে ফৌজদারী-বিচারে উহা বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা-পদই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মন্তব্যটী এত সুন্দর যে, আমরা উহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তিনি বলেন, "বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিস্কীতেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহু দিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া, মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন; আমরা আসলের পার্শ্বে একটী নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটী আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি

---

† "চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলন" ইত্যাদি। পুনশ্চ "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনত রূপনারায়ণ" ইত্যাদি। উভয় কবির মিলন কবিতা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

* "ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটিহুঁ নঘটয় দিবস অভিসার।" গ্রীয়ারসন সাহেবের মৈথিলী গান।

না। এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।”

দীনেশ বাবু বিদ্যাপতির কবিত্ব সম্বন্ধে কহিয়াছেন “বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরদত্ত। তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন; সৌন্দর্য্য-উপভোগের জন্য স্বভাবদত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন—একটী সুন্দর চিত্র দেখিলে, পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্টভাবে মনে উদয় হইত—তাই তাঁহার উপমাগুলি এত সুন্দর” স্থলান্তরে বলেন “উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয়, বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না।” পরিশেষে দীনেশ বাবু বিদ্যাপতির কবিজনোচিত নানা গুণের উল্লেখ সংক্ষেপে করিয়া চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে চণ্ডীদাসকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন “ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ-বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস-রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেক-গুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা-দৃষ্টে প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ, খাঁটি প্রেমিক, আড়ম্বরহীন একটী কবির প্রসঙ্গ ইতি পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বঙ্গদেশের গীতি-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব; তাঁহার কতিপয় অশ্রুসিক্তপদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই; তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষমিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে—কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস প্রভু * * এক প্রেমের অবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে।” আমরা আমাদের প্রকাশিত “মহাজন-পদাবলী”র ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার যে তুলনার সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ও রামলক্ষ্মণের মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি অধিক সুন্দর' ইহা নির্ণয় করা সমান কষ্টকর। রামে যে সকল সৌন্দর্য্য আছে, লক্ষ্মণে তাহা নাই। আবার লক্ষ্মণের অনেকগুলি সৌন্দর্য্য রাম-মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয় না। অথচ উভয় মূর্ত্তিই সুন্দরের একশেষ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পক্ষেও তাহাই দেখা যায়। উভয়েই কৃষ্ণলীলা বর্ণন ও এক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা ভূমিকায় কাব্যের যে সকল লক্ষণ দিয়াছি, তন্মধ্যে বিদ্যাপতি সেক্সপিয়রের লক্ষণানুযায়ী কবি* ও চণ্ডীদাস মিল্টনের লক্ষণানুমোদিত কবি†। বিচিত্রভাব, অলঙ্কার, শব্দচাতুর্য্য, প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতিতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। ইঁহার কল্পনা মধ্যে মধ্যে এমন গরিয়সী যে, বোধ হয় তিনি যেন প্রকৃতির সমগ্র স্থল দর্শন করিয়াছেন। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, নিরবচ্ছিন্ন অবিচলচিত্ত ও গম্ভীর। শব্দবিন্যাস প্রায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ও মধুময়। কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিলে বোধ হয়, তিনি পড়িয়া শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এবং কোন কোন স্থলে ভাবপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া একটী অলঙ্কার ব্যবহার করিতে অধিকতর প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং অনেক কষ্টে তত্তৎস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়।

"চণ্ডীদাসের কবিতা-দেবী নানা ভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব, ও ভঙ্গী তত নাই, রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিতা। সেই শোভা কেবল নয়ন মোহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং তথায় থাকিয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দ-রসে প্লাবিত করে। তদীয় চরণ-বিক্ষেপ নর্ত্তকীর চরণ-চালনার ন্যায় তাল-বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু চঞ্চলা বালিকার ন্যায় দ্রুত, লঘু, অনায়াসসাধ্য ও স্বাভাবিক। তদীয় বাক্য সুশিক্ষিতা মহিলার বাক্যের ন্যায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু বালিকার আধ-আধ ভাষার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও মধুময়। তদীয় কণ্ঠস্বর শিক্ষা-সিদ্ধ নহে, কিন্তু বনচারী পীবরকণ্ঠ কোকিলার ন্যায় স্বাভাবিক ও শ্রুতি-সুখাবহ। চণ্ডীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি

* "কাব্য প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ।" (সেক্সপিয়র)

† "যে সকল ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র শ্রুতি-মধুর শব্দাবলী স্বতঃই মুখ হইতে বহির্গত হয়, তাহার নাম কাব্য।" (মিল্টন)

যখন যে বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে, চণ্ডী-দাসকে বর্ণিত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করা দুষ্কর। তাঁহার রসানুভাবকতা এত বলবতী যে, ঠিক যেন তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন। এই গুণ থাকাতেই তিনি পাঠককে উন্মত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তি হইতে অভিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল, চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত অমূল্যরত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ি-সরোজিনী-সদৃশা।”

আমরা অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে দেখিতে পাই, অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অদ্বৈতের জন্ম ১৩৫৫ শকে, সুতরাং এই মিলন সম্ভবতঃ ১৩৮০ শকে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বোধ হয়, ইহার অব্যহিত পরেই বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ঈশান নাগরের মতে বিদ্যাপতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এবং রাগরাগিণী প্রভৃতি সঙ্গীতবিদ্যা-নিপুণ সুকণ্ঠ-গায়ক কবি ছিলেন।

বৈষ্ণবদাস।

বৈষ্ণবদাসের প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেঁয়া(ঞা) বৈদ্যপুর। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটী পণ্ডিতের স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে অর্থাৎ ১৬৪০ শকে এক বিচার হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার স্বজাতি-বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সাহসসহকারে বলা যাইতে পারে, ইঁহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর উপসংহারে বলিয়াছেন :—

“আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥

* * *

গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার।
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥”

পদকল্পতরু কোন্ শাকে সংগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন “এই লেখা অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, রাধামোহন ঠাকুর জীবিত থাকিতেই পদকল্পতরু সংগ্রহ হইয়াছে।”* কিন্তু বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় ইহা কি প্রকারে জানিলেন, আমাদের তাহা বোধগম্য হয় না। বৈষ্ণবদাস রাধামোহনের শিষ্য; তাঁহার সমস্ত পদ লইয়া, তাহার সহিত অন্যান্য ও নিজের রচিত পদ যোগ করিয়া, পদকল্পতরু সংগ্রহ করিলেন। সুতরাং প্রকারান্তরে গুরুর পদামৃত-সমুদ্রের লোপ হইল। সুতরাং বৈষ্ণবদাসের এই “গুরু-মারা বিদ্যা” গুরুর জীবিত কালে না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। উক্ত সম্পাদক প্রাগুক্ত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একবার বলিয়াছেন “পদকল্পতরু” সংগ্রহের কালনির্ণয় করাও নিতান্ত সহজ নহে, যেহেতু এই গ্রন্থে সংগ্রহের কোন সন তারিখ দেওয়া নাই। তবে একটী প্রমাণ এই যে, শ্রীরাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত পদামৃত, সমুদ্রগ্রন্থ-সংগ্রহের অব্যবহিত পরেই পদকল্পতরু সংগৃহীত হইয়াছিল।” সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা বলিতে বাধ্য যে, পদকল্পতরু পদামৃত-সমুদ্রের পরে সংগৃহীত বটে, কিন্তু “অব্যবহিত” পরে, না “সুব্যবহিত” পরে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। গ্রন্থানুবাদ-সমেত বৈষ্ণব দাসের রচিত পদের সংখ্যা মোট ২৬টী। ইহাঁর রচিত কোন কোন পদ এতই সুন্দর যে, উহা পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যেন ঠাকুর নরোত্তম দাসের রচনা পাঠ করিতেছি। ইহাঁর কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়। এবং

* ৮ম বর্ষ ১১ সংখ্যা ৪৯০-৯১ পৃষ্ঠা।

ইহার কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায়, বৈষ্ণবসাহিত্য ও ইতিহাসে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণবদাস একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াও ছিলেন। ইনি যে সুরে গান করিতেন, তাহাকে অদ্যাপি "টেঞার ছপ" কহে। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "বৈষ্ণবদাস যে তাঁহার প্রকৃত নাম নহে, পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ১৪১০ সংখ্যক পদে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; ঐ পদের ভণিতায় "দীনহীন বৈষ্ণবের দাস" এইরূপ লিখিত থাকায়; দীনতা-পরিজ্ঞাপনার্থ ঐরূপ নাম-ধারণের বিষয়ই বোধ হয়।" বৈষ্ণবদাসের ভিটায় এখন আর বাতি জ্বলে না। বৈষ্ণবদাসের একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণবদাসের বন্ধু উদ্ধবদাসের নিজের সন্তান জন্মে নাই। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল মজুমদারের সাত পুত্র, তন্মধ্যে রাম কেশব মজুমদারের নিতাইচাঁদ নামে এক পুত্র জন্মে, নিতাইচাঁদের পত্নী বিগত বাঙ্গালা ১৩০৪ সালেও জীবিত ছিলেন। রামকেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মজুমদারের দৌহিত্রবংশীয়গণ এক্ষণে কৃষ্ণকান্তের বাস্ত ভিটায় বাস করিতেছেন। "রূপমঞ্জরী" নামে ইহাঁর একখানি গ্রন্থ আছে।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

অনুমান ১৬৩৪ শকাব্দায় হুগলী জেলায় ভূরসুট পরগণার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরসুটের জমিদার ও রাজ-উপাধিধারী ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতির কোপে পড়িয়া নরেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বস্বান্ত হয়। ভারত নাওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পাঠ করেন। অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদা গ্রামে কেশবকুলি-আচার্য্যদিগের বাড়ীর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত কয়েক বৎসর তাঁহার ভয়ানক বিসম্বাদ চলিয়াছিল, পরিশেষে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন। ভারতচন্দ্র হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে থাকিয়া কিছু

দিন পারস্য-ভাষা শিক্ষা করেন। এই মুন্সী-বাড়ীর এক সত্যপীরের সিন্নি উপলক্ষে পুস্তক না পাওয়াতে দণ্ডেকের মধ্যে ভারতচন্দ্র এক পুস্তক রচনা করিয়া পাঠ করেন। ইহাই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রথম বিকাশ। কবি তৎপর ফরাশডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে বাস করেন। ইহাঁরই অনুরোধে ভারত কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি-রূপে মাসিক ৪০, টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরে কবির সাহায্য জন্য আনরপুরের গুস্তে গ্রামে ১০৫/ বিঘা মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে অনুমান ১৬৮২ শকে রায় গুণাকর বহুমূত্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থের নাম "অন্নদামঙ্গল" তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ বিদ্যাসুন্দর ও চোর-পঞ্চাশৎ রচনা করেন। এদ্ব্যতীত, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক, সত্যনারায়ণ পূজার পুঁথি ইত্যাদি তাঁহার কতিপয় ক্ষুদ্র কাব্য। ভারতচন্দ্র বাহিরে শাক্ত হইলেও ভিতরে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বোধ করিবার কারণ তদ্রচিত গ্রন্থেই আছে।

মনোহর দাস।

(১) চৈতন্য-চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখাগণনায় এক মনোহর দাসের উল্লেখ আছে, যথাঃ—

"শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।"

ইনি নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত, সন্দেহ নাই। ইনি খেতুরীর মহোৎসবেও গিয়াছিলেন; তদুপলক্ষে নরোত্তম-বিলাসেও ইঁহার এইরূপ উল্লেখ আছে; যথাঃ—

"শ্রীলরঘুপতি উপাধ্যায়, মহীধর।
"মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর॥"

অনেকে অনুমান করেন, "মনোহর" জ্ঞানদাসেরই নামান্তর। তাহা যাহা হউক, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় যে, এই মনোহরদাস ও বাঁবা আউল মনোহর দাসকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-

ছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইতে ইচ্ছা করি না। তাই বলিয়া, আমরা দুইজনের কথা স্বতন্ত্র লিখিলাম।

(২) বাবা আউল মনোহর দাসও নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। নিত্যানন্দ-ভক্তমাত্রেই বাউল (বাতুল প্রেমের পাগল) বা আউল। ইঁহার নামান্তর চৈতন্যদাস। সারাবলী গ্রন্থে ইঁহার এইরূপ উল্লেখ আছে;—

"আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ ও বিদেশ॥"

ইনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে নানাস্থানে বাস-ভবন স্থাপন করিতেন; ইঁহার নিদর্শন অনেক স্থানেই "বাবা আউল মনোহরের পাঠ" দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং "ইনি স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন" সারাবলীর এ কথা খুব সত্য। ইনি জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এবং বিষ্ণুপুরে রাজ বাটীর নিকট ইঁহার বাসগৃহ ছিল। প্রেমবিলাসে যথাঃ—

"মোর ঠকুরাণী শিষ্য চৈতন্যদাস।
আউলিয়া বলি তাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥" গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-দাসবাক্য।

"বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥"
চৈতন্যমনোহর-দাসবাক্য।

ইনি প্রথমে বনবিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজা বীরহাম্বারের ভক্তিগ্রন্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন, এবং উক্ত রাজার দ্বারপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য ইঁহার বন্ধু ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন্ সময়ে ইঁহার জন্ম, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। কিন্তু ইনি যে ১৫০০ শকাব্দার পূর্ব্বেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। বীরহাম্বীরের মৃত্যুর পর আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হয়েন। পরিশেষে হুগলী বদনগঞ্জে আসিয়া একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহুদিন বাস করেন। ঐ অঞ্চলে যত বৈষ্ণব-পরিবার আছেন, তাঁহার অধিকাংশই ইঁহার শিষ্য। ইনি নির্লোভ ও ইচ্ছাময় পুরুষ ছিলেন। ইঁহার কোন ধনসম্পত্তি ছিল না, এবং কাহার নিকট কিছুই চাহিতে না। অথচ ইঁহার আখেড়ায় সদাব্রত ছিল। বদনগঞ্জ-নিবাসী ৺ হারাধন দত্ত

ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন যে, ইনি তদীয় "অতিবৃদ্ধপিতামহ শ্রীকৃপারাম সিংহ মহাশয়কে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানি অর্পণ করেন।" ১৬৫৯ শকের ২৯ শে পৌষ বদনগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনধামে গমন করেন। পথিমধ্যে জয়পুর ইহাঁর অপ্রকট হয়। তথায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। বাকুঁরাজেলাস্থ সোণামুখী গ্রামে "বাবাআউল মনোহর দাসের পাট" বলিয়া একটী আখেড়া আছে। অনেকে অনুমান করেন, ইটীও মনোহর দাসের সাময়িক বাসস্থান ছিল। ঐস্থানে চৈত্রমাসে রামনবমী তিথিতে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। ইনি "পদসমুদ্র *" ও "নির্য্যাসতত্ত্বের" সংগ্রহকার। কেহ কেহ বলেন, পদসমুদ্রে মনোহর দাস ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহা ইহাঁরই রচিত। ইহাঁর রচিত দিনমণি-চন্দ্রোদয়" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

মাধব দাস।

আমরা ৬ জন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে ৩ জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া, অপর তিনজনের যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ এই প্রস্তাবে লিখিব।

(১) গঙ্গাপতি মাধবাচার্য্য, ইহাঁর স্বরূপ শান্তনু। ইনি নিত্যানন্দ-শাখা। ভক্তিরত্নাকরে ইহাঁর বিস্তারিত বিবরণ আছে। বৈষ্ণববন্দনায় যথা—

---

* বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু একটী টীকায় বলেন "পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল, কলিকাতার কোন দোকানদার ২০০০৲ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই। * * * এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে. আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন। আর কে জানি না, কিন্তু এই সন্দেহকারীদিগের মধ্যে আমি একজন, আর দীনেশ বাবু স্বয়ং একজন।" সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণও আছে। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গৌর-ধাম গোলোকে; তথা হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসভ্যের কাজ. অতএব আমরাও নীরব রহিলাম।

"প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গা দেবীর বল্লভ॥"

(২) গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র। ইহাঁর স্বরূপ বৃষভানু।

(৩) জগন্নাথের ভ্রাতা মাধব। ইহঁাদিগের স্বরূপ বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয়। ইহঁারা জগাই মাধাই নামে প্রসিদ্ধ।

(৪) বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর মাধবানন্দ ঘোষ। বাসু ও মাধব, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়ের গণে পরিগণিত। ইহাঁরা তিন ভ্রাতাই কবি ও গাথক ছিলেন। কিন্তু গাথকরূপে মাধব ঘোষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবতে যথা :—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥
যাঁহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতে যথা :—

"শ্রীমাধব ঘোষ মহাকীর্ত্তনিয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥"

বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—

"বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভঙ্গ স্বরদান॥"

বৈষ্ণবাচারাদর্পণ মতে ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর দাঁইহাটে যাইয়া বাস করেন। যথা :—

"গৌরাঙ্গের শাখা যাঁর দাঁইহাট ধাম।"

"পাঠমালা" গ্রন্থ মতেও দাঁইহাটই মাধব ঘোষের পাঠ; কিন্তু সম্প্রতি ঐ গ্রামে তাঁহার কোন চিহ্নও নাই, বা কেহ কিছু তৎসম্বন্ধে বলিতেও পারে না। উহা এখন মুকুন্দদত্তের "পাঠ" বলিয়া খ্যাত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন, তখন বাসুদেব ও মাধব ঘোষ তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন।

(৫) পরাশরাত্মজ মাধব। "মহাপ্রসাদ-বৈভব" নামে একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে ময়মনসিংহের যশোদল-নিবাসী পণ্ডিত রামানন্দদাস বৈরাগী এই দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া মাধবের পরিচয় দিয়াছেন। যথা :—

"পিতা তেঁহো ভাগবত মিশ্র পরাশর।
জয়রামচন্দ্র-পুত্র প্রেমভক্তিপূর॥"

অর্থাৎ মাধব মিশ্রের পিতার নাম পরাশর মিশ্র এবং পুত্রের নাম জয়রামমিশ্র। ইনি স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন-অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রামস্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞ জপতপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম-দেবগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য"

* * *

ইন্দুবিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত।"

এই চণ্ডী উপরের নির্দ্দেশানুসারে ১৫০১ শকে রচিত। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এই মাধব মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিসময়ের লোক। এবং ইঁহার বাসস্থল সপ্তগ্রামে ছিল। মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ। মাধব-পুত্র জয়রামমিশ্রকে কেহ কেহ জয়রাম গোস্বামী বলিত। "মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ-জেলার দক্ষিণে মেঘনানদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাসস্থাপন করেন। এইস্থান এখন গোসাইপুর বলিয়া পরিচিত। * এই মাধবাচার্য্যের রচিত একখানি কৃষ্ণমঙ্গল আছে। ইনি যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব

---

* বঙ্গভাষায় তিনখানি "কৃষ্ণমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) পরাশর-সুত মাধব-প্রণীত (২) কালিদাসতনয় মাধব-প্রণীত (৩) দ্বিজ সন্তোষ-রচিত কৃষ্ণমঙ্গল।

† দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

ছিলেন না, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, ইনি ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি। ঐ উপাখ্যানের দ্বিতীয় কবি রায়মঙ্গল-প্রণেতা নিম্‌তাগ্রামবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবি কৃষ্ণরাম দাস * এই কবি মাধবাচার্য্যের রচনার অপকর্ষতা সম্বন্ধে স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচর্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহা নাহি কার্য্য॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হৈল ভাষা॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, ইনি "বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেও সম্ভবতঃ শেষকালে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবেন। এইজন্যই কথিত আছে যে, ইনি নিত্যানন্দ-ভক্তদের ন্যায় মাথায় চূড়াধারণ করিতেন বলিয়া 'চূড়াধারী' বলিয়া কীর্ত্তিত। রামানন্দ দাস মহাশয় বিবিধ প্রমাণ সহ কহিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য নবদ্বীপ-বাসকালে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নীলাচল-অবস্থিতির সময় "প্রেমরত্নাকর" ও মালদহ-জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর বা রোকণপুর-বাসকালে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(৬) আমাদিগের শেষ মাধব মিশ্র, পণ্ডিত, বা আচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রেমবিলাস গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়ানগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতিগুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন-পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হৈল অতিগুণধাম। শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥
কালিদাস মিশ্রপত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি। অল্পবয়সের কালে হইলেন রাঁড়ী॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। নানাবিধ শাস্ত্র তিহোঁ পড়িতে লাগিল॥
নানাশাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত। আচার্য্য উপাধিতে তিহোঁ হইলা বিদিত॥

* *

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। গীত বর্ণনাতে তিহোঁ করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপদে সমর্পণ কৈল॥

* ইঁহার জন্ম ১৬৬৩ খৃঃ অঃ। ইঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ইনি একখানি বিদ্যাসুন্দরও লিখিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে কৈল অনুগ্রহ। সর্ব্বভক্তগণ তাঁরে করিলেক স্নেহ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, মহাপ্রভু আজ্ঞামতে। মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে।"

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃত স্থান হইতে আমরা মাধবাচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় পাইতেছি, তাহা এই :—

দুর্গাদাস মিশ্র নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ এক ব্যক্তি নবদ্বীপে বাস করিতেন; তাঁহার ঔরসে ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী বিজয়া দেবীর গর্ভে সনাতন ও কালিদাস মিশ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। সতাতন মহামায়াকে এবং কালিদাস বিধুমুখীকে বিবাহ করেন। সনাতনের এক পুত্র যাদব মিশ্র, ও এক কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া; ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় ভার্য্যা। কালিদাসের মাধবমিশ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ইহাঁর জন্মের অব্যবহিত পরেই কালিদাসের মৃত্যু হয়। যখন মাধবের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার যজ্ঞোপবীত হয়। অল্পকাল মধ্যে মাধব মিশ্র নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ সুন্দর সরল পদ্যে অনুবাদ করেন। এই অনুমাদের নাম "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"; মাধবাচার্য্য এই গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গ করিয়া দেন। মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণ মাধবাচার্য্যকে বড়ই ভালবাসিতেন। মহাপ্রভুর অনুমতি ক্রমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ইহাঁকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন। কথিত আছে, ইনি পঞ্চম বৎসরে বিদ্যারম্ভ করেন, এবং মেধা ও প্রতিভা-বলে নয় দশ বৎসর বয়ঃক্রমেই পণ্ডিত হয়েন। মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চার-বলেই এত অল্প বয়সে মাধব পণ্ডিত ও কবি হন। এবং এই শক্তি লাভ করিয়াই বালক সাধনারাজ্যে এত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। ইনি কেবল যে মহাপ্রভুর শ্যালক ও কৃপাপাত্র তাহা নহে, ইনি কিছুদিন নিমাঞী পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বিবাহসময়ে প্রিয়াজীর বয়স ১১।১২ বৎসর ছিল, মাধবাচার্য্যের বয়স নয় বৎররের অধিক ছিল না। এই বিবাহের কিছুদিন পরই "মহাপ্রকাশ" হয়, সেই মহাপ্রকাশ কালে মাধবাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং এই সময়েই মহাপ্রভু মাধবাচার্য্যকে কৃপা করেন।

• তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীমৎ যাদবাচার্য্যবংশীয় নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবত-রত্ন-প্রণীত "চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থ হইতে মাধবের নিম্নলিখিত

পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছেন, "যাঁহারা মাধবাচার্য্যকে সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহারা যাদবাচার্য্যবংশীয় গ্রন্থকারের প্রমাণ দেখুন।" উদ্ধৃতাংশ এই :—

"শ্রীসনাতনমিশ্রস্য বংশং বক্ষ্যে বিধানতঃ।
পবিত্রকীর্ত্তনং ধন্যং যৎ শ্রুত্বা নির্ম্মলীভবেৎ॥
পুত্রঃ শ্রীযাদবাচার্য্যঃ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াস্তু চ।
যামুপায়ংস্ত বিধিবৎ শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ॥
তদ্‌ভ্রাতৃতনয়ঃ শ্রীমন্মাধবাচার্য্য ঈরিতঃ।" ইত্যাদি।

বৈষ্ণববন্দনায় দৈবকীনন্দন দাস মাধবার্য্য সম্বন্ধে এই বলেন :—

"মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
যাহার কবিত্ব গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥"

উপরের লিখিত ছয়জন মাধব-মধ্যে মাধব ঘোষ পদকর্ত্তা। কিন্তু পরাশরাত্মজ ও কালিদাস-তনয় মাধবাচার্য্যের মধ্যে পদ-কর্ত্তা কে, ইহা আমরা তত্ত্বনিধি মহাশয়কে এক পত্রে জিজ্ঞাসা করি, তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা কালিদাস-তনয়কেই "দ্বিজ মাধব" ভণিতাযুক্ত পদের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রচনাদৃষ্টে বিচার করিলে, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতই যে সমীচীন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মাধবী দাস।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচলবাস-সময়ে শ্রীশিখী মাহিতী নামে জগন্নাথ-দেবের একজন লিপিকর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম মুরারি মাহিতী ও সহোদরার নাম মাধবী দাসী ছিল। এই মাধবীর চরিত্র অত্যন্ত উন্নত ছিল বলিয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাঁকে "দেবী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেন না কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীরাধিকার দাসী মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ঈদৃশী মহিলা চণ্ডালিনী হইলেও, তিনি কেবল "দেবী" নহেন, "দেবীর দেবী"। চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে লেখা আছে যে, মহাপ্রভু নিজ জনকে যে গূঢ় ব্রজের রস প্রদান করিয়াছেন, সাড়ে তিন জন ব্যক্তিমাত্র তাহা আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথাঃ—

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ।
শিখী মাহিতী, তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধ॥"

চরিতামৃতের আদিলীলায়ও মাধবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। যথাঃ—

"মাধবী দেবী শিখী মাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥"

মাধবী পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। এই জন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহাঁদিগকে "তিন ভ্রাতা" বলা হইয়াছে। এবং তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার প্রতি ভ্রাতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মাধবী স্বয়ংও অধিকাংশ পদের ভণিতায় আপনাকে "মাধবী দাস" কহিয়াছেন। ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি একসময় লিখিয়াছিলেন, "মাধবী কবিতাকামিনী, সুপণ্ডিতা ও পদরচনাকর্ত্রী ছিলেন। প্রভুর পূর্ব্বলীলাসম্বন্ধে তাঁহার যখন যে কিছু স্মরণ ও যখন যে কিছু ভাব মনোমধ্যে উদিত হইত, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে উড়িয়া ও বঙ্গভাষায় পদ রচনা করিতেন।" তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "মাধবীর এই সকল গুণে, বিশেষতঃ তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল বলিয়া, রাজা প্রতাপ রুদ্র ইহাঁকে শ্রীমন্দিরের 'লিখনাধিকারী'র পদে নিযুক্ত করেন।" তত্ত্বনিধি মহাশয় অপর এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "গৌরাঙ্গকে একবার মাত্র দেখিয়াই মাধবী ও মুরারি তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শিখী মাহিতীর তদ্রূপ ভাব হয় নাই।" এই প্রবন্ধে উক্ত মহাত্মা আরও লিখিয়াছেন "মাধবীর পদগুলি নব অবতারের প্রশংসাবাদে পূর্ণ।" সর্ব্বশেষে অন্য একস্থলে অন্য এক প্রবন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "প্রধানতঃ নীলাচলবাসিনী মাধবী মহাপ্রভুর নীলাচললীলা সম্বন্ধেই পদ লিখিয়াছেন; সুতরাং তাহার পদ মূল্যবান্।" ভক্তিনিধি মহাশয় মাধবীর পদ সম্বন্ধে অপর এক প্রবন্ধে লিখেন "পদ-সমুদ্রে মাধবীকৃত" অনেক উড়িয়া পদ আছে। এবং উড়িয়া ভাষার পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গালা পদ অপেক্ষা কর্কশ, উড়িয়াদিগের নিকট তাহা আদরণীয়।" পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখায় মাধবী দাসের রচিত ব্রজলীলার সুন্দর দুইটী পদ আছে।

ভগবানাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণোপলক্ষে, উক্ত আচার্য্য যখন ছোট-হরিদাসকে মাধবীদাসীর গৃহে শালি তণ্ডুল আনিতে প্রেরণ করেন, তখন তিনি হরিদাসের নিকট মাধবীর চরিত্র এই কথায় বর্ণন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—

"শিখী মাহিতীর ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী॥

সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিতেন না, তাই মাধবী তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারিতেন না; অন্তরালে অলক্ষিত-ভাবে থাকিয়া গৌরলীলা দর্শন করিতেন, এবং যখন যাহা দেখিতেন, তাহা পদে বর্ণন করিতেন। কর্ম্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করাতে প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন-সুধাকর দর্শন করিতে অসমর্থা বলিয়া, একটী পদে মাধবী খেদ করিয়া বলিয়াছেন :—

"যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

মাধবীর এ আক্ষেপ কোন কাজেরই নহে। যাঁহাকে মহাপ্রভু শ্রীমুখে ব্রজের মধুর রসের আস্বাদনকারিণী বলিয়াছেন, যিনি এক জন্মে প্রভুর দুই লীলা চর্ম্মচক্ষেও মানসচক্ষে দর্শন করিয়া নিয়ত পদে বর্ণন করিয়াছেন; তিনি যদি "গোরামুখ দর্শনে বঞ্চিত" তবে সে সৌভাগ্য আর কাহার আছে?

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত সিলিমাবাদ পরগণার অধীন দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের বাসস্থান ছিল। এই দামুন্যাগ্রাম রত্নামুনদীর তীরবর্ত্তী। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কবি সাতপুরুষের বাস গ্রাম দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৪৯৯ শকে দামুন্যা হইতে প্রস্থানের সময় চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তক রচনা করিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহার এগার কি বার বৎসর পরে আরড়াতে চণ্ডীবাক্য সমাপ্ত হয়। কবিকঙ্কণের পিতামহ জগন্নাথমিশ্র, পিতা হৃদয়

মিশ্র, উপাধি "গুণরাজ"। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম রামানন্দ। অযোধ্যারামকেই অনেকে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রতা বলেন। চণ্ডীকাব্য আরম্ভের সময় কবির বয়ঃক্রম অন্যূন ৪০ বৎসর ছিল। ইহার পুত্র ও কন্যা অনেকগুলি হইয়াছিল। দীনেশ বাবু ও নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে দ্বিজ নিধিরাম মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কবির মাতার নাম দৈবকী; পুত্রের নাম শিবরাম ও পঞ্চানন; পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ; কন্যার নাম যশোদা ও জামাতার নাম মহেশ ছিল। এখনও মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্দ্ধমানের রায়না থানার অধীন ছোট বৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন! মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবির অধস্তন পুরুষেরা এখন দামুন্যা, বীরসিংহ ও হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে অবস্থিতি করেন। ইহার অধস্তন ৬ষ্ঠ ৭ম, ৯ম, ও ১০ম, পুরুষ অদ্যাপি জীবিত। কবির জন্ম অনুমান ১৪৫৯ শকে। ইঁহার উপাধি ছিল "কবিকঙ্কণ"। চণ্ডী ব্যতীত উহার পূর্ব্ব-সময়ে রচিত মুকুন্দরামের "শিবকীর্ত্তন" নামে আর একখানি গ্রন্থ ছিল। ইঁহার রচিত শ্রীগৌরাঙ্গবন্দনাটী পাঠ করিলে জানা যায়, মহাপ্রভুর প্রতি ইঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল।

মুরারি গুপ্ত।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছেঃ—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি যাঁর নাম।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুরারি গুপ্তের জন্ম শ্রীহট্টে। নবদ্বীপেও মুরারির গৃহ মহাপ্রভুর গৃহের পার্শ্বে ছিল, সুতরাং উভয়ে প্রতিবাসী, এবং উভয়ে সতীর্থও ছিলেন। মুরারি শ্রীগৌরাঙ্গের সমবয়স্ক ও বাল্যসুহৃৎ। উভয়ে গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন, উভয়ে বিদ্যাবিষয়ে বিচার করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় গুপ্তের সহিত রসকোন্দল করিতেন। ফলতঃ মুরারি ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। অমিয়-

নিমাঞীচরিত-লেখক বলেন, "মুরারি গুপ্ত পরমপণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু নিরীহ ও স্নিগ্ধ" ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃতি এতই নম্র ও নিরীহ ছিল যে, ইহাঁর প্রতি কাহারও রাগ-দ্বেষ ছিল না। চৈতন্য-চরিতামৃতের এই কয়েক পংক্তিতেও মুরারি গুপ্তের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে:—

"শ্রীমুরারি গুপ্তিশাখ প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রব শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তাঁর ক্ষয়॥"

মুরারি সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার নানালীলার সাহায্য করিতেন। ইনি গরুড় ও হনূমানের অবতার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত। ইহাঁর শরীরে অমিত পরাক্রম ছিল। বৈষ্ণববন্দনায় যথাঃ—

বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনূমন্ত॥"

একদা মহাপ্রভুতে বিষ্ণুর আবেশ সময়ে, মুরারিকে গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিলেন; মুরারি অগ্রসর হইয়া, প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া প্রহরেক পর্য্যন্ত শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিলেন। মুরারি-কৃত রামচন্দ্রের "স্তবাষ্টক" শ্রবণে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া, স্বহস্তে তাঁহার ললাটদেশে "রামদাস" এই কথাটী লিখিয়া দেন। মুরারি মহাপ্রভুর বরাহ ও শ্রীরাম-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মুরারি ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীগৌরাঙ্গকে নিবেদন না করিয়া দিয়া কিছুই আহার করিত না। একদা বহু পিষ্টক ও পায়সান্ন ভক্তদম্পতী শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেন। পরদিন প্রভু মুরারিগৃহে পদার্পণ করিয়া কহিলেন "বৈদ্যরাজ; অজীর্ণের ঔষধ দাও।" গুপ্ত বলিলেন, "প্রভো! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে, তাঁহার আবার কেমন করিয়া অজীর্ণ হইতে পারে? শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তে কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন "কাল রাত্রে স্ত্রীপুরুষে যুক্তি করিয়া আমায় আকণ্ঠ খাওয়ালি, আজ বলিস,—অজীর্ণ কেমন করিয়া হইল?" ইহা বলিয়া মহাপ্রভু সম্মুখ-স্থিত জল পাত্র হইতে প্রভূত জলপান করিয়া কহিলেন "বৈদ্যরাজের জলই অজীর্ণের মহৌষধি"। মহাপ্রভুর এই বাক্যের অতিগূঢ় অর্থ আছে।

অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথারূপ মিষ্টান্ন-ভোজনে যে পাষণ্ডের অজীর্ণ জন্মে, তার পক্ষে ভব-রোগ-নিসূদন ভক্তবৈদ্যের পবিত্র হৃদয়রূপ জলপাত্র নিঃস্যন্দিত ভক্তি-বারিপানই মহৌষধ। এবং জগতকে ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভুর অজীর্ণ ভাণ।

এক দিন মুরারি গুপ্ত মনে মনে ভাবিলেন, প্রভু আমাকে এখন বড়ই স্নেহ করেন; এবং আমি প্রভুর নিত্য সহবাসে থাকিয়া অতুলানন্দও সম্ভোগ করিতেছি। কিন্তু ইনি যে বস্তু, তাহাতে চিরদিন কাহারও ভাগ্যে স্থায়ী থাকেন না। যদি কখনও ইনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি গৌর-শূন্য নদীয়ায় কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব? অতএব আমি ভাবি-বিরহযন্ত্রণা এড়াইবার জন্য আত্মঘাতী হইব। এই সঙ্কল্প করিয়া একখানি শাণিত "কাতি" গৃহের এক গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদর্শী,—তাঁহার কাছে আবার লুকাচুরি কি? মহাপ্রভু মুরারির আলয়ে আসিয়া, নীরবে তদীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং গুপ্ত-স্থান হইতে শাণিত কর্ত্তুরিখানি বহির্গত করিয়া মুরারির স্ত্রীকে কহিলেন "এই দেখ তোমার স্বামার বিগা! ইনি এই দাত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া তোমায় অনাথা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।" গুপ্ত-পত্নী কহিলেন, "প্রভো! আমার স্বামীর আত্মহত্যার ভয় নাই। তিনি অবিনাশী।" মুরারি গুপ্ত তখন মহালজ্জিত হইয়া কহিলেন "প্রিয়তমে! তুমিই ধন্য; তুমি স্বামীকে চিনিয়াছ, কিন্তু আমি মহামূর্খ, স্বামীকে আজিও চিনিতে পারিলাম না।" ইহা কহিতে কহিতে মুরারি ব্যাকুল-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে নয়নজলে মহাপ্রভুর চরণ সিক্ত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কর্ত্তুরিখানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া কহিলেন "মুরারি! আত্মহত্যা মহাপাপ, এমন গর্হিত সঙ্কল্প আর কখনও করিও না। পরন্তু তোমার মত ভক্ত অদর্শনভয়েই বা কাতর হইবে কেন? আমাকে তুমি সর্ব্বদাই অন্তরে বাহিরে দেখিতে পাইবে। মুরারি নয়ন মুদ্রিত করিলেন, উভয় নেত্রে বর্ষার ধারার ন্যায় অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরারি! চক্ষু বুজিয়া কি দেখিতেছ?" মুরারি কহিলেন "প্রভু আর চক্ষু-রুন্মীলন করিব না। বাহিরে একমাত্র তোমার কষিত কাঞ্চন-রূপ দেখিতে পাই; কিন্তু হৃদয়-পটে নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম, নবজলধরবরণ, ও শণকুসুমনিভ রূপ এই ত্রিমূর্ত্তি দেখিতেছি। আহা! প্রথম রূপেরহস্তে শর শরাসন,

তীয়রের করযুগলে মুরলী ও পাঁচনি, আর তৃতীয়ের হস্তে দণ্ড করঙ্গ! প্রাণবল্লভ! তবেই নয়ন মেলিব, যদি বাহিরেও এই অপরূপ রূপ দেখিতে পাই।" শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন "তথাস্তু, নয়ন উন্মীলন কর।" মুরারি সম্মুখে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন। এবং ভূতলে মস্তক লুণ্ঠন করিয়া স্তব পড়িতে লাগিলেন। আবার মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে আপনার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরারি! প্রত্যয় হইয়াছে ত?" মুরারি উত্তর করিলেন "প্রভো! সে তোমারই অপার কৃপা।" প্রভু কহিলেন, "মুরারি! তোমার ভক্তিপাশে আমি তিন যুগ বাঁধা আছি। তোমার বক্ষের অস্থিপঞ্জরে যে রামনাম লেখা আছে, তাহা কি তুমি ভুলিয়াছ? তখন মুরারি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন :—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনঃ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

মুরারি সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে "চৈতন্যচরিত" রচনা করেন। এই সূত্রগ্রন্থ সংস্কৃতে, এবং ইহা বৈষ্ণবসমাজে "মুরারি গুপ্তের করচা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরলীলাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ এই "করচা"। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই স্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী কহেন :—

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥"

আবার কবি লোচন দাস কহেন :—

"মুরারি গুপ্ত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥"
"জন্ম হৈতে বালকচরিত্র যাহা কৈল।"
* * *
"শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥"

মুরারি মহাপ্রভুর অপেক্ষা কথঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। দীনেশ বাবু বলেন "চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গিগণের কেহ কেহ করচা বা নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন। * * * ইহাদের মধ্যে মুরারি গুপ্তের করচাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।"

———

মোহনদাস।

কর্ণানন্দগ্রন্থে যথাঃ—

"শ্রীমোহনদাস নাম, জন্ম বৈশ্যকুলে।
নৈতিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে।"

ইনি শ্রীনিবাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু। কোন কোন পদের ভণিতায় উভয়ের নামই আছে :—

"মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ"।

যদুনাথ দাস।

(১) শ্রীহট্টজিলার অন্তর্গত বুরঙ্গা গ্রামে যদুনাথের পূর্ব্বনিবাস ছিল। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণই যদুনাথের জন্মস্থান। যদুনাথের পিতা রত্নগর্ভ আচার্য্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্র প্রতিবেশী ছিলেন। "রত্ন-গর্ভের ভাগবত পাঠ শ্রবণে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-ভাব উপস্থিত হয়—শিষ্যগণ সহ পথ চলিতে চলিতে তিনি 'বোল' 'বোল' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।" রত্নগর্ভের তিন পুত্র ; কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র। বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যথাঃ—

"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম একস্থান।"
"তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥*
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর।
সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর ॥
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে ॥" ইত্যাদি।

---

* এই বিশুদ্ধ পাঠ হইতে জানা যায় "কৃষ্ণপদ-মকরন্দ" কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথের বিশেষণ। কিন্তু বটতলায় মুদ্রিত চৈতন্য ভাগবতের পাঠ অনুসারে রত্ন-গর্ভের তিন পুত্রের নাম :—কৃষ্ণপদ মকরন্দ, কৃষ্ণানন্দ-জীব এবং যদুনাথ কবিচন্দ্র।

যদুনাথ নিত্যানন্দ-পার্ষদ ছিলেন। যদুনাথের ভ্রাতা জীব ও নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। তিন ভ্রাতার মধ্যে যদুনাথ কনিষ্ঠ। পদাবলী ব্যতীত যদুনাথের কোন কাব্য নাটকাদি গ্রন্থ আছে কি না, আমরা জানি না। তবে বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তদীয় পুস্তকের শেষভাগে যে অপ্রকাশিত পুস্তকের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায়, যদুনাথ দাসের রচিত "তত্ত্বকথা" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু উহা গদ্য কি পদ্য, অথবা উহা "কবিচন্দ্রের" কৃত কি না, কে জানে? যদুনাথ কাহার কর্ত্তৃক কি জন্য "কবিচন্দ্র" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা অজ্ঞাত। ইহাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ না থাকিলেও, ইহাঁর মধুর পদাবলীপাঠে আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, যিনিই উপাধি দিয়া থাকুন, তাঁহার দত্ত উপাধিটী অপাত্রে অর্পিত হয় নাই। কথিত আছে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক ও কুলীনগ্রামবাসী। ইনি স্বচক্ষে মহাপ্রভুর লীলা দর্শন করিয়া পদে বর্ণন করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন; এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, নিত্যানন্দ প্রভুই ইহাঁর "কবিচন্দ্র" উপাধি প্রদান করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে ইহাঁর প্রতি এই বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সদয়॥"

আবার কবিরাজ গোস্বামীও ইহাঁর প্রতি সামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—

"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥"

(২) বাঙ্গালা গোবিন্দ-লীলামৃতের কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়, উহার রচয়িতা যদুনন্দন দাসের নামান্তরও "যদুনাথ দাস" ছিল।

প্রমাণ যথাঃ—

(ক) "নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস॥" ১ম সর্গ।

(খ) "রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দ-চরিত কহে যদুনাথ দাস" ২য় সর্গ।

যদুনন্দন দাস।

আমরা চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসে পাঁচজন যদুনন্দনের অল্পবিস্তর পরিচয় পাইয়াছি।

(১) কণ্টক-নগরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতশাখায় পরিগণিত। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা"

ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত-লেখক।

ভক্তি-রত্নাকরে যথাঃ—

"যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য॥
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণ শুনিয়া যার গীত॥"

ইহাঁর পারিবারিক আখ্যা "চক্রবর্ত্তী" এবং বিদ্বান্ বলিয়া আখ্যা "আচার্য্য"। যদু-নন্দনের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী লক্ষ্মী। তাঁহার গর্ভে যদুনন্দনের শ্রীমতী ও নারায়ণী নামে দুই কন্যা জন্মে। এই দুই কন্যাকেই বীরচন্দ্র বিবাহ করেন। ইনি অতি সুকবি ছিলেন। ইহাঁর রচিত কাব্যের নাম "রাধাকৃষ্ণ-লীলাকদম্ব"। ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয় সহস্র।

(২) ঝামটপুর-বাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইহাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

(৩) কটকনগরে অপর এক যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ গদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য। গদাধর দাসের স্থাপিত গৌরাঙ্গমূর্ত্তির সেবার ভার ইহাঁর উপর ছিল। ইনি ভক্তসমাজে সুপরিচিত ছিলেন।" ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসবে তিনি বিশেষ বিজ্ঞ, গণ্য ও সম্মাননীয় ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইহাঁকে পদরচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই যদুনন্দনের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন। যদুনন্দনের একটী পদে যথাঃ—

"কহে যদুনন্দন দাস।
গৌরদাস তঁহি করু আশোয়াস॥"

(৪) বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু যদুনন্দন। ইহাঁর বিষয়ও আর কিছু জানা যায় নাই।

(৫) মালিহাটীনিবাসী বৈদ্যকুল-সম্ভূত বিখ্যাত পদ-কর্ত্তা ও কবি যদুনন্দন দাস। ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে যদুনন্দন তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্য "কর্ণানন্দ" প্রণয়ন করেন। ইহার দ্বিতীয় নির্য্যাসে কবির আত্মপরিচয় আছে। মুরশিদাবাদ্ জেলায় বার তের ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মালিহাটী গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৫৯ শকে তাঁহার জন্ম হয়। কর্ণানন্দের প্রকাশক ভক্তিভাজন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থকার বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে যদুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ও আমার ইহা ভ্রম বলিয়া মনে হয়। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তদৃষ্টে জানা যাইবে যে, ইহা ভুল বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদুনন্দন জাতিতে অম্বষ্ঠ হইলেও ইনি বৈষ্ণব-সমাজে "যদুনন্দন দাস ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বুধাই-পাড়া গ্রামে শ্রীলশ্রীনিবাসাচার্য্যের দুহিতা এবং মন্ত্র-শিষ্যা হেমলতা ঠাকুরাণী বাস করিতেন। ঐ শ্রীপাটে যদুনন্দনও সচরাচর অবস্থিতি করিতেন। যদুনন্দন এই হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য।

ক্রমে পাঠক এক দুই করিয়া ইহার প্রমাণ গ্রহণ করুন।

১। কর্ণানন্দে কবিবাক্য, যথা :—

"দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥"

তৎপর হেমলতার উদ্দেশ করিয়া :—

"সেবকাভাস, কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল॥"

কবি এখানে নিজের দৈন্য জানাইবার জন্য বলিয়াছেন, "আমি হেমলতা ঠাকুরাণীর সেবকাধম সেবক, কদাপি তাঁহার সেবা করি নাই। তথাপি ঠাকুরাণী আমাকে সেবক (শিষ্য) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

২। বিদগ্ধমাধবের শেষে লিখিয়াছেন :—

"শ্রীল হেমলতা নাম ঠাকুরাণী।
তেঁহ পদধূলি দিলা আমার মস্তকে॥"

অর্থাৎ আমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

৩। কবি কর্ণানন্দের প্রতিনির্য্যাসের অন্তে এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"শ্রীআচার্য্যপ্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা।
প্রেম-কল্প-বল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

৪। একটী প্রাচীন পদে যদুনন্দনের এই পরিচয় আছে। যথা:—

"প্রভু-সুতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর, জয় যদুনন্দন দাস।"

অর্থাৎ আচার্য্যপ্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীপাদপদ্মের মধুকর স্বরূপ যদুনন্দন দাস জয় যুক্ত হউন। ইহাতে কি কবিকে হেমলতার শিষ্য বুঝাইতেছেন?

উপরের চারিটী প্রমাণ পাইয়াও যদি পাঠক এ বিষয়ে সন্দিহান থাকেন, তবে আরও তিনটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি;—

৫। যদুনন্দন স্বরচিত গোবিন্দ-লীলামৃতে কহিয়াছেন :—

"বন্দ গুরু-পদতল, চিন্তামণিময় স্থল,
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
আচার্য্যপ্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা,
তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি॥
অজ্ঞান অন্ধকারে, পতন দেখিয়া মোরে,
জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি।
তাঁহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিতে,
দূরে গেল অন্ধকারাবলী॥"

এই কয়েক চরণ গুরুর ধ্যানের সহিত মিলাইয়া পাঠক বলুন, যদুনন্দন হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কি না? পণ্ডিত ও জ্ঞানী পাঠকমহাশয়েরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যখন হেমলতা ঠাকুরাণী "জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা যদুনন্দনের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষুকে উন্মীলন করিয়াছেন।" বলিয়া কবি নিজেই বলিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কবির "গুরু"।

৬। কর্ণানন্দের শেষ নির্য্যাসে কি আছে, পাঠক দেখুন :—

বুধাই-পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ-প্রভু-পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস।
তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ "কর্ণানন্দ"॥

অনেক ভক্ত-শিষ্য গুরু-পাটে অবস্থিতি করিয়া প্রত্যহ গুরুর শ্রীচরণ-দর্শন, পাদোদকপান ও উচ্ছিষ্টভক্ষণ জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদুনন্দন বুধাইপাড়াতে হেমলতার চরণোপান্তে এইজন্যই থাকিতেন। ঐ গ্রামে থাকিয়াই ১৫২৯ শকাব্দার বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে "কর্ণানন্দ" গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া নিজ দীক্ষা-গুরু ঠাকুরাণীকে উহা শ্রবণ করান। ঠাকুরাণী ঐ গ্রন্থ কর্ণের আনন্দজনক অনুভব করিয়া উহার নাম রাখিলেন "কর্ণানন্দ"। এ পর্য্যন্ত গেল কবির জীবনের ও কর্ণানন্দ-গ্রন্থখানির ইতিহাস। তার পর পাঠক, শেষ দুই চরণের উপরের দুই চরণের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন।

কবি আত্মপরিচয় এই বলিয়া দিতেছেন,—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দাস—যিনি সেই দাসের দাস—যিনি সেই অনুদাসের দাস—আমি যদুনন্দনদাস! সেই চৈতন্যদেবের দাসানুদাস তস্য দাসের দাস। এখন বৈষ্ণবেতিহাসের সহিত মিলাইয়া লওয়া হউক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্য গোপালভট্ট গোস্বামী, গোপালভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনিবাসের শিষ্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, তাঁর শিষ্য যদুনন্দন দাস।

৭। এই শেষ প্রমাণ ষষ্ঠ প্রমাণের টীকা বলিলে হয় এবং ইহা উপস্থিত বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ। কবি-প্রণীত গোবিন্দ-লীলামৃতে; যথা :—

"বন্দ্য শ্রীআচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু,
তাঁর পদে কোটি পরণাম।

বন্দ গোপালভট্ট নাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম
পরাপর-গুরু কৃপাধাম ॥
বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ,
পরমেষ্টি গুরু তেঁহ হয়।"

অর্থাৎ আমার (যদুনন্দনের) প্রভু বা "গুরু" হেমলতা ঠাকুরাণী; শ্রীনিবাসাচার্য্য হেমলতার গুরু, সুতরাং যদুনন্দনের "পরমগুরু"; গোপাল ভট্ট আচার্য্যের গুরু, সুতরাং যদুনন্দনের "পরাপরগুরু" (পরাৎপর গুরু); শ্রীগৌরচন্দ্র গোপাল ভট্টের গুরু, সুতরাং যদুনন্দনের "পরমেষ্টি গুরু"। সুবলচন্দ্র ঠাকুরও যখন হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য; তখন তিনি যদুনাথের "গুরু" নহেন, "গুরুভ্রাতা" অর্থাৎ উভয়ে এক গুরুর শিষ্য।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে উপরে যদুনন্দন দাসের কৃত "কর্ণানন্দ" (মৌলিকগ্রন্থ), "বিদগ্ধমাধব" অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ, "গোবিন্দলীলামৃত" অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে পদ্যানুবাদ, এই তিনখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছি। বিদগ্ধমাধবের বাঙ্গালা অনুবাদ "রসকদম্ব" নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত যদুনন্দন, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সংস্কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" কাব্যেরও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। এই অনুবাদ মূলানুসারে না হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর টীকানুসারে হইয়াছে। ইনি "কুঞ্জরাস্তব" নামে শ্রীরাধিকার স্তোত্রসমন্বিত একখানি ক্ষুদ্র-সুন্দর কাব্যও রচনা করেন। কিন্তু যদুনন্দন তাঁহার পদাবলীর জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রসিকানন্দ দাস।

এই নীলাচলবাসী কবি ১৫১২ শকে কার্ত্তিক মাসের ১০ তারিখে রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ, মাতার নাম ভবানী; ইঁহারা "করণ" কায়স্থ। অচ্যুতানন্দ সুবর্ণরেখা নদীতীরস্থ রয়ণী গ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। কথিত আছে, অতি বিশুদ্ধ নীতিতে ইনি রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন। রসিকের

জন্মের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১৪ শকে অচ্যুতানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মুরারি ভূমিষ্ঠ হয়েন। অতি অল্প বয়সেই সোদরদ্বয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও সচ্চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে যথা :—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।" ৪ বিলাস।

ভক্তিরত্নাকরেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। উভয় ভ্রাতাই প্রভূতক্ষমতাশালীসাধক ও প্রসিদ্ধকবি ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য, এক স্থলে কহিয়াছেন :—

"মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি।"

বাঙ্গালা কবির মধ্যে দুই জনের নাম মুরারি :—মুরারি গুপ্ত ও মুরারি দাস। মুরারিগুপ্ত "করচালেখক" বা "চৈতন্যচরিত" লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেখানিও সংস্কৃত গ্রন্থ। সুতরাং আমাদের যেন মনে হয়, দত্ত-কবি "মুরারি দাসের" প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা মুরারি দাসের কোন কাব্যের নাম জানি না; কিন্তু রসিকানন্দদাস-প্রণীত "রতিবিলাস" ও "শাখাবর্ণন" নামক দুইখানি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই।

পূর্ব্বোক্ত রয়ণী গ্রামের অদূরবর্ত্তী ডোঙ্গল নদীতটে "রামেশ্বর" নামক স্থান। ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের কালে কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ এবং ইহাও প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্রই এই স্থানে "রামেশ্বর" নামে এক শিবস্থাপন করেন। রসিক-মঙ্গল-গ্রন্থানুসারে, পিতামাতার মৃত্যুর পর মুরারির স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে রসিক ও মুরারি ঘণ্টশীলা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই ঘণ্টশীলা গ্রামও সুবর্ণরেখার-তীরবর্ত্তী। প্রবাদ এই যে, বনবাসকালে কিছুদিন পঞ্চপাণ্ডব এই ঘণ্টশীলা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। একটী বধূর ইচ্ছায় দুই ভ্রাতা পৈত্রিকাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘণ্টশীলায় যাইয়া অবস্থিতি করিলেন, এ কথাটা আমাদের সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এরূপ স্থানপরিবর্ত্তনের অন্য কোন কারণ থাকিবারই খুব সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, দুই কবির জীবনের সঙ্গে ভারতের দুই মহাকাব্যের সংযোগ সাধন করিতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। নরোত্তমবিলাসে দেখিতে পাই :—

"উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা-সবার করিলা নিস্তার॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহুশিষ্য কৈলা।
তা-সবার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা॥" ৩য় বি।

রঙ্গীপ্রদেশে এক দুর্দ্দান্ত যবনরাজা ছিল, রসিকানন্দ অলৌকিক-প্রভাবে সেই যবনভূপতিকে তদীয় অসংখ্য মুসলমান প্রজা সহ বৈষ্ণব করেন; এবং অপরদিকে "করণ কায়স্থ" হইয়া সংখ্যাতীত ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়াছিলেন। রসিকমঙ্গলে যথা :—

"শত শত যবনাদি শিষ্য হৈল হেলে।"

তত্ত্বনিধি মহাশয় রসিকানন্দের একটী অলৌকিক কার্য্যের কথা এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—"এই রসিকের মহিমা কি বলিব, ইনি বনের মত্তহস্তীকেও শুদ্ধ হরিনামের প্রভাবে বশ করিয়াছিলেন। মনঃশক্তি ও ভক্তির বল এতদূর যে, যে মত্তমাতঙ্গ জনপদ ধ্বংস করিত, লোকজন তাহাকে দেখিয়াই পলাইত, কিন্তু রসিকানন্দ ভীত না হইয়া যেমন "হরিবোল" বলিয়া হুঙ্কার করিলেন, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হস্তী অমনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।" রসিকের পত্নীর নাম মালতী; রসিকের পত্নী এবং পুত্রগণও শ্যামানন্দের শিষ্য হয়েন।

শ্যামানন্দ শ্রীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে মুরারি সেই বিগ্রহসেবায় নিযুক্ত হয়েন। রসিকানন্দ সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া সমগ্র উৎকল দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী উভয় ভ্রাতাকেই "সুরসিক" ও "কবিবর" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। খেতুরীর মহামেলাতে শ্যামানন্দের সহিত রসিকানন্দ উপস্থিত ছিলেন, এবং রামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে ঐ মহোৎসবে আংশিক অধ্যক্ষতাও করিয়াছিলেন। নরোত্তমবিলাসে যথা :—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি॥
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়।
শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব আলয়॥

তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে।
রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবেশে॥
ওহে বাপু সকল করিবা সমাধান।
কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান॥
শুনিয়া রসিকানন্দ করজোড় করি।
আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি॥
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়।
হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিলে না হয়॥" ৫ম বিলাস।

রামকান্ত দাস।

নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতার নাম রামকান্ত বলিয়া নরোত্তম-বিলাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ইনিই পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় না।

রামানন্দ দাস।

(১) রামানন্দ বসু;—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী ষ্টেসনের নিকট প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রাম। এই গ্রামের বিখ্যাত বসুবংশে ভগীরথ বসুর জন্ম। তাঁহার ঔরসে ও ইন্দুমতী দাসীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসুর জন্ম। ইনি গৌড়-বাদসাহ হুসন্ সাহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। উক্ত সম্রাট্ মালাধরের বিবিধ গুণগ্রাম দর্শনে তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধি প্রদান করেন। গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খান, তাঁহার পুত্র রামানন্দ বসু। সত্যরাজ ও রামানন্দ চৈতন্যের পার্ষদভক্ত। মহা-প্রভু যখন নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, তখন দ্বারকাতে তাঁহার সহিত রামানন্দের পরিচয় হয়। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "কুলীনগ্রামের বসু-বংশ অতিসম্ভ্রান্ত, ধনী ও ভক্ত; মহাপ্রভু ইহাঁদিগকে "পট্টডোরি" যোগাইতে নিযুক্ত করেন; বসুবংশীয়গণ অদ্যাপি ঐ সেবা করিয়া আসি-তেছেন।" চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় রামানন্দ ও তদীয় বংশের কয়েক জন ভক্তের উল্লেখ আছে; যথা :—

"কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবে শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন॥"

বৈষ্ণববন্দনায় বসুবংশের প্রতি সম্মান যথা :—

"বসু বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যার বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥"

(২) রায় রামানন্দ—বৈষ্ণববন্দনায় রায় রামানন্দ সম্বন্ধে এই আছে—

"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিয়াছিলেন :—

"তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রায় রামানন্দ পট্টনায়ক গোপী-নাথ।
কলানিধি সুধানিধি আর বাণী-নাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥" আদি ১০ পরি।

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "রায় রসতত্ত্ব-বেত্তাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ। ইঁহার ন্যায় প্রভুর গণে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। যখন তিনি কৃষ্ণ কথায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিত না।"

উৎকলাধিপতি গজপতিপ্রতাপরুদ্র কায়স্থবংশজ রায় ভবানন্দকে এক সম্মানিত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এই ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র, রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক। পাঁচ ভ্রাতাই রাজসরকারে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন।

সাধারণ লোকে তাঁহাকে "রাজা" বলিত। ভবানন্দ রায় নীলাচলবাসী ছিলেন বলিয়া তিনি ও তাঁহার পঞ্চপুত্র উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন নব্য লেখক রামানন্দ রায়কে বঙ্গবাসী বলিয়াছেন। কিন্তু এটী তাঁহার মস্ত ভুল। কেন না, "রামানন্দের প্রপৌত্র মনোহর 'দিনমণিচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে আপনাদিগকে নীলাচলবাসী বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন এবং বিদ্যানগরে তাঁহাদের যে এক আবাসবাটী ছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। রামানন্দ রায় মহাপণ্ডিত, মহাভাবুক ও অতি উচ্চ-দরের কবি ছিলেন। "সাধ্যের নির্ণয়" নামক যে প্রবন্ধ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রকটিত আছে, সে নির্য্যাসতত্ত্বঘটিত মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও রামানন্দ রায়ের উত্তর পাঠ করিলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কত বড় মহৎকর্ম্ম, ও ইহার সাধনপ্রণালী যে কি উচ্চ, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ প্রবন্ধের শেষে মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, রামানন্দ রায় তাহার কোন উত্তর না দিয়া, স্বরচিত একটী পদ গাইলেন; সে পদের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু হস্ত দ্বারা রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ঐ পদটী ও তাহার ব্যাখ্যা পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ স্বীয় অমিয়নিমাই-চরিতের তৃতীয় খণ্ডে দিয়াছেন। পাঠক যদি রায় রামানন্দের কবিত্ব ও সাধনপ্রণালী যুগপৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন সেই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন গোদাবরী-নদী-তীরস্থ বন-প্রদেশে, তাঁহার রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রথম মিলন হয়। মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরে, মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে সমস্ত বিষয়বিভব পরিত্যাগপূর্ব্বক রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ "জগন্নাথবল্লভনাটকের" রচয়িতা, ঐ গ্রন্থ তিনি প্রতাপরুদ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বদা মর্ম্মিভক্ত সমভিব্যবহারে যে পাঁচখানি গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া মহাসুখ পাইতেন, রামরায়ের নাটক তন্মধ্যে অন্যতম। ইনি রাঘবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ও মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য।

রায় অনন্ত।

রসিকমঙ্গলগ্রন্থের একটী চরণে রায় অনন্তের নাম পাওয়া গিয়াছে; যথা :—

"নীলাম্বর দাস বন্দি শ্রীঅনন্ত রায়।

নীলাম্বর দাস বা অনন্ত রায় শ্যামানন্দপুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। রসিক-শাখাগণনায় ইহার নাম কথিত হইয়াছে। ইনি নীলাচল-বাসী, ভক্ত ও কবি। যদি কেহ আমাদিগের সংগৃহীত পদকয়টীমাত্র পাঠ করেন, তাহাতেই রায় অনন্ত যে উচ্চ দরের কবি, তাহা জানিতে পারিবেন।

রায় শেখর।

পদগ্রন্থে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, দুঃখিশেখর ও নৃপশেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা পাঁচ জনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে "রায়" ও "নৃপ" এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইহাঁর প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। ইনি বর্দ্ধমান জেলার পড়ানগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত, শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী লোক। ইহাঁর রচিত একটীপদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহাঁকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। যথা :—

"শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার।
কহে কবিশেখর গতি নাহি আর॥"

রায়শেখরের অনেক পদ গোবিন্দ দাসের পদের অনুরূপ; সুতরাং রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন, নরোত্তমবিলাসে যথা :—

"জয় ভক্তি-রত্নদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু-পাদ-পদ্মে যেই মত্ত-মধুকর॥"

ইনি কবি রায়শেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রায় শেখরকে তত্ত্বনিধি মহাশয় "অতি বিখ্যাত পদকর্ত্তা" বলিয়া এক পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন। রায়শেখরের প্রণীত "গোপালবিজয়" নামে একখানি ১৭০১ শকে লেখা হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ পুস্তকে ২৫০০ শ্লোক আছে, সুতরাং নেহাত ক্ষুদ্রগ্রন্থ নহে।

রাধাবল্লভ দাস।

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে সুধাকর মণ্ডল নামে পরম বৈষ্ণব একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী শ্যামপ্রিয়া দাসী ও অতি সুচরিত্রা ও কৃষ্ণৈকশরণা ছিলেন। এই ভক্ত-দম্পতী শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও কিঙ্কর-কিঙ্করী ছিলেন। সুধাকরের ঔরসে রাধাবল্লভ মণ্ডলের জন্ম।

সম্ভবতঃ ইহাঁরা জাতিতে তৈলিক ছিলেন। ধার্ম্মিক পিতা মাতা হইতে সাধারণতঃ ধার্ম্মিক সন্তানই জন্মে। রাধাবল্লভ অতি সরল ও উদার-হৃদয় ছিলেন। ইনি দিবারাত্র হরির নাম জপ করিতেন। কর্ণানন্দে ইহাঁর এইরূপ পরিচয় আছে :—

"সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।
তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র।
হরি নাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য॥"

পুনশ্চঃ—

"শ্রীরাধাবল্লভদাস, প্রভুর সেবক।
মহাভাগবত তেহোঁ ভজন অনেক॥
রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তরে যাঁহার॥"

ইনিও আচার্য্যরত্নের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া সংসারতপ্ত-ভক্তের বিলাপসূচক "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী" নামে সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেন। রাধাবল্লভ দাস বাঙ্গালা পদ্যে ঐ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। উহাঁর অপর গ্রন্থের নাম "সনাতন গোস্বামীর সূচক" ও "সহজতত্ত্ব"।

রাজবল্লভ দাস।

রাজবল্লভদাস শচীনন্দন দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং "বংশীবিলাস" গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি এবং ইহাঁর অপর দুইভ্রাতাও কবি। শ্রীবল্লভ "শ্রীবল্লভলীলা," ও কেশব "কেশবসঙ্গীত" রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে চারিপুরুষ কবি ও গ্রন্থকার, ইহা এদেশে বা অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। বংশীবদনদাস, চৈতন্যদাস, শচীনন্দন দাস, ও রাজবল্লভ দাস, সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি।

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী।

মুরলী-বিলাসাদি বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তদীয় জ্যেষ্ঠতনয় চৈতন্যদাসের পত্নী অতি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বংশীবদন স্নুষাকে আশ্বাস দেন যে, জন্মান্তরে তাঁহার উদরে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র গোস্বামী সেই বংশীবদনের দ্বিতীয়প্রকাশ। চৈতন্যদাসের দুই পুত্র, রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী রামচন্দ্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন * এবং পরে তাহাকে মন্ত্র দান করেন। রামচন্দ্র নানা তীর্থ পরিক্রমণের পর নীলাচলে যাইয়া কতিপয় বর্ষ অবস্থিতি করেন। তথা হইতে আবার বিবিধ তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাইয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া, তথা হইতে রাম ও কৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ লইয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের নাম দেশবিদেশে প্রচার হইয়াছিল। ইহাঁর অলৌকিক প্রভাব দর্শন ও শ্রবণে অসংখ্য লোক ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অম্বিকানগরের দুইক্রোশ পশ্চিমে তখন প্রকাণ্ড এক বনভূমি ছিল। বালুকাময়ী নামে একটী ক্ষুদ্রনদী তৎপ্রদেশে প্রবাহিত। প্রাগুক্ত বন সেই নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। ঐ বনে এক বিশালকায়-শার্দ্দূল ও হিংস্রজন্তু বাস করিত। দৈবশক্তিপ্রভাবে রামচন্দ্র সেই ব্যাঘ্রকে বিদূরিত করিয়া ঐ বনভূমিতে বাঘ্নাপাড়া নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম স্থাপন করেন, বাঘ্‌নাপাড়ার সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্র-ঘ্ন-পল্লী। অচিরকাল মধ্যে রামচন্দ্রের শিষ্য-সেবক দ্বারা সেই বনভূমি এক সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইল। অনন্তর রামকৃষ্ণবিগ্রহের মূর্ত্তি স্থাপিত হইল; তথায় প্রতিদিন দেব-সেবা ও অতিথি-সেবা ষোড়শোপচারে হইতে লাগিল। বাঘ্নাপাড়ার নিকট রাধানগর গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস ছিল। ইহাঁরা সকলেই রামচন্দ্রের শিষ্য হইলেন। কিছু-দিন মধ্যে রামচন্দ্রের এক ক্ষত্রিয়-ভক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে গুরুপাটে আগমনপূর্ব্বক, রামকৃষ্ণবিগ্রহের এক বিচিত্র ইষ্টকময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার কিছুদিন পরে এদেশীয় এক কায়স্থ-শিষ্য সেই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এক বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া দেন। এই দীঘির

* দীনেশ বাবু বলেন, রামচন্দ্র জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন।

নাম হইল 'যমুনা"। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে স্বীয় কনিষ্ঠ শচীনন্দনকে সপরিবারে বাঘ্নাপাড়ায় লইয়া আসিলেন এবং তদীয় হস্তে বিগ্রহ-অর্চ্চনা, অতিথি-সেবা প্রভৃতির ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। করচামঞ্জরী, সম্পুটিকা, পাষণ্ডদলন, এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাঘমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় তৃতীয়াতে অর্দ্ধযামিনী সময়ে পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রমে অপ্রকট হয়েন। ইহাঁর অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে বহু অদ্ভুতকাহিনী আছে। আমরা এস্থলে দুইটী মাত্র তাদৃশ ঘটনার উল্লেখ করিব। বৈষ্ণব-বন্দনায় রামচন্দ্রের এইরূপ গুণ-গান আছেঃ—

"জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ রামাই গোসাঞী।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥"

প্রথমতঃ তিনি যেরূপে রামকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বংশীশিক্ষা-গ্রন্থে এইরূপ আছেঃ—

"অরুণ-উদয়কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবার প্রভু করেন গমনে॥
স্নানকালে রামকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে আসিয়া লাগিল॥"

দ্বিতীয়তঃ। রামচন্দ্র গোস্বামীর প্রভাব জানিবার জন্য শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী রাত্রিকালে দ্বাদশশত শিষ্য বাঘ্নাপাড়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বারশত বৈষ্ণব দ্বিপ্রহর-রজনীসময়ে অতিথি হইয়া পর্য্যুষিতান্ন, ইলিস-মৎস্য ও অপক্ক আম্রের অম্বল আহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পৌষ-মাস, ঘোরতর শীত। রামচন্দ্র ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিবামাত্র ভৃত্য বকুল বৃক্ষ হইতে আম্রফল ছিঁড়িয়া আনিল, বৈষ্ণবেরা দেখিয়া অবাক্। দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময় রামচন্দ্র গোস্বামীর ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে "যমুনা" দীঘী হইতে ধীবরগণকর্ত্তৃক অসংখ্য ইলিসমৎস্য ধৃত হইল। এদিকে পাক-পাত্রে মাত্র মুষ্টিমেয় পর্য্যুষিতান্ন ছিল। যাহা হউক, রামচন্দ্র সেই একমুষ্টি অন্ন ও ইলিসমৎস্যের টক দ্বারা দ্বাদশশত বৈষ্ণবগণকে আকণ্ঠ পুরিয়া আহার করাইলেন। বীরচন্দ্র শিষ্য-মুখে রামচন্দ্রের এই দৈবী-শক্তির কথা শুনিয়া

অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং অচিরে বাঘ্নাপাড়ায় আসিয়া দুইজনে বহু-দিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পদকর্ত্তা ১৪৫৬ শকে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে মাঘমাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে অপ্রকট হন। ইনি কখন কখন বুধরীর নিকট রাধানগরে বাস করিতেন।

রাধামোহন দাস।

রাধামোহন আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র *। কাহার কাহার মতে পৌত্র † এবং কাহার মতে বৃদ্ধপ্রপৌত্র ‡। ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম; ১৬২০ কি ১৬২১ শকে রাধামোহনের জন্ম, ব্যবধান ১৫৫ বৎসর। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের "পুরুষ" হিসাবে (প্রত্যেকে ২৫ বৎসর গড়ে), শেষ মতই অধিক সম্ভাবনীয়। আবার আর একজন পত্রপ্রেরক আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "রাধা-মোহন ঠাকুর গতিগোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র।" এই কথা রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত মিলে। ইনি পৈতৃক বাসস্থান চাকন্দী-গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হয়েন। রাধামোহন এরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, যে ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা ইহাঁকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের "দ্বিতীয় প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি শ্যামানন্দপুরীর শিষ্য। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। "পদামৃত-সমুদ্র" নামক পদ-গ্রন্থ ইহাঁর দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়। এবং তদন্তর্গত পদাবলীর ইনি "মহাভাবানুসারিণী" নামক সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। রাধামোহনের রচিত কয়েকটী সংস্কৃতপদও আমরা দেখিয়াছি। ইহাঁর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনুকরণে লিখিত। বিখ্যাত রাজা নন্দকুমার ও পুটীয়ার অধীশ্বর রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রাধামোহন-ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পুটীয়ার রাজা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু রাধামোহন রাজপণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া রাজাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

---

* তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মত। † রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ণানন্দের ভূমিকায়।

‡ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় কোন বিজ্ঞ নামহীন লেখক।

বাঙ্গালা ১১২৫ সালে অর্থাৎ অনুমান ১৬৫০ শকে § গৌড়মণ্ডলে স্বকীয়া ও পরকীয়া বাদ সম্বন্ধে এক ঘোরতর বিচার হয়; এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের গোস্বামিগণ, সরকার ঠাকুরের পরিবারের গোস্বামিগণ, শ্রীজীব গোস্বামীর পরিবারের গোস্বামিগণ এবং আচার্য্যপ্রভুর পরিবারের গোস্বামিগণ পরকীয়া-বাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিচারে রাধামোহন ঠাকুরই প্রধান হইয়া বিচার করেন। এই বিচারসভায় বৈদ্যপুরনিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, গোকুলানন্দ সেন ও তদীয় বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। বিচার করিয়া রাধামোহন একখানি জয়পত্র প্রাপ্ত হয়েন। ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে সেই দলিল রেজিষ্টরি হয়। এই বিচারসময়ে রাধামোহনের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৬৯৭ শকে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, তাহার ৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭০০ শকে রাধামোহন ঠাকুর পরলোক গমন করেন। গোবিন্দ দাসের ন্যায় রাধামোহনও বিদ্যাপতির কোন কোন পদ পূরণ করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুর ৩য় শাখা ৬৭৪ সংখ্যক পদ যথা:—

"বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি শূর।
রাধামোহন দাস রসপূর॥"

আবার উক্তশাখার ৬৬৫ সংখ্যক পদের এইরূপ ভণিতা আছে:—

"কহ রাধামোহন দাসক দাস।"

ইহাতে তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, এই পদটী রাধামোহনের কোন শিষ্য কর্ত্তৃক রচিত। পদকল্পতরুর পরিশিষ্টেও ঐরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। ইহাতে আমরা যদি অনুমান করি যে, পদটী বৈষ্ণবদাস বা উদ্ধবদাসের রচিত, তবে কি অন্যায় হইবে?

---

§ ইংরাজী ও বাঙ্গালা শকের মধ্যে ৫৯৩ বৎসর অন্তর। সুতরাং ১১২৫ এর সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে খৃষ্টীয় ১৭১৮ শাক হয়, তাহা হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ শকাব্দ হয়। অমৃতবাজার আফিস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর পরিশিষ্টে ১৬৪০ শকাব্দ আছে, তাহা ভুল।

লক্ষ্মীকান্ত দাস।

অচ্যুতশিষ্য হরিচরণ দাস-কৃত "অদ্বৈতমঙ্গলে" দেখা যায়, অদ্বৈতাচার্য্যের ছয়জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। যথা :—লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীহরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীর্ত্তিচন্দ্র। কিন্তু এই লক্ষ্মীকান্ত পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। চট্টগ্রামবাসী একজন লক্ষ্মীকান্ত দাসের "ধ্রুবচরিত" নামে একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লোচনদাস।

লোচন, ত্রিলোচন, বা সুলোচন স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গলে আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস॥
মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে গাই গৌর-গুণ-গাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে আনন্দদেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থে পূত তেঁহো তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সহোদর নাই, কিংবা মাতামহ পুত্র॥
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥"

উপরে উদ্ধৃত পরিচয় হইতে জানা গেল, মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রামে পুরুষোত্তম দত্ত ও আনন্দময়ী দেবী নামে এক বৈদ্যদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সদানন্দী নামে এক কন্যা জন্মে। অপর

সন্তানাদি কিছু হয় নাই। ঐ কোগ্রামে কমলাকর দাস নামে একজন পরম পূতচরিত্র ও পরমবৈষ্ণব যুবক বাস করিতেন। পুরুষোত্তম গুপ্ত নিজেও একজন পরম ভাগবত ছিলেন; সুতরাং কমলাকরের চরিত্রে মোহিত হইয়া তদীয় হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতাকে সম্প্রদান করেন। এই কমলাকরের ঔরসে ও সদানন্দী দেবীর উদরে লোচনদাসের জন্ম। ইনি বাল্যকালেই নরহরি সরকার ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েন। সরকার ঠাকুর ইহাঁকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পরিশেষে লোচনদাসকে মন্ত্র-শিষ্য করেন *। ইষ্ট দেবতার আদেশ ক্রমেই লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন দাস "চৈতন্যমঙ্গল" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, লোচনদাস সাধন-প্রভাবে মানসচক্ষে তাহা সন্দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। বৃন্দাবনের গ্রন্থে ঐ ব্যাপারের উল্লেখ নাই। সুতরাং বৃন্দাবন দাস ঐ বর্ণনাটী লোচনদাসের কল্পনাসম্ভূত বলিয়া দোষারোপ করেন। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে ভয়ানক বাগ্বিতণ্ডা হয়। তখন বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থ হইয়া বলেন যে, লোচনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য, উহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই। উভয়ের রচিত গ্রন্থের নাম এক হওয়াতে পাছে ভবিষ্যতে তাহা লইয়া আবার পরস্পর বিবাদ হয়, এই ভয়ে নারায়ণী বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-ভাগবত" রাখিয়া দেন। লোচন দাসের গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা ও বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রবাদ, সত্য কি না, ধর্ম্ম জানেন। কিন্তু একটী অটল বৃত্তান্ত উভয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। চৈতন্যমঙ্গলের সমস্ত হস্তলিখিত পুস্তকে, এমন কি কাঁকড়া গ্রামের (কোগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচন-দাসের স্বহস্ত-লিখিত যে চৈতন্যমঙ্গল আছে, তাহাতে এই দুইটী পদ পাওয়া যাইতেছে।

---

* লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন, "প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস। তার পদপ্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।"

"বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥"

যাহা হউক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত লিখিবার সময় বৃন্দাবনের কাব্যের নাম যে "চৈতন্যমঙ্গল" ছিল, তাহা নিশ্চয়। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শকের মধ্যভাগে লোচনদাসের জন্ম ও উহার শেষভাগে তাঁহার পরলোক হয়। চৈতন্যমঙ্গল রচনার পর ইহাঁকে লোকে "সুলোচন" ও "লোচনানন্দ" বলিতেন। লোচনকৃত "ধামালী" পদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এই জন্য কেহ কেহ লোচনকে "ব্রজের বড়াই" বলিয়া ডাকিতেন। লোচনদাস মুরারিগুপ্তের করচা অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলা বর্ণন করেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলাকে উক্ত করচার অনুবাদ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কথিত আছে, সরকার ঠাকুরের আদেশে ১৪৫৯ শকে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়, তখন লোচন দাসের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন "যিনি 'আহ্লাদে' ছেলে বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন *, তিনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় এত বড় ও সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণ-কথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না। বৈষ্ণব-সমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।" লোচনের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রাগুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলেন "লোচনের আখর উঠানযোড়া কএর মত।" "লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, তাহা এখনও আছে"।

দীনেশ বাবু ঐতিহাসিক, সুতরাং ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়া তিনি বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাসের গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটী এতই সুন্দর যে, সুদীর্ঘ হইলেও তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলেন:—

"চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক

* গ্রন্থকার লোচনদাসের এই বর্ণনার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন:—"যথা যাই তথাই ছলিল করে মোরে। ছলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥" চৈতন্যমঙ্গল।

অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল; বৃন্দাবন দাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক গল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ। চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্বর্ণ করিয়া দিয়াছিল; তিনি ঘটনা প্রকৃত বর্ণে ফলাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তকে ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

"বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপ-কথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিৎ চৈতন্যদেবের নির্ম্মল দেবহাস্যটুকু বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা পরক্ষণে দৈবঘটনার আঁধারে লীন হইয়া যায়।

"লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একবারে নির্গুণ নহে। ৩০০ শত বর্ষকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুবল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লেখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুল্লপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পক্ষে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবন-দাসের সাদাসিধা রচনায় * * কবিত্বের ঘ্রাণ নাই, * * কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে।" ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন লোচনদাসের "দুর্লভসার", "বস্তুতত্ত্বসার", "আনন্দলতিকা", "চৈতন্যপ্রেমবিলাস", "দেহনিরূপণ" ও "প্রার্থনা", নামক গ্রন্থ আছে। দুর্লভসার চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় প্রসিদ্ধ।

ঘটনাবশতঃ লোচনদাস তাঁহার স্ত্রীর সহিত চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বন করেন, তাহা এই :—লোচনদাস অতি শিশুকালে আমোদপুর কাকুটে গ্রামে বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারধর্ম্মে তাঁহার মতি ছিল না। আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ইনি স্ত্রীকে স্বগৃহে আনিবার জন্য পদব্রজে গমন করেন। বিবাহসময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ছয় কি সাত ও ইঁহার পত্নীর বয়স চারি, কি পাঁচ বৎসর ছিল; সুতরাং কেহ কাহাকে চিনিতেন না। লোচন-দাস অতিকষ্টে সন্ধ্যাকালে কাকুটে গ্রামে উপস্থিত হইয়া, একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে শ্বশুরালয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটী লোচনদাসকে তাঁহার শ্বশুরালয় দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই স্ত্রীলোকটী যে লোচনের ভার্য্যা, তাহা পরে প্রকাশ পাইল। মাতৃসম্বোধন করাতে লোচনের স্ত্রীর সহিত পতি-পত্নী সম্পর্ক রহিত হইল বটে, কিন্তু লোচনদাস যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ঐ সাধ্বীরমণী যার পর নাই ভক্তিসহকারে স্বামিসেবা করিতেন। অজ্ঞাত-সারে মাতৃসম্বোধন করিলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লোচনদাস স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে, তাঁহার কোন দোষ হইত না। অতএব আমাদের বোধ হয়, এ প্রবাদ সত্য নহে। পক্ষান্তরে, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, লোচন সাধনবলে জিতেন্দ্রিয় হওয়াতেই স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু। দেখিতে সুন্দর, কিন্তু দংশনের ক্ষমতারহিত।" তত্ত্বনিধি মহাশয় প্রবন্ধান্তরে বলেন, "পদ ও চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত 'রাগানুগালহরী' ও জগন্নাথবল্লভের পদ্যানুবাদ লোচন-কৃত। (রাগানুগালহরীতে আচার্য্য প্রভুর নাম থাকায় ইহাকে তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ এবং বৃদ্ধকালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। রাগানুগালহরী ভক্তিরসা-মৃতের অধ্যায়বিশেষের অনুবাদ)। লোচন আচার্য্যপ্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন এবং খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হন। দুর্লভসার গ্রন্থও লোচনকৃত। কিন্তু উহা প্রক্ষিপ্ত অংশে পরিপূর্ণ হওয়ায়, অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

বিশ্বকোষ-মতে লোচনদাসের জন্ম ১৪৪৫ শকে ও তিরোভাব ১৫৩০ শকে। দুর্লভসার গ্রন্থে চৈতন্যমঙ্গলের নাম ও বিবরণ আছে বলিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন "দুর্লভসার চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত হয়।" কোষকার

পুনশ্চ বলেন, "রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোকাংশের পদ্যানুবাদ ইহাঁর তৃতীয় এবং সংস্কৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ ইহাঁর চতুর্থ গ্রন্থ, ইহার নাম রাগলহরী।"* লোচনের হস্তাক্ষরের কথা ও যে পাথরে বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, তাহার কথাও বিশ্বকোষে আছে। † নগেন্দ্র বাবু আরও লিখিয়াছেন "তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল, চৈতন্যমঙ্গলেই তাহার পরিচয় আছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই এই পদটী আছে। যথা :—

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজকথা।
আশীর্ব্বাদ মাগে আগে,
যত যত মহাভাগে,
তবে গাব গোরা-গুণ-গাঁথা॥"

শচীনন্দন দাস।

শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর ও চৈতন্যদাসের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি পঠদ্দশাতেই অত্যন্ত কৃষ্ণ-ভক্ত হয়েন। একদা তাঁহার সমপাঠিগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে, তাঁহার মুখ হইতে এই সংস্কৃত শ্লোক বহির্গত হয়।—

"প্রাণঃ কচ্ছগতো ভ্রাতর্বনাদিগতোঽপি বা।
তনোস্তদ্গৌরবং ত্যক্ত্বা কুরুদ্ধ্ব হরি-কীর্ত্তনম্॥"

অস্যার্থ—"কচ্ছ কিংবা বনাদি গত যে জীবন।
তাহার গৌরব মাত্র করে ভ্রান্তগণ॥

---

* কোষকারের মতে চৈতন্যমঙ্গল লোচনের প্রথম, ও দুর্লভসার দ্বিতীয় গ্রন্থ। সম্ভবতঃ আর পাঁচখানি গ্রন্থের কথা যে আমরা উপরে বলিয়াছি, তাহা সহজিয়াদের লোচনের নামে ছাপ দেওয়া জাল গ্রন্থ।

† বিশ্বকোষকার বলেন "লোচনের অক্ষরগুলি খুব মোটা মোটা। তাঁহার বাড়ীতে একটী পাথরের উপর বসিয়া শূন্য আকাশতলে তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, সে পাথরখানি অদ্যাপি আছে। বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।"

অতএব এ দেহের গৌরব ছাড়িয়া।
হরি সংকীর্ত্তন কর যতেক পড়ুয়া।" *

শচীনন্দনের তিনপুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব, তাঁহারই ন্যায় পরমবৈষ্ণব, পরমবিজ্ঞ, ও পরম মহিমান্বিত ছিলেন। পদাবলী ব্যতীত ইনি "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল অপরিজ্ঞাত।

শঙ্কর দাস।

বৈষ্ণবসাহিত্যে ৫ জন শঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। যথা :—

(১) চৈতন্যশাখায়, দামোদর পণ্ডিতের অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত; মহাপ্রভুর শয়নসময়ে শঙ্কর তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে যথা :—

"তাঁহার অনুজশাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভুর পাদোপাধান যাঁর নাম বিদিত॥"

বঙ্গবাসী যে সকল ভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন, তাঁহাদের নামোল্লেখসময়ে, চৈতন্যচরিতামৃতে পুনঃ শঙ্করের নাম লিখিত আছে :—

"গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর।"

আমাদের অনুমান হয়, এ দুই জন এক ও অভিন্ন।

(২) প্রাগুক্ত পরিচ্ছেদে কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণনায় এক শঙ্করের নাম দেখা যায়। যথা :—

"যদুনাথ, পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ।"

ইহাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

(৩) নিত্যানন্দগণে এক শঙ্করের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা :—

"শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।"

ইহাঁর সম্বন্ধেও অন্যবৃত্তান্ত অপ্রাপ্য।

---

* এই শ্লোক হইতে অনুমান হয়, শচীনন্দনের সময় তাঁহাদিগের অঞ্চলে বিসূচিকা মহামারীর (কলারার) খুব প্রাদুর্ভাব ছিল।

(৪) ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শঙ্কর দাস, বা শঙ্কর বিশ্বাস, একজন পদকর্ত্তা। নরোত্তমবিলাসে ইহাঁর নাম আছে :—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌর-গুণ গানে যেহোঁ পরম উল্লাস ॥"

(৫) ইনি (শঙ্কর ঘোষ) নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ডমরু বাজাইয়া তাহার তালের সঙ্গে সুর মিলাইয়া স্বরচিত পদ গাইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রীতি সম্পাদন করিতেন। প্রবাদ এই যে, ইনিও খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। দৈবকীনন্দনদাস এইরূপে ইহঁার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন :—

"বন্দিব শঙ্কর ঘোষ আকিঞ্চন রীতি।
ডমরুের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥"

সুতরাং ইনিও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

৩০০ শ্লোকাত্মক "গুরুদক্ষিণা" নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উহা যে কোন্ শঙ্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা সুদূরপরাহত।

শিবরাম দাস।

নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর উভয় গ্রন্থেই নিম্নলিখিত পয়ারটী আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এইমাত্র জানা যায়। আর কোন পরিচয় অপ্রাপ্য।

"জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার।"

শিবানন্দ সেন।

কুলীনগ্রামবাসী সেন শিবানন্দ অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন সামান্য ভক্তের ন্যায় শিবানন্দও তাঁহার অনুগমন করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েন। কিন্তু শিবানন্দের প্রতি একটী বিশেষ ভার অর্পণ করিয়া মহাপ্রভু শিবানন্দকে গৃহে

রাখিয়া যান। শিবানন্দ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন। দেখা যায়, ইহজগতে কাহারও ধন আছে, কিন্তু সৎকর্ম্মে মন নাই; কাহারও বা সৎকর্ম্মে মতি আছে, কিন্তু অর্থাভাবে সৎকর্ম্ম করিবার সামর্থ্য নাই। এই উভয়ের শুভ সংযোগ ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জন অতীব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে, শিবানন্দ সেনের অদৃষ্টে এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। জনৈক ইংরাজ কবি কহিয়াছেন, "ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির হস্তগতধন বিমানচ্যুত শিশিরকণার ন্যায় জগৎকে পরিতৃপ্ত করে। পরম ভাগবত শিবানন্দ সেনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা সেইরূপ অনেক ব্যক্তির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইত। শিবানন্দ সম্বৎসর গৃহে থাকিয়া নানা সৎকর্ম্ম করিতেন, রথযাত্রার মাসদ্বয় পূর্ব্বে প্রতিবর্ষে বঙ্গদেশের গন্তকাম সহস্র সহস্র যাত্রী সমভিব্যাহারে লইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইয়া "যুগলব্রহ্মের" বদনসুধাকর সন্দর্শন করিতেন। এই সকল যাত্রীদের আসিবার ও যাইবার সমস্ত পাথেয় ও আহারীয় ব্যয় সেন শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় যথা :—

"শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া॥" ১০ম পরি।

পূর্ব্বে যে ভারার্পণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই যাত্রী লইয়া যাওয়া আইসাই সেই ভার। শিবানন্দ আহ্লাদ সহকারে মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা পালন করিতেন। এই বিষয়ের পুনরুল্লেখ অন্ত্যলীলায়ও দৃষ্ট হয়, যথা :—

"কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ, সেন মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করে দিয়া বাসস্থান॥" ১ম পরি।

কেবল যে শিবানন্দকে মহাপ্রভু ভালবাসিতেন এরূপ নহে, শিবানন্দের বাসস্থান কুলীনগ্রাম পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অতি প্রিয় স্থান ছিল। আদির দশমে মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন :—

"প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো চৈতন্য গায়॥"

শিবানন্দ সেনের পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মে; যথা—পরমানন্দ সেন, চৈতন্যদাস সেন ও রামদাস সেন। চৈতন্য-চরিতামৃতেও এই তিন পুত্রের উল্লেখ আছে, যথা :—

"চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥"

পিতার ন্যায় পুত্রত্রয় যে কেবল মহাপ্রভুর পরমভক্ত ছিলেন, এরূপ নহে। তিনজনই পিতার ন্যায় কবি ছিলেন। কবি কর্ণপুর কাঁচড়াপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, শিবানন্দের বাসস্থান কাঁচড়াপাড়ায় ছিল।* কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মত অগ্রাহ্য করিয়া অন্য কাহারও মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই জন্য আমরা অনুমান করি, কাঞ্চনপল্লী শিবানন্দের শ্বশুরালয় ছিল। বৈষ্ণববন্দনায় শিবানন্দের এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"প্রেমময় তনু বন্দ সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব॥"

শ্যামানন্দ যেমন কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে "দুঃখিনী" বলিয়াছেন; শিবানন্দও কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে "শিবা-সহচরী" † বলিয়াছেন।

শ্যামদাস।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের শ্বশুর এবং শ্রীমতী দ্রৌপদী বা ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর জনক জাযীগ্রামবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার শ্যামদাস ও রামচন্দ্রদাস নামে দুই পুত্র ছিল। কেহ কেহ দুই ভ্রাতাকে শ্যামাচরণ ও রামচরণ কহিত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহাঁদিগের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে :—

---

* "সেন শিবানন্দ কাচড়াপাড়াবাসী" অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

† পদকল্পলতিকায় দ্রষ্টব্য।

"শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপাল-তনয়।
শ্যামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥
দোহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত।
এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্রে বিদিত॥"

উভয় ভ্রাতাই শ্রীনিবাসাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। ইহাঁরা পদকর্ত্তা ছিলেন।

স্বরূপদাস।

"সর্ব্বত্র মহামহিমান্বিত" শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য "সর্ব্বাংশে প্রধান" শ্রীবিশ্বাচার্য্য। বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য "পরম বিদ্যাবান্" পুরুষোত্তম আচার্য্য। পুরুষোত্তম আচার্য্যের শিষ্য "মহাধীর" বিলাসাচার্য্য। বিলাসাচার্য্যের শিষ্য "গভীরচরিত" শ্রীস্বরূপাচার্য্য। ভক্তিরত্নাকরের এই পরিচয়ে জানা গেল, স্বরূপাচার্য্য শ্রীনিবাসের এক উপশাখা। কেহ কেহ ইহাঁকেই পদকর্ত্তা স্বরূপদাস অনুমান করেন। অপর এক স্বরূপদাসের "নৃত্য" নরোত্তমবিলাসে বর্ণিত আছে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অসংখ্য পরিকর মধ্যে অন্যতম।

হরিরামাচার্য্য।

ভক্তিরত্নাকর বলেন, শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, তাঁহার শিষ্য হরিরামাচার্য্য। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন; এবং নানা স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন, যথা:—

"শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম।
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম॥
শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য্য।
সর্ব্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব্বকার্য্য॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রেমভক্তি বিলাইয়া।
জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥"

ইনি "শ্রীকৃষ্ণ রায়" নামক বিগ্রহের সেবা করিতেন। পুনঃ ভক্তি-রত্নাকরে যথাঃ—

"শ্রীমদ্ভাগবতাদিক-গ্রন্থকথন, অনুপম বরষত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন, ভণব কি নরহরি মহিমা অপার॥"

ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ রাজসাহী জেলাতে গোয়াসপুর নামক গ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। প্রেমবিলাসে যথা :—

"হরিরাম আচার্য্যশাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহা জগতবিদিত॥
গঙ্গাপদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।
তথায় গোয়াসগ্রামে তাঁহার আলয়॥"

ইনি ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মতে "আশ্চর্য্যচরিত", "মধুর মূর্ত্তি", "পরম সুধীর", "করুণাময়" "অত্যুদার", "সংকীর্ত্তন-রস-লম্পট" ও "বৈষ্ণব-সেবাপটু" ছিলেন। ইহাঁর বংশধরগণ সম্প্রতি সৈদাবাদে অবস্থিতি করেন। নরোত্তমবিলাসে দৃষ্ট হয়, ইনি খেতুরীর মেলায় গিয়াছিলেন।

কর্ণানন্দে ইহাঁর এইরূপ পরিচয় আছে :—

"আর এক সেবক তাঁর হরিরামাচার্য্য।
পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুণে আর্য্য॥"

কথিত আছে, বৈদ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হরিরাম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

হরিবল্লভ দাস বা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাব্দে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নদীয়াজেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা ছিলেন, জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ, সর্ব্বকনিষ্ঠ বিশ্বনাথ। কথিত আছে, বিশ্বনাথ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এক অলৌকিক জ্যোতিতে সূতি-কাগার আলোকিত হইয়াছিল। বোধ হয়, বিশ্বনাথের অলৌকিক প্রতিভা-

দর্শনে পরবর্ত্তিকালে এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদনিবাসী কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ গুরুগৃহে অনেককাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, আপনাকে সৈয়দাবাদবাসী বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে পরিচয় দিয়াছেন। যথা :—

"সৈয়দাবাদনিবাসিশ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥"

(অলঙ্কারকৌস্তভের টীকার শেষ)

বিশ্বনাথ দেশে থাকিয়াই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি পঠদ্দশাতেই একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বনাথ উদাসীন ছিলেন। পিতা বহুযত্নে ইহাঁকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং গৃহেই পণ্ডিত রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের বাল্যবৈরাগ্য শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে বৃদ্ধি পাইল। বিশ্বনাথ অতুল ঐশ্বর্য্য, রূপবতী ভার্য্যা, স্নেহময়ী জননী ও পুত্রবৎসল জনককে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিলেন। যদিও একবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তথাপি অল্পকাল অবস্থান করিয়াই পুনঃ বৃন্দাবনে যাইয়া রাধাকুণ্ডতীরে ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিত্যক্ত কুটীরে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দদাসের সহিত বাস করেন; এবং শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁহার গ্রন্থনিচয় রচনা করেন। মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ের একজন সদাচার পরম-ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বিশ্বনাথের রচিত গ্রন্থকলাপের নাম এই :—(১) সারার্থদর্শিনী নামক ভাগবতের সম্পূর্ণ টীকা, (২) সারার্থবর্ষিণী নামক গীতার টীকা, (৩) সুবোধিনী নামক অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা, (৪) সুখবর্ত্তিনী নামক আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা, (৫) বিদগ্ধমাধবের টীকা, (৬) শ্রীচৈতন্যের লীলা-বর্ণনাত্মক ভাবনামৃত নামক মহাকাব্য, (৭) স্বপ্ন-বিলাসামৃত নামক কাব্য, (৮) মাধুর্য্যকাদম্বিনী, (৯) ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, (১০) স্তবামৃতলহরী, (১১) চমৎকারচন্দ্রিকা, (১২) গৌরাঙ্গলীলামৃত, (১৩) চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা, (১৪) উজ্জ্বল নীলমণির আনন্দ-চন্দ্রিকা নামক টীকা, (১৫) গোপালতাপিনীর টীকা, (১৬) গৌরগণ-

চন্দ্রিকা ইত্যাদি *। কথিত আছে যে, "চৈতন্যরসায়ন" নামে আরও একখানি গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নযোগে শ্রীচৈতন্য নিষেধ করাতে ঐ গ্রন্থ লিখিতে বিরত হয়েন।

বিশ্বনাথ জীবনের শেষভাগে "শ্রীগোকুলানন্দ" বিগ্রহের সেবা করিতেন। মধ্যে মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গোবর্দ্ধনশিলাও লইয়া আসিয়া সেবা করিতেন। এই গোবর্দ্ধনশিলার একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ঐ শিলা প্রথমে শঙ্করানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে প্রদান করেন; রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হন; রঘুনাথের অপ্রকটের পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং তাঁহার অপ্রকটের পর তৎশিষ্য মুকুন্দদাস উহা সেবা করেন। প্রসিদ্ধ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিলে, মুকুন্দদাস গোবর্দ্ধনশিলা তাঁহাকে অর্পণ করেন; তিনি মধ্যে মধ্যে উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিতেন। ঐ বিখ্যাত শিলা এক্ষণ গোকুলানন্দ বিগ্রহের মন্দিরে আছেন।

বিশ্বনাথের অনেক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে মুরশিদাবাদ জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী সেঞাপুরনিবাসী বিপ্র জগন্নাথ একজন। এই জগন্নাথ কবি ঐতিহাসিক ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পিতা। বিশ্বনাথ, কবিরাজ গোস্বামীর প্রায় ১২৫ বৎসরের পরের লোক। কারণ কবিরাজ ১৫০৪ শকে অপ্রকট হয়েন; বিশ্বনাথ ১৬২৬ শকে ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত করেন এবং উহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অপ্রকট হয়। ১৬০০ শকে ভাবনামৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথের "চক্রবর্ত্তী" আখ্যা সম্বন্ধে সাদিপুরনিবাসী শ্রীরাসবিহারী দাস সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় বলেন "কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিটী ভক্তগণের প্রদত্ত। চক্রবর্ত্তী উপাধি যে পরের সময়ের, তাহা জনশ্রুতি-লব্ধ এবং ময়মনসিংহ জেলার ভাঙ্গাগ্রামনিবাসী শ্রীউমাকান্ত চৌধুরীর মুদ্রিত স্বপ্নবিলাসামৃতগ্রন্থের ভূমিকাতেও দৃষ্ট হয় যে :—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাচ্চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

* ইঁহার রচিত মোট সংস্কৃতগ্রন্থের সংখ্যা ২৩ খান, আমরা অবশিষ্ট ৭ খানের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

অর্থাৎ সকলকে ভক্তিপথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বনাথ, আর ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া চক্রবর্ত্তী॥"

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বিশ্বনাথের রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন:—"বিশ্বনাথ কাব্যশাস্ত্রে সুদক্ষ পণ্ডিত। ইহাঁর সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ অবলোকন করিলে ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব অনুমান করা যায়। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিলেও একমাত্র সুবৃহৎ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়া বৈষ্ণবজগতে চিরজীবিতের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত ভাবনামৃত মহাকাব্যখানি বিবিধরস, ভাব, অলঙ্কার ও প্রসাদাদি গুণে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর লেখার যে কোনস্থানে যখনই পাঠ করা যাউক না কেন, তখনই পাঠককে মুগ্ধ হইতে হইবেক।"

বিশ্বনাথ হরিবল্লভদাস নাম গ্রহণপূর্ব্বক অনেক বাঙ্গলা পদ রচনা করিয়াছেন। আমাদিগের সংগ্রহে হরিবল্লভের যে দুইটী পদ সঙ্কলিত হইয়াছে; শুদ্ধ তাহা পাট করিলেও বিশ্বনাথের পদরচনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষার গাঢ়তা অথচ কোমলতা এবং ভাবের মধুরতা, প্রথম শ্রেণীর কবির ন্যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। "ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি" নামক সঙ্গীতসংগ্রহ গ্রন্থ, ইহাঁর সঙ্গীতজ্ঞতার বিশিষ্ট প্রমাণ। স্বীয় যশঃপ্রকাশে ইনি এতই সঙ্কুচিত ছিলেন যে, এই সংগ্রহ-গ্রন্থে আপনার প্রকৃত কি ভক্ত নাম পর্য্যন্ত দেন নাই। কেহ কেহ বলেন, বিশ্বনাথের গুরু কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর হরিবল্লভ এবং বিশ্বনাথ নিজে পদ রচনা করিয়া গুরুর নামে ভণিতা দিতেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে "গুরুভক্তির" আকরস্থান ভারতবর্ষে, বিশ্বনাথ এক নূতন প্রকার গুরুভক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন।

হরিদাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যপাঠে আমারা ৭ জন হরিদাসের নাম জানিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে "ছোট হরিদাস", বা "বড় হরিদাস", অথবা উভয়ে পদকর্ত্তা; এবং "দ্বিজ হরিদাস" পদকর্ত্তা; হরিদাস ঠাকুর বা যবন হরিদাস ও দুই জন হরিদাস ব্রহ্মচারী এবং পণ্ডিত হরিদাস এই চারিজন;

পদকর্ত্তা নহেন। "পদ-কর্ত্তা হরিদাসের" মধ্যে "দ্বিজ হরিদাসের" বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইবে। প্রথমতঃ সাত জন হরিদাস, যথা :—

(১) শ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীবৃন্দাবনের :—

"সেবার অধ্যক্ষ্য শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশোগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ধীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা করে সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব ইহাঁর শরীরে পরকাশ॥" আদি ৮মে,চৈ,চ,

(২) ও (৩) "বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥" আদি ১০মে ঐ

(৪) কাঞ্চনগড়িয়ানিবাসী দ্বিজ হরিদাস।

(৫) "হরিদাস ঠাকুরশাখার অদ্ভুত চরিত।
তিনলক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥
"তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞী যাঁরে ভুঞ্জয় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লইয়া কোলে।
নাচিলা চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে॥" চৈ,চ, আদি ১০মে

(৬) নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ব্রহ্মচারী হরিদাস। আদি ১১শে দ্রষ্টব্য।

(৭) গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী। ঐ ১২শে দ্রষ্টব্য।

বড় হরিদাস বঙ্গবাসী, নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন এবং তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। ইহাঁর সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইনি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব।

ছোট হরিদাস ও নবদ্বীপবাসী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। অতি সুকণ্ঠ বলিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। একজন ভক্ত বলেন "যাঁহার অন্তরে কোন বিকার নাই, প্রভুর সহিত

নিরন্তর যাঁহার সহবাস ; এমন কি, যে হরিদাসের কীর্ত্তনে প্রভু বিভোর হইতেন ; মুহূর্ত্তকালের জন্য যে হরিদাসকে সঙ্গ ছাড়া করিতেন না ; যাঁহাকে ভক্তমণ্ডলীতে অতিপ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিতেন।” অতি ক্ষুদ্র দোষে মহাপ্রভু এ হেন হরিদাসকে চিরনির্ব্বাসন করিয়াছিলেন ! সে দোষটী এই যে, হরিদাস একদিন শিখী মাহিতীর ভগিনী পরম তপস্বিনী মাধবী দাসীর নিকট মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পরিবর্ত্ত করিয়া উত্তম সরু তণ্ডুল আনিয়াছিলেন, এবং এই উপলক্ষে মাধবী দাসীর সহিত হরিদাসের দুই এক কথা হইয়াছিল। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, এমন কি পুরী গোস্বামী পর্য্যন্ত হরিদাসকে মার্জ্জনা করিতে বলিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভু হরিদাসকে কিছুতেই মার্জ্জনা করিলেন না দেখিয়া, হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিজ হরিদাস রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ও গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি ফুলের মুখটী নৃসিংহের সন্তান। ইহাঁর নিবাস কাঞ্চনগড়িয়াগ্রামে ছিল। এই গ্রাম চৈঞা বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, মহাপ্রভুর অপ্রকট হইলে ভক্তপ্রবর হরিদাসাচার্য্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। ভক্তিরত্নাকরে—

“দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু-অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ॥”

রজনী প্রভাত হইলেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিব, মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন ; চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রিতাবস্থায় মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে ও বৃন্দাবনগমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে হরিদাস বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামে পুত্রদ্বয়কে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন যাজীগ্রামবাসী মহাপ্রভুর প্রেমাবতার স্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস যখন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট হইতে গ্রন্থরত্ন সমভিব্যাহারে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন এক নির্জ্জন কুঞ্জে বৃক্ষতলে হরিদাসকে দর্শন করিলেন। সেই সময় হরিদাসের দেহ জীর্ণ শীর্ণ এবং জীবনাশায় নিরাশ। এক এক বার “হা গৌরাঙ্গ” বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং নেত্রনীরে দেহ প্লাবিত

হইতেছে। আচার্য্য প্রভু হরিদাসকে প্রণাম করিলে, হরিদাসাচার্য্য তাঁহাকে দৃঢ়-প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আপনি কল্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করিবেন; আমার অনুরোধ এই যে, আমার পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে যেন আপনার মন্ত্রশিষ্য করেন।" শ্রীনিবাস এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর মাঘমাসের কৃষ্ণা একাদশী দিবসে হরিদাসের তিরোভাব হয়। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে, হরিদাস, শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের অল্পবিস্তর বিবরণ আছে। অধুনা শ্রীদাসের বংশধরগণ সাটিগ্রামে ও গোকুলানন্দের বংশীয়গণ চৈঞাবৈষ্ণপুরগ্রামে বাস করিতেছেন।

মন্তব্য। আমাদিগের বর্ত্তমান সংগ্রহে ৮৮ জন পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে "পরিকর" ও "পদকর্ত্তা" এই দুই শিরোনামে আমরা ৭৯ জনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ পরিচয় দিতে পারিয়াছি। কিন্তু বহুচেষ্টায়ও নিম্নলিখিত ৯ জনের কোন পরিচয় পাই নাই। নয়জন যথা :—গুপ্তদাস, গৌরসুন্দর, বিন্দুদাস, বিশ্বম্ভরদাস, মন্মথনাথদাস, রাধাচরণদাস, সর্ব্বানন্দদাস, সঙ্কর্ষণদাস ও হরেকৃষ্ণদাস।

সম্পূর্ণ।

শ্রী

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

প্রথম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(নান্দী বা পূর্ব্বাভাস।)

প্রথম পদ।

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে, শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি, কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ, এক যুবা গৌউর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটী কাম, রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি, ভাব ভূষা নিরবধি, নাচে গায় মহা মত্ত হৈঞা।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি, মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া॥
নব জলধররূপ, রসময় রসকূপ, ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত, কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত, দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন, (এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি, বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি, হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

দ্বিতীয় পদ।

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাবপ্রকাশিতে, ধনী অনুমতি ভেল জান॥
সুন্দরী যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা, মোহে করবি হেন রূপ॥ ধ্রু॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা, কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি কহব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে, এসুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেমগুরু করি, নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা, জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়, না ভজিনু মুঞি নরাধম॥

তৃতীয় পদ।

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজজীবন, তুয়া বিনু কৈছন, ব্রজপুর বাঁধব থেহা॥
জল বিনু মীন, ফণী মণি বিনু, তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন, ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি, পাওবি কোন হি সুখ।
কিয়ে আন জন, তুয়া মরমহি জানব, ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসরি, তুহুঁ বর নাগর কান।
অহনিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব, তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনাতটে, সখা সঞে করবি বিলাস।
পাসরাব মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি, না বুঝয়ে বলরাম দাস॥

চতুর্থ পদ।

শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ। ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি। নদীয়া নগর পরে করবহুঁ কেলি॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম। অবিরত বদনে বোলব তব নাম॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব। ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মন কাম। অনুসরি [illegible] দাস বলরাম॥

পঞ্চম পদ।

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী, কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য, সেইরূপ দেখিব হে আমি॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে, অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়াধরা কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে, কাল গৌর হইবে কেমনে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তভের প্রতিবিম্বে, দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা, ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ॥
নিধুবনে এই কয়ে, দুহুঁ তনু এক হয়ে, নদীয়াতে হইলা উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে, প্রেম বন্যায় জগত ভাসায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন, ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ, না ভাসিলাম সে সুখতরঙ্গে॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(মঙ্গলাচরণ।)

১ম পদ। গৌরীরাগ।

জয় নন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ, রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুরমুনিগণ ১ মনো-মোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ। *
জয় ব্রজ-সহচরী লোচন মঙ্গল, জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন, প্রেমবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর † প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জনগণ-ভয়ভঞ্জন, গোবিন্দ দাস, আশ অনুবন্ধ॥

২য় পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম। কলিমদ-মথন নিত্যানন্দ ধাম॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর। প্রেম-রতন ফল ধরল উজোর॥

---

১ সুর-রমণী পাঠান্তর।
* শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করেন।
† রামকৃষ্ণ সুন্দরানন্দ প্রভৃতি।

অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি। ঐছন সদয়হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ। কাঁদিতে অখিল ভুবনজন কান্দ ॥
তেঁই অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ। প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ ॥ *
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস। মলিন মুকুরে১ নাহি বিম্ব২ বিকাশ ॥ †
গোবিন্দ দাসিয়া কহে তাহে কি বিচার। কোটী কল্পাপ তার নাহিক নিস্তার ॥

৩য় পদ। তিরোতা।

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন। ত্রিভুবনে করে যাঁর চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর ॥
কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা। গোলোকের বিভব লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার। হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার।
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

৪র্থ পদ। কেদার বা মঙ্গল।

জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠান রে।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসুগুণ গান রে ॥
দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দিরা৩ রসাল রে।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভাল, মিলন পদতলে তাল রে ॥
কোই দেই অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কোই দেই মালতীমাল রে।
পিরীতি ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচর ভোর রে ॥
কেহ বোলে গোরা, জানকীবল্লভ, রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ রে।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহি জানে, আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥

৫ম পদ। তুড়ি।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র। জয় জয় বিশ্বম্ভর করুণার সিন্ধু ॥

---

* পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি দুই মূর্ত্তিতে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দরূপে কিরূপে হইতে পারেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য কবি কহিতেছেন, সূর্য্য এক হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া শত শত সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়েন, ইহাও তদ্রূপ।

১ মঞ্জরি পাঠান্তর। ২ আধারে পাঠান্তর। ৩ বিন্দু পাঠান্তর।

† মলিন দর্পণে যেমন সৌরকিরণ প্রতিভাত হয় না। তেমনি নাস্তিকের মলিন হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বে বিশ্বাস স্থান পায় না। যে দুর্ভাগ্য এই সহজ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া অনায়াসে উদ্ধার লাভ না করিল, তাহাকে লইয়া আর বিচার কি? কুতর্কগর্ত্তে সে কোটী কল্প পড়িয়া থাকিবে, তাহার আর নিস্তার নাই।

জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাই। জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই ॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী। জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর ঘরণী ॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ। জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥
নিত্যানন্দ-পদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন গায় দীন কৃষ্ণদাস ॥

৬ষ্ঠ পদ। গৌরী।

জয় কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র। অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন ॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণসনাতন। কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট। বৃন্দাবন যমুনা পুলীন বংশীবট ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন, রাধেকৃষ্ণ রট। ব্রজভূমে বাস কর যমুনা নিকট ॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে। নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাট রে।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে। শচীর নন্দন গোরা কীর্ত্তনে লম্পট রে ॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেগোবিন্দ। শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ ॥

৭ম পদ। ধানশী।

জয় শচীসুত গৌর হরি। জয় পাবন জয় নদীয়াবিহারী ॥
জয় চাপাল গোপাল মুক্তিকারী। জয় জগাই-মাধাই-দুষ্কৃতিহারী ॥
জয় অখিল ভুবন ত্রাণকারী। জয় দণ্ড কমণ্ডলু করোয়া ধারী ॥
জয় যুগল কিশোররূপধারী। জয় দাস মনোহর হৃদয়বিহারী ॥

৮ম পদ। কামোদ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ, সীতানাথে দেহ পদছায় ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত অতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥
তোমার চরণে, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্টমনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায় ॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে বংশীদাস, পূর সব আশ, কি আর কহিব আমি ॥

৯ম পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াসিন্ধু। পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দাস পামরে॥
পূর্ব্বেতে সাক্ষাত যত পাতকী তারিলা। সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলা॥
মো হেন পাপিষ্ঠ এবে করহ উদ্ধার। আশ্চর্য্য দয়াল গুণ ঘুষুক সংসার॥
বিচার করিতে মুঞি নহে দয়াপাত্র। আপন স্বভাব গুণে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলি যুগে। এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥

১০ম। পদ সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সার। অপরূপ কলপ বিরিখ অবতার॥
অযাচিতে বিতরই দুর্লভ প্রেম ফল। বঞ্চিত না ভেল পামর সকল॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান। আচণ্ডাল আদি করি তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়। এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয়॥

১১শ পদ। বসন্ত।

জয় জয় শচীর নন্দনবর রঙ্গ।
বিবিধ বিনোদ, কল কত কৌতুক, করতহি প্রেমতরঙ্গ॥ ধ্রু॥
বিপুল পুলককুল, সঞ্চরু সব তনু, নয়নহি আনন্দ নীর।
ভাবহি কহত, জিতল মঝু সখীকুল, শুন শুন গোকুলবীর॥
মৃদু মৃদু হাসি, চলত কত ভঙ্গিম, করে জনু খেলন যন্ত্র।
যুগল কিশোর, বসন্তহি যৈছন, বিতানিত মনসিজ তন্ত্র॥
যো ইহ অপরূপ, বিহরে নবদ্বীপ, জগদানন্দন বিলাসী।
রাধামোহন দাস, মূরছিত সোই, তার নিজগুণ পরকাশি॥

১২শ পদ। বিভাস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় পতিতপাবন। প্রকাশিলা কলিকালে নামসংকীর্ত্তন॥
জয় নিত্যানন্দ জয় অধমতারণ। দয়া বিতরিলে দেখি দীনহীন জন॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্র ভক্তের জীবন। আনিলেন গৌরচন্দ্রে করি আকর্ষণ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পারিষদগণ। অধমে তারিলে এবে তার সঙ্কর্ষণ॥

১৩শ পদ। মঙ্গলরাগ।

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপতরু, অদ্ভুত যাক প্রকাশ।
হিয় অগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান, সুচন্দ্রকিরণে করু নাশ॥

ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এহেন, পতিত হেরি যো পহুঁ, যাচি দেয়ল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরগতি-অগতি, অসতমতি যোজন, নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজনধন, তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোঅল, রোঅত বৈষ্ণব দাস॥

১৪শ পদ। মঙ্গলরাগ।

শ্রীপদকমলসুধারস পানে। শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করু গানে।
শ্রীমুখবচন শ্রবণ ১ অনুষঙ্গী। অনুভবি কত ভেল প্রেমতরঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপ। পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপ॥ ধ্রু॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি। পহুঁক চরণ যুগ সারথি করবি॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ। আশাপাশ যোরি নহ ভঙ্গ॥
লীলা জলধিতীরে চলু ধাই। প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ৩ অবগাই॥
রঙ্গতরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস। রতিমণি দেই পূরব অভিলাষ॥
সো রস-জলধি মাঝে মণি গেহ। তঁহি রহু গোরি সুশ্যামর দেহ॥
সারথি লেই মিলাঅব তায়। গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায়॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, জয় নিত্যানন্দ রায়।
জয় সীতানাথ গৌরভকতগণ, সবে দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত গতি।
করুণা করিয়া স্বচরণে রাখ এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণ ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া ঠায়॥
মনে মন মনোরথ যে কিছু আমার সকল জানহ তুমি।
পূর সব আশ, করি পরকাশ, কি আর কহিব আমি॥

১৬শ পদ। কামোদ।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতীনন্দন পঁহু মঝু জয় বসু জাহ্নবী সেব॥

---

১ সুধারস। ২ ভাব। ৩ রঙ্গে পাঠান্তর।

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখদ শান্তিপুর চন্দ।
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দ কন্দ॥
জয় মালিনীপতি সদয়হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌরভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার॥
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরসসিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ।
আপন করমদোষে বঞ্চিত ভেল দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

১৭শ পদ। সুহই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য * গোরা শচীর দুলাল। এই যে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল।
কেহ কহে জানকীবল্লভ ছিল রাম। কেহ বলে নন্দলাল নবঘনশ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপী প্রেমে ভোরা। ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণনয়ন অনুরাগী। না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমে দেশে দেশে। তবু না পাইল রাধা প্রেমের উদ্দেশে॥†
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী-কিশোরা। স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥‡

১৮শ পদ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে, রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়বিষে, সতত মজিয়া রইনু, মুখে দিলে জ্বলন্ত অঙ্গার॥
হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে।
গৌরকীর্ত্তনরসে, জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ধ্রু॥
এমন দয়াল দাতা, আর না পাইব কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয়, অনলে পড়িনু, নয় সহজেই আঘাত পাইনু॥

১৯শ পদ। পাহিড়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ, পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন, সবারে যাচিঞা দিল, না লইনু মুঞি দুরাচার॥

---

* সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ এই নাম ধারণ করেন।

† "বৈষ্ণবের অবশেষে (মধুর রস) তাহা রৈল পূর্ব্বদেশে (বৃন্দাবনে) প্রভু তার না পাইল উদ্দেশ।" ইতি প্রাচীন পদ।

‡ অন্তরে কিশোরা (কৃষ্ণ) বাহিরে কিশোরী (রাধা) অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত সেই মধুর রস আলোচনায় বিভোর।

আরে পামর মন, মরমে রহল বড় শেল।

সংকীর্ত্তন প্রেম-বাদলে, সব হিয়া ডুবল, মোহে বিধি বঞ্চিত কেল ॥ ধ্রু ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ কল্পতরু-ছায়া পাঞা, সব জীব তাপ পাশরিল।

মুঞি অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া রইনু, হেন যুগে নিস্তার না হৈল ॥

আগুনে পুড়িয়া মরোঁ, জলে পরবেশ করোঁ, বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।

এই মত করি যদি, মরণ না করে বিধি, প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥

এহেন গৌরাঙ্গগুণ, না করিনু শ্রবণ, হায় হায় করি হা হুতাশ।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, মুখ ভরি না লইলাম, জীবন্মৃত গোবিন্দদাস ॥

২০শ পদ। সিন্ধুড়া।

কলি তিমিরাকুল, অখিল লোক দেখি, বদনচাঁদ পরকাশ। *

লোচনে প্রেম সুধারস রবি খয়ে, জগজনতাপবিনাশ ॥

গৌর করুণাসিন্ধু অবতার।

নিজ নাম গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি, জগতে পরাওল হার ॥ ধ্রু ॥

ভকত কলপতরু, অন্তরে অন্তরু, রোপয়ে ঠামহি ঠাম।

তছু পদতলে, অবলম্বন পথিক, পূরয়ে নিজ নিজ কাম ॥ } †

ভাব গজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে, ঐছন পহুঁক বিলাস।

সংসার কালকূট বিষে দগধল একলি গোবিন্দ দাস ॥

২১শ পদ। সিন্ধুড়া, বা, বসন্ত।

পদতলে ভকত-কলপতরু সঞ্চরু, সিঞ্চিত পদ-মকরন্দ।

যা কর ছায় সুরাসুর নরবর পরমানন্দ নিরবন্ধ ॥

পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।

জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল, কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥ ধ্রু ॥

নয়ননীর জনিত মন্দাকিনী, ভুবন ভরল তরঙ্গে।

নিত্যানন্দ চন্দ্র, গৌর দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রসরঙ্গে ॥ ‡

---

* কলিরূপ অন্ধকারে জীব সকলকে আচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বদনরূপ চন্দ্রোদয় হইয়াছে।

† শ্রীগৌরাঙ্গ স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, সংসারমরুর পর্য্যাটকেরা সেই সকল পাদপের ছায়ায় সুশীতল হয়।

‡ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ রূপ চন্দ্র বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেছেন। কি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ভাব।

যা কর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর, চতুরানন করু আশ।
সো পঁহু পতিত কোরে করি কাঁদয়ে, কি কহব গোবিন্দদাস ॥

২২শ পদ। ভাটিয়ারি।

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য, পতিতপাবন যার বাণা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ লইহা এবে, নিজরূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারি।
কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরিনামে জীব রাখি, আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥ ধ্রু ॥
গদাধর আদি যত, মহা মহা ভাগবত, তারা সব গোরাগুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি, হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পূরব গুণ, মূরছয় পুনঃ পুনঃ, পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ কমল কিবা, নখর উজোর শোভা, গোবিন্দদাস সে বঞ্চিত ॥

২৩শ পদ। সুহই।

কলি কবলিত, কলুষ জড়িত, দেখিয়া জীবের দুখ।
করল উদয়, হইয়া সদয়, ছাড়িয়া গোকুলসুখ ॥
দেখ গৌর গুণের নাহি সীমা।
দীনহীন পাঞা, বিলায় যাচিঞা, বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত প্রেমা ॥ ধ্রু ॥
জাতি না বিচারে, আচণ্ডালে তারে, করুণাসাগর গোরা।
ভাব ভরে সদা অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা ॥
ক্ষণে ক্ষণে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥
চরণ কমল, অতি সুকোমল, রাতা উৎপল রীত।
বদন কমলে, গদ গদ স্বরে, গাওয়ে রসময় গীত ॥
হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি, কাঁদে উচ্চ করি, রহি গদাধর কোল ॥
মুরলী মুরলী, ক্ষণে ক্ষণে বলি, স্বরূপ মুখ নেহারে।
গোবিন্দ দাসিয়া, সে ভাব দেখিয়া, তাহা কি কহিতে পারে ॥

২৪শ পদ। কেদার।

প্রেমে ঢল ঢল, গোরা কলেবর, নটন রসে ভেল ভোর।
এ দীন যামিনী, আবেশে অবশ, প্রিয় গদাধর কোর ॥

গোরা পঁহু করুণাময় অবতার।

যো গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত জনে, সবে পাওল নিস্তার॥ ধ্রু॥

হরি হরি বলি, ভুজ যুগ তুলি, পুলকে পূরয়ে তনু।

অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাসয়ে, সুরধুনী ধারা বহে জনু॥

গুপত প্রেমধন, জগভরি বিলাওল, পূরল সবহুক আশ।

সো প্রেমসিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল, পাসরি গোবিন্দ দাস॥

২৫শ পদ। শ্রীরাগ।

পতিতপাবন, প্রভুর চরণ, শরণ লইল যে।

ইহ পরলোকে সুখের সে লীলা, দেখিতে পাওল সে॥

শুন শুন শুন সুজন ভাই, ভাঙ্গল সকল ধন্দ।

মনের আঁধার, সব দূরে গেল, ভাবিতে সে মুখচন্দ॥

সেরূপ লাবণি, সে দিঠি চাহনি, সে মন্দ মধুর হাসি।

সে ভুরুভঙ্গিম, অধর রঙ্গিম, উগরে পীযুষ রাশি॥

সে পদ সুন্দর, নখর চাঁদে, বিলাসে উড়ুরগণে।

বিবিধ বিলাসে, বিনোদ বিলাসী, গোবিন্দদাস সে জানে॥

২৬শ পদ। সুহই।

দেখ ভাই আগম নিগমে।

চৈতন্য নিতাই বিনে দয়ার ঠাকুর নাই, পাপীলোক তাহা নাহি জানে॥ ধ্রু॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর, সত্যযুগের ঈশ্বর, ধ্যান যজ্ঞ পূজা প্রকাশিলা।

সেই বৃন্দাবন চাঁদ, ধরি নটবর ছাঁদ, সে যুগে গোপীরে প্রেম দিলা॥

সেজন গোকুলনাথ, কংশ কেশী কৈলা পাত, যারে কহে যশোদাকুমার।

নবদ্বীপে অবতরি, সেই হৈল গৌর হরি, পাতকীরে করিতে উদ্ধার॥

তাহার অগ্রজনাম, রোহিণীনন্দন রাম, আর যত পারিষদ মিলে।

নিজনাম প্রেমগুণে, পতিত চণ্ডাল জনে, ভাসাইলা প্রেম আঁখি জলে॥

যে মূঢ় পণ্ডিত মানি, পড়ুয়া তার্কিক জানি, পূরবে অসুর হৈয়া ছিল।

দ্বিজ মাধব দাসে বলে, সেই অপরাধ ফলে, এ যুগে বঞ্চিত বুঝি হৈল॥

২৭শ পদ। পাহিড়া।

গৌরলীলা সকলনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥

এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ॥
গৌর গদাধরলীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা॥
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা।

২৮শ পদ। পাহিড়া।

ব্রজ ভূম করি শূন্য, নদীয়ায় অবতীর্ণ, এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর, পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল॥
নাহি শিখি পুচ্ছচূড়া, নাই সেই পীতধড়া, করে নাই সে মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ, সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন, এবে হেরি সুলোচন, নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন, এরূপে ভুলে না মন, তুমি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস, যার নাই বিশ্বাস, সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা, যে হইল উভয় মিলনে॥*

২৯শ পদ। পাহিড়া।

রসে তনু ঢরঢর, গৌরকিশোরবর, এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা, ভক্তি বিনা নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্য নাম, গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান, শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণতনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু, বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু, অদ্ভুত গৌরাঙ্গলীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে, কুঞ্জবন বিলাসিতে, অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়, না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি, গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি, নরহরি করয়ে বিলাপ॥

৩০শ পদ। বিভাষ।

গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাইত কে?
মধুর বৃন্দা-বিপিন মাধুরি প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার?

* মহাপ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলনে।

গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভবসাগরে, এমন দয়াল, না দেখি যে একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥

৩১শ পদ। বিভাস।

জয় জগন্নাথ শচীনন্দন গৌরাঙ্গ পহুঁ জয় নিত্যানন্দ প্রেমধাম।
জগত দুঃখিত দেখি, হৈয়া সকরুণ আঁখি, উদ্ধারিলা দিয়া হরিনাম ॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজকুলে অবতরি, সংকীর্ত্তন করিলা প্রচার।
ধন্য সুরধুনীতীরে, ধন্য নবদ্বীপপুরে, সাঙ্গোপাঙ্গ করিলা বিহার ॥
এমন করুণাসিন্ধু, শ্রীচৈতন্য প্রাণবন্ধু, পাপী পাষণ্ডী নাহি জানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণ গানে ॥

৩২শ পদ। শ্রীরাগ।

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস, গেল না তিয়াস, আপন করম ফেরে ॥
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃতফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে ॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা।
ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা ॥

৩৩শ পদ। পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া প্রভু কেন বা অবনী। কালরূপ কেন হৈল গোরাবরণ খানি ॥
হাস বিলাস ছাড়ি "কেন পহুঁ"১ কাঁদে। না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেমফাঁদে।
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি "কাঁপে"২ ঘনঘন। খনে সখী সখী বলি করয়ে রোদন ॥
মথুরা মথুরা বলি করয় বিলাপ। ক্ষণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ ॥
ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিয়ে চাঁদ চন্দন। "ধূলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ ॥"৩

---

(১) গোরা কেন। (২) কাঁদে। (৩) হেরইতে ঐছন লাগয়ে দহন।

ছার পরাণ কুলবতীর না যায়। কহিতে আকুল পহুঁ ধূলায় লোটায় ॥
গদাধর কাঁদে "প্রাণনাথ লৈয়া"৪ কোলে। রায় রামানন্দ কাঁদে প্রণয়৫ বিকলে ॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে সোঙরি৬ বিলাস। না বুঝিয়া কাঁদে নয়নানন্দ দাস ॥ *

৩৪শ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই চৈতন্য দোঁহে বড় অবতার। এমন দয়াল দাতা না হইবে আর ॥
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত। করুণাময় উদ্ধার করিলা কতশত ॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল। হায়রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল ॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে। হেন অবতার ভাই না হয় কখনে ॥
হেন প্রভুর পাদপদ্ম না করি ভজন। হাতে তুলি মুখে বিষ করিনু ভক্ষণ ॥
গৌর-কীর্ত্তন-রসে জগত ডুবিল। হায় রে অভাগার বিন্দু পরশ নহিল ॥
কাঁদে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ করে। ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেন নাহি মরে ॥

৩৫শ পদ। ধানশী।

আরে রে নিন্দুক ভাই, তোর কিরে বোধ নাই, বৃথাই ধরিলা দোন আঁখি।
সব অবতারসার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার, তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি ॥
সুরাপান অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার, তন্ত্রধর্ম্মে ভারত ব্যাপিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি, জীব সবে পূজিতে লাগিল ॥
দেখিয়া জীবের দৈন্য, প্রভু মোর শ্রীচৈতন্য, নবদ্বীপে প্রকট হইলা।
তারক ব্রহ্ম হরিনাম, যাচি সবে করি দান, ধর্ম্মের সে গ্লানি ঘুচাইলা ॥
জগাই মাধাই আদি, দুষ্কৃতের নিরবধি, হরিনামে করিলা উদ্ধার।
ব্রাহ্মণ যবনে মিলি, করাইলা কোলাকুলি, পরতেকে দেখ একবার ॥
নাস্তিকে করিলা ভক্ত, পঙ্গে কৈলা গতিশক্ত, অন্ধের করিলা চক্ষুদান।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, নহিলে ইথে বিশ্বাস, তোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥

৩৬শ পদ। সুহই।

শান্তিপুরের বুড়ামালী, বৈকুণ্ঠ বাগান খালি করিয়া আনিল এক চারা।
নিতাই মালীরে পাঞা, চারা তার হাতে দিয়া, যতনে রোপিতে কৈল "নাড়া" ॥
নদীয়া উত্তম স্থান, তাহাতে করি উদ্যান, রোপিল চৈতন্য-তরু মালী।
বাড়ে তরু দিনে দিনে, শাখাপত্র অগণনে, গজাইল যত্নে জল ঢালি ॥

---

(৪) গৌরাঙ্গ করি। (৫) প্রবোধ। (৬) বলিয়া, বা বুঝিয়া—ইতি পাঠান্তর।

* প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে মৎপ্রচারিত গোবিন্দদাসের পদাবলী মধ্যে এই পদটী প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইহার ভণিতা ছিল "না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দ দাস।" পদকল্পতরুর মতে নয়নানন্দ দাসের পদ বলিয়া গৃহীত হইল।

পাইয়া ভকতি-জল, নামপ্রেম দুইফল, প্রসবিল সে তরু সুন্দর।
সেই দুই ফলের আশে, জীব-পাখী নিত্য আসে, কোলাহল করে নিরন্তর॥
আনন্দে নিতাই মালী, লইয়া মাথায় ডালি, দুইফল সবারে বিলায়।
নাই জাতি ভেদাভেদ, সবার মিটিল খেদ, ফলাস্বাদ সকলেতে পায়॥
ধর লও লও বলি, আনন্দে নিতাই মালী, আচণ্ডালে ফল বিলাইল।
যেই চায় সেই পায়, যে না চাহে সেও পায়, যবনেও ফল আস্বাদিল॥
কি মোর করম ফেরে, না হেরিনু সে তরুরে, না চিনিনু সে মালী দয়াল।
কৃষ্ণদাস দুরাশয়, দন্তে তৃণ ধরি কয়, ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল॥

৩৭শ পদ। ধানশী বা কামোদ।

কীর্ত্তন রসময়, আগম অগোচর, কেবল আনন্দকন্দ।
অখিল লোকগতি, ভকতপ্রাণপতি, জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ॥
হেরি পতিতগণ, করুণাবলোকন, জগভরি করল অপার।
ভব-ভয়-ভঞ্জন, দুরিত-নিবারণ, ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার॥
হরিসংকীর্ত্তনে মজিল জগজন, সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদ সার, প্রেম সুধাধার, দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন মঙ্গল, নামপ্রেমবলে, দূর গেল কলি আঁধিয়ার।
শমনভবনপথ, সবে এক রোধল, বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার॥

৩৮শ পদ। বালা।

শ্যামের গৌরবরণ এক দেহ। পামরজন ইথে করই সন্দেহ॥
সৌরভে আগোর মূরতি রস সার। পাকল ভেল যৈছে ফল সহকার॥
গোপজনম পুনঃ দ্বিজ অবতার। নিগম না পায়ই নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করল হরিনাম বাথান। নারী পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন॥
করি গৌরচরণ-কমল-মধুপান। সরস সঙ্গীত মাধবী দাস ভাণ॥ *

৩৯শ পদ। সুহই।

পূর্ব্বে যেই গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায়, দণ্ডকুমণ্ডলু তায়, কটীতটে এ ডোর কৌপিন॥
অধরে মুরলী পূরি, ব্রজবধূর মন চুরি, করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়নকটাক্ষবাণে, মরমে পশিয়া হানে, সে মারণে বহে অশ্রুধার॥

---

* পদকল্পতরুতে শেষ পদদ্বয় এইরূপ :—শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহ কবিশেখর পা[illegible]
নাহি আর।

যমুনার বনে বনে, গোধন রাখাল সনে, নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাহি জানি সেহ এবে, কি জানি কাহার ভাবে, বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ, দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ, বিরহ অনলে জরি জরি।
এ শিবানন্দের হিয়া, গড়িল পাষাণ দিয়া, নাদরবে সে সুখ সোঙরি॥

৪০শ পদ। কামোদ।

গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতিরস, আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল, বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরা বড় পতিতপাবন॥ ধ্রু।
হেম জলদ কিয়ে, প্রেম সরোবর, করুণাসিন্ধু অবতার।
পাইয়া যেজন না হয় শীতল, কি জানি কেমন মন তার॥
ভবতরিবারে হরি-নাম-মন্ত্র ভেলা করি, আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কেবা উদ্ধারিবে তারে, পরমানন্দের পরিহার॥

৪১শ পদ। সুহই।

কে গো অই গৌরবরণ, বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন, চিন চিন চিন যেন করি।
ই না সে নন্দের গোপাল, যশোদার জীবন দুলাল, আইল্প করি গোপীর মনচুরি।
শিরে ছিল মোহন-চূড়া, এবে মাথা কৈল্প নেড়া, কৌপিন পরিল ধড়া ছাড়ি।
গোপীমন-মোহনের তরে, মোহনবাঁশী ছিল্প করে, এবে সে হইল দণ্ডধারী॥
নীপতরু-মূলে গিয়া, অধরে মুরলী লৈয়া, রাধানাম করিত সাধন।
এবে সুরধুনী-তীরে, বাহু দুটী উচ্চ ক'রে, সদাই করয়ে সংকীর্ত্তন॥
নবীন নাগর সাজে, গোপীসহ কুঞ্জমাঝে, করিত যে বিবিধ বিলাস।
এবে পারিষদ সঙ্গে নাম যাচে দীনবেশে, সেই এই কহে কানুদাস॥

৪২শ পদ। কেদার।

দেখ দেখ সই মুরতিময় লেহ।
কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম, নয়নচষক ভরি লেহ॥ ধ্রু॥
শ্যামবরণ মধুরস ঔষধি পূরবে গোকুল সাহ।
উপজল জগত যুবতী উনমতায়ল, যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রসবরজ গোরিকুচমণ্ডল বর করি রাখি।
তে ভেল গৌর, গৌড় এবে আওল, প্রকট প্রেমসুর শাখী॥

সকল ভুবনসুখ কীর্ত্তন সমপদ মত্ত রহল দিন রাতি।
ভবদব লোকন কোন কলিকল্মষ যাহা হরিবল্লভ ভাঁতি ॥

৪৩শ পদ। সুহই।

শ্যামের তনু অব গৌরবরণ।
গোকুল ছোড়ি অব, নদীয়া আওল, বংশী ছোড়ি কীরতন ॥ ধ্রু ॥
কালিন্দীতট ছোড়ি, সুর-সরিত্‌তটে, অবহুঁ করত বিলাস।
অরুণবরণ ডোরকৌপিন অব, ছোড়ি পীতধড়া বাস ॥
বামে নহত অব রাই সুধামুখী, ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে।
গদাধর পণ্ডিত, ফিরত বামে অব, সদা সঙ্গে ভকত বিহরে ॥
ছোড়ি মোহনচূড়া, শিরে শিখা রাখল, মুখে কহত বারা বাবা।
কহ হরিবল্লভ, তেরছ চাহনি ছোড়ি, দুনয়নে গলত ধারা ॥

৪৪শ পদ। শ্রীরাগ।

প্রথমে বন্দিয়া গাহ গৌরাঙ্গ গোসাঞী। অদ্বৈত নিত্যানন্দ বিনে আর গতি নাই
করুণানয়নকোণে একবার দেখ। আপন জনের জন করি মোরে লিখ ॥
পায় ধরি, দয়া করি, তারে হেন নাই। পরিহার পতিত দেখিয়ে সব ঠাঁই ॥
যেবা জন পণ করি লইল শরণ। স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন ॥
দয়াময় কথা কয় হেন কেবা আছে। মুঞি পাপী নিবেদিয়া কয় পহুঁ পাছে ॥
দাঁতে ঘাস করো আশয় মোর হ'য়ে। বল্লভ দাসিয়া কয় বৈষ্ণবের পায়ে ॥

৪৫শ পদ। ধানশী।

চৈতন্য কল্পতরু, অদ্বৈত যে শাখাগুরু, কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধুলোভে অনুক্ষণ, হরি বলি ফিরে চারিপাশ ॥
গদাধর মহাপাত্র, শীতল অভয় ছত্র, গোলোক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত, প্রেম বিনু তাপিত, তার তলে বসিয়া জুড়ায় ॥
নিত্যানন্দ নাম ফল, প্রেমরসে ঢল ঢল, খাইতে অধিক লাগে মিঠ।
শ্রীশুকদেবের মনে, মরম ফলের জানে, উদ্ধব দাস তার কীট ॥

৪৬শ পদ। বিভাস।

বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলং। খণ্ডিতকলিযুগজনমলসমলং।
সৌরভকর্ষিতনিজজনমধুপং। করুণাখণ্ডিতবিরহবিতাপং ॥

নাশিতহৃদ্গতমায়াতিমিরং। বরনিজ কান্ত্যা জগতামচিরং ॥
সততবিরাজিতং নিরুপমশোভং। রাধামোহনকলিতবিলোভং ॥

৪৭শ পদ। গান্ধার।

পূরবে বাঁধল চূড়া এবে কেশহীন। নটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌপিন ॥
গাভী-দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে। করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে ॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী। কলিযুগে দণ্ডধারী হইলা সন্ন্যাসী ॥
বলরাম কহে শুন নদীয়ানিবাসী। বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী ॥ *

৪৮শ পদ। কেদার।

গোপীগণ-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত, অরুণ বসন শোভে অঙ্গে।
কাঞ্চনকান্তি-বিনিন্দিত কলেবর, রাই পরশ রস রঙ্গে ॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরবিলাস।
লাখ যুবতী রতি যো গুরু লম্পট, সো অব করল সন্ন্যাস ॥ ধ্রু ॥
যো ব্রজ-বধূগণ, দৃঢ়ভুজ-বন্ধন, অবিরত রহত আগোর।
সো তনু পুলকে পুরিত অব ঢর ঢর, নয়ানে গলয়ে প্রেমলোর ॥
যো নটবর ঘনশ্যাম কলেবর, বৃন্দাবিপিন-বিহারী।
কহয়ে বলরাম নটবর সো অব, অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেমভিখারী ॥

৪৯শ পদ। বরাড়ী।

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়া। কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা ॥ ধ্রু ॥
পীতবসন ছাড়ি, ডোরকৌপিন পরি, বাকুয়া করিলা দণ্ড।
কালিন্দীর তীরে, সুখ পরিহরি, সিন্ধুতীরে পরচণ্ড ॥
রাম অবতার, ধনুক ধরিয়া, গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি, করুণা করিয়া, দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী ॥
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ, সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয়, সন্ন্যাসীর বেশ নয়, পাষণ্ডদলন বীরবানা ॥

৫০শত পদ। সিন্ধুড়া।

রূপ-কোটি-কাম জিনি, বিদগধ শিরোমণি, গোলোকে বিহরে কুতূহলে।
ব্রজরাজ-নন্দন, গোপিকার প্রাণধন, কি লাগি লোটায় ভূমিতলে ॥

---

* একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই পদটি বাসুঘোষের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতেও তাই।

হরি হরি ! কি শেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ, কাঁদে সংকীর্ত্তন-মাঝ, না বুঝিয়া মনু মনোদুখে॥ ধ্রু।
সঙ্গে বিলসিত যার, রাধা চন্দ্রাবলী আর, কত শত বরজকিশোরী।
এবে পহুঁ বুকে বুক, না দেখেন নারীমুখ, কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী॥
ছাড়ি নাগরালিবেশ, ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ, পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজগুণে, উদ্ধারিলা জগজ্জনে, বলরাম দাস বহুদূরে॥

৫১শ পদ। শ্রীরাগ।

হরি হরি ! এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর, পূর্ব্বে যাঁর কলেবর. সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥ ধ্রু॥
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবেড়া, মনোহর যাঁর চূড়া, সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।
যাঁর বাঁকা চাহনিতে, মোহে.রাধিকার চিতে, এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি॥
সদা গোপী সঙ্গে রহে, নানা রঙ্গে কথা কহে, এবে নারীনাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি, আকর্ষয়ে ব্রজনারী, সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে॥
পিঙ্গল পাটের ধুতি, শোভা করে যাঁর কটি, তাহে কেন অরুণ বসন।
না পাইয়া ভাবের ওর, বলরাম দাসে ভোর, বিষাদ ভাবয়ে মনে মন॥

৫২শ পদ। সিন্ধুড়া।

নটবর রসিকা রমণী-মনোমোহন কতশত রস বিলাস।
শ্যামবরণ পর, গৌর কলেবর, অখিল ভুবন পরকাশ॥
দেখ দেখ অদভুত পহুঁক বিলাস।
রঙ্গিনী-সঙ্গ রঙ্গরস রঙ্গিত হেন জন করিল সন্ন্যাস॥ ধ্রু॥
নায়রী কুচতট কুঙ্কুম মণ্ডিত বসন বেশ ধরত সাধে।
গোরীক গোরী-বদন-বিধু-চুম্বন হৃদয় গহন উনমাদে॥
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গম পুলকিত অতিশয় সাধে।
মনসিজজ্বর সময়ে পরাভব অন্তরে অতি করই বিষাদে॥
মরকত-বরণ রতন-মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস।
লম্পট গুরুবর কোন সিদ্ধি সাধয়ে না বুঝই বলরাম দাস॥

৫৩শ পদ। শ্রীরাগ।

শচীর নন্দন জগজীবনসার।
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥ ধ্রু॥

আসিয়া গোলোকনাথ, পারিষদগণ সাথ, নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈঞা।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম, নিজ সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম, বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া॥
ধরি রূপ হেম গৌর, পরিলা কৌপিন ডোর, অরুণকিরণ বহির্ব্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড, ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র, ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া-অভিলাষ॥
অখিলের গুরু হরি, ভারতীরে গুরু করি, মন্ত্র নাম করিলা গ্রহণ।
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল, বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল, ভজিল বলিয়া নারায়ণ॥
যাইয়া উৎকল দেশে, নাম কৈলা উপদেশে, ষড়্ভুজ করিয়া প্রকাশ।
অনন্ত আচার্য্যে কয়, সঙ্গে সব মহাশয়, লৈয়া কৈলা নীলাচলে বাস॥

৫৪শ পদ। সুহই।

অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি, বঙ্গ সন্ন্যাসিচূড়ামণি।
সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ কন্দ, মুকুতির দেখাইল সরণী॥
সুধন্য নদীয়া গ্রাম, যাহাতে চৈতন্য নাম, জম্বুদ্বীপসার নবদ্বীপ।
কলি ঘোর অন্ধকারে, চৈতন্য যে নাম ধরে, প্রকাশিত হরি জন্মদ্বীপ॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর, ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির অংশ, ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥
সার্ব্বভৌম সান্দীপনি, ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, ষড়্ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।
প্রেমভরে কল্পতরু, অখিল তন্ত্রের গুরু, গুরু কৈলা কেশব ভারতী॥
কপটে সন্ন্যাস বেশ, ভ্রমিলা অশেষ দেশ, সঙ্গে পারিষদ পূর্ণশালী।
রামকৃষ্ণ গদাধর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর, মুকুন্দ মুরারি বনমালী॥
সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর, ভুবনলোচন চৌর, ডোর-কৌপীন-দণ্ডধারী।
কপটে লোচন চোর, গলে দোলে নাম ডোর, সতত বোলান হরি হরি॥
কৃপাময় অবতার, কলিযুগে কেবা আর, পাষণ্ডদলন বীর বানা।
জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপের নিধি, হরি ভজে দৃঢ় করি মনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫৫শ পদ। শ্রীরাগ।

বলী কলিকাল ভুজগাধিপ বলে বলে কবল কয়ল সব দেশ।
অহর্নিশি বিষয়-বিষম-বিষ পরবশ ন পরশ ভুজগ-দমন-রসলেশ॥
জয় জয় সদয় হৃদয়-অবতার।
দুরগত দেখি অবনীতলে অবতরু হরইতে ভুবি ভুবনতর ভার॥ ধ্রু॥

দরশনদানে হরিত দশ দশনখদংশনদাহ দূরে বিনি আর।
শীতল সুলেহ মেহ সব বিতরণে উলসিত ভোগেল অখিল সংসার ॥
ভূভার-হরণে ফুকরি সব পরিকর করু হরিনাম মন্ত্র পরচার।
নিজ নিজ কেতনে সবে ভেল চেতন অচেতন জগতে জগতে দুরাচার ॥

৫৬শ পদ। শ্রীরাগ।

পাপে পূরল পৃথিবী পরিসর পেখি পরম দয়াল।
প্রেমপয় পরিপূর্ণ পয়োনিধি প্রকট প্রণতপাল ॥
পঁহু পতিতপাবন নাম।
পশুপ প্রেয়সী পীরিতি পররস প্রণয় পীযূষ ধাম ॥ ধ্রু ॥
প্রণতপালক পদবী পালই পূরব পরিকর মেলি।
প্রচুর পাতকিপাপ পরিহরি পাদ পরিণত কেলি ॥
পূজই পশুপতি পদ্ম আসন পাদ-পঙ্কজ-দ্বন্দ্ব।
পর পঙ্ক পথে পড়ি পেখি না পেখল জগদানন্দ অন্ধ ॥

৫৭শ পদ। ধানশী।

করজোড়ে নবদ্বীপে বন্দিব নিমাই। অধমজনার বন্ধু তিঁহ বিনু নাই ॥
অদ্বৈত গোসাঞী বন্দিব সাবধানে। প্রকাশিলা যেহ হরি নাম দয়াবানে ॥
বন্দো বীরভদ্রপিতা নিত্যানন্দ নাম। প্রেম হেন দানে যেই পূর্ণ কৈলা কাম ॥
বন্দো রূপ সনাতন রায় রামানন্দ। সারঙ্গ গোসাঞী বন্দো পরম সানন্দ ॥
সার্ব্বভৌম বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ। প্রভুর সহিত যাঁর হৈল বদাবদ ॥
ষড়ভুজ দেখাঞা প্রভু দিলা দরশন। গোপাল বলে প্রবোধ হৈল সার্ব্বভৌম মন

৫৮শ পদ। যথা রাগ।

অগেয়ান-ধ্বান্ত দুরন্ত নিমগন, অখিল লোক নেহারি।
কোন বিহি নবদ্বীপ দেওল, উজার দীপক জারি ॥
সব দিগ দরশন ভেল।
কিরণে ঝলমল, বাহির অন্তর, তিমির সব দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
কুপথ পরিহরি, সাধুপন্থক পথিক পরিচয় রঙ্গ ॥
নাম-হেমক দাম পহিরল প্রেমমণিখনি সঙ্গ ॥
দুলহ সম্পদে দীন দুরগত, জগত ভরি পরিপূর।
জনম আঁধল, একলি রহু হাস, জগত বাহির দূর ॥

৫৯তম পদ। যথা রাগ।

নরহরি নাম অন্তরে অছু ভাবহ হবে ভবসাগরে পার।
ধর রে শ্রবণে নর হরিনাম সাদরে চিন্তামণি উহ সার॥
যদি কৃতপাপী আদরে কভু মন্ত্রকরাজ শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বল্যে হয়তছু দুর্গম পাপতাপ সহ ত্রাণ॥
করহ গৌর গুরু, বৈষ্ণব আশ্রয় লহ, নরহরি নাম হার।
সংসারে নাম লই সুকৃতি হইয়তে রে আপামর দুরাচার॥
ইথে কৃত বিষয় তৃষ্ণ পঁহু নামহারা যো ধারণে শ্রম তার।
কুতৃষ্ণ-জগদানন্দ কৃত কল্মষ কুমতি রহল কারাগার॥

৬০তম পদ। যথা রাগ।

এমন শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাণে?
শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর?
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা, প্রবেশ হইত কার?
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য্য, রস যশ চমৎকার?
তার অনুভব সাত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার?
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কার অবগতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি।
বিধি-অগোচর যে প্রেমবিকার, প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

৬১তম পদ। সুহই।

ব্রহ্ম আত্ম ভগবান্, যাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গান, দেব-দেবীর চরণবন্দন।
যোগী যতি সদা ধ্যায়, তবু যাঁরে নাহি পায়, বন্দো সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্বধর্ম্ম-সংস্থাপন, সাধুত্রাণ পাষণ্ডদলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী-জগন্নাথ-ঘরে, নবদ্বীপে লভিল জনম॥

৬২তম পদ। কৌ।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র। জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥

জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি। জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসি-ভক্তগণ। জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ॥
নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন গাইল কৃষ্ণদাস॥

৬৩ পদ। সুহই।

বিশ্বম্ভরচরণে আমার নমস্কার। নবঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার॥
শচীর নন্দনপায়ে মোর নমস্কার। নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাসশিষ্যপায়ে মোর নমস্কার। বনমালা করে দধি ওদন যাঁহার॥
জগন্নাথপুত্রপায়ে মোর নমস্কার। কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দের কুমার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর। তোমার চরণযুগে গঙ্গাতীর্থবর॥
জানকী-জীবন তুমি তুমি নরসিংহ। অজ-ভব-আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ। তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত-জীবন। তুমি নীলাচলচন্দ্র জগত-কারণ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ। আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল। আজি মোর উদয় হইল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার। আজি সে বসতি ধন্য হৈল নদীয়ার॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা। তাহা দেখি যাঁহার চরণ সেবে রমা॥
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস। চৈতন্যবন্দনা গায় বৃন্দাবনদাস॥

৬৪ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় ভকতবচনসত্যকারী। জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারি॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা পতিমনোরম। জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভবিভূষণ॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন। জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন। তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি রক্ষ-কুলহন্তা জানকীজীবন। তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা-মোচন॥
তুমি সে প্রহলাদ লাগি হৈলা অবতার। হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যাঁর॥

সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজনকারী নীলাচল মাঝ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৫ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় আদি হেতু জয় জনক সবার। জয় জয় সংকীর্ত্তনারম্ভ অবতার॥
জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধুজন প্রাণ। জয় জয় আব্রহ্মস্তম্বের মূল স্থান॥
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু। জয় জয় পরম শরণ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী। জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসি॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি তত্ত্ব। জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধসত্ত্ব॥
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ। জয় বেদ ধর্ম্ম আদি সবার জীবন॥
জয় জয় অজামিল পতিতপাবন। জয় জয় পূতনা দুষ্কৃতি-বিমোচন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৬ পদ। গুর্জ্জরী।

ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বদেবনাথ। মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারী কৃপাসিন্ধু। ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত। ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারী। ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন লম্পটমুরারি॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্বগুণ নাম। ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমলগুণধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজভব বন্দ্য শ্রীচরণ। ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু। এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৭ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর। জয় জগন্নাথ প্রভু মহা মহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র। জয় জয় শ্রীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার। জয় জয় সংকীর্ত্তন হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধু বিপ্রপাল। জয় জয় অভক্ত শমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব সত্যময় কলেবর। জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর॥
জয় জয় মহা মহেশ্বর গৌরচন্দ্র। জয় জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব্বপ্রাণ। কৃপাদৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌর সুন্দর। জয় শচী জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ। জয় জয় সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বিধান॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ। জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৮ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় দ্বিজকুলদীপ গৌরচন্দ্র। জয় জয় ভক্তগোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ॥
জয় জয় শ্রীগোপাল গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ন দ্বিজরাজ। জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন। জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর প্রাণধন॥
জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর। জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর॥
জয় জয় ভক্তরক্ষা হেতু অবতার। জয় সর্ব্বকাল সত্য কীর্ত্তন বিহার॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহাধীর। জয় সংকীর্ত্তনময় সুন্দর শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ। জয় গদাধর অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ প্রিয় অতিশয়। জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রিয়বন্ধু নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(গৌরাবতারের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য)

১ম পদ। কামোদ।

কলিযুগ মত্ত মতঙ্গজ মরদনে১ কুমতি করিণী দূরে গেল।
পামর দুরগত,২ নাম মোতিম শত, দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর গিরিকন্দরে উঅল কেশরীরাজ॥ ধ্রু॥

---

(১) মতঙ্গ গরজনে।
(২) দুরজন।

সংকীর্ত্তন ঘন,১ হুঙ্কৃতি শুনাইতে, দুরিত দ্বীপিগণ ভাগ।
ভয়ে আকুল, অণিমাদি মৃগীকুল, পুনবত গরব২ তেয়াগ॥
ত্যাগ যাগ যম, তিরিথি বরত সম, শশ জাম্বুকী জরিজাতি।
বলরাম দাস* কহ, অতএ সে জপমাহ, হরি হরি শবদ থেয়াতি॥

২য় পদ। কামোদ।

শচীসুত গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি, করিলেন বিবিধ বিলাস।
সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সংকীর্ত্তন, বাঢ়াইলা সবার উল্লাস॥
কিবা সে সন্ন্যাস বেশে, ভ্রমি প্রভু দেশে দেশে, নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি, না জানি দিবারাতি, সে প্রেমে জগত মাতাইলা॥
নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত গুণের ধাম, গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি, কেহ না ধরয়ে ধৃতি, প্রেমায় বিহ্বল অবিরত॥
দেবের দুর্ল্লভ রত্ন, মিলাইলা করি যত্ন, কৃপার বালাই লৈয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য, যশ গায় দাস নরহরি॥

৩য় পদ। ধানশী।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
পুন গিরিধারণ, পূরব নীলাক্রম, নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥ ধ্রু॥
শুদ্ধভক্তি৩ গোবর্দ্ধন, পূজা কর জগজ্জন, এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ৪ কল্পতরুময় অঙ্গ, পঞ্চরস ফলে৫ তাহা সাজে॥
পুলক অঙ্কুর শোভা, অশ্রু জনমনোলোভা, মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর।৬
নিজেন্দ্রিয় উপচারে, পূজ সেই গিরিবরে, প্রেমমণি পাবে ইষ্ট বর॥
দেখিয়া লোকের গতি, কলি-যুগ-সুরপতি, কোপে তনু কম্পিত হইল॥
অধরম ঐরাবতে, কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে, সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥

---

(১) বল। (২) সবভীতিকরল।

* গ্রন্থান্তরে রায় অনন্ত।

(৩) শুদ্ধভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন।

(৪) শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সাম্য, আত্মনিবেদন। মতান্তরে সখ্যস্থলে ধ্যান, অর্চ্চনাস্থলে পূজন এই নবধা বিষ্ণুভক্তি।

(৫) শান্ত, দাস্য, সাম্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চরস।

(৬) স্তম্ভ, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বৈবর্ণ, বেপথু, অশ্রু ও স্বরভঙ্গ এই অষ্ট সাত্বিকভাব।

কামমেঘ-বরিষণে, ক্রোধবজ্র-নিক্ষেপণে, লোকের হইল বড় ডর।
লোভমোহ-শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি খরবাতে, ধৈর্য্যধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥
জানিয়া জীবের দায়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়, উপায় চিন্তিল মনে মনে।
ভক্তভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার, ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে॥
তাঁহার আশ্রয়ে লোক, পাসরিল দুঃখশোক, কলিভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলিদেবরাজ, পেয়ে পরাভব লাজ, স্তুতি করে চরণকমলে॥
অপরাধ ক্ষমাইয়া, কহে কিছু দীন হৈয়া, যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায়, তাহে মোর নাহি দায়, এই সত্য করিনু নিশ্চয়॥
প্রভু তাহে দয়া কৈল, ধন্য কলি নাম হৈল, অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসারে।
চৈতন্যদাসেতে বলে, গোবর্দ্ধন লীলাছলে, যুগে যুগে জীবের উদ্ধারে॥*

---

* পদকর্ত্তা অতি আশ্চর্য্যরূপে গোবর্দ্ধনলীলার রূপকচ্ছলে মহাপ্রভুর পাতকি-উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে রূপকটী এই:—মহাপ্রভু জীবগণকে কহিলেন, আর ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী দেবতার পূজা করিতে হইবে না। ভগবানের মাধুর্য্যের উপাসনা ভিন্ন উদ্ধারের উপায় নাই। শ্রবণাদি নবধা অঙ্গে ও শান্তদাস্যাদিরূপ পঞ্চফলে, সাত্ত্বিকভাবাদি উপকরণে, স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম বলিদানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিরূপ গোবর্দ্ধনগিরির পূজা কর; অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির পথই ভগবান প্রাপ্তির একমাত্র পথ। ঐ গিরির পূজা করিলে প্রেমমণিরূপ ইষ্ট-বর লাভ করিবে। ইহাতে কলিরূপ ইন্দ্র কুপিত হইয়া কুমতিরূপা শচীসহ অধর্ম্মরূপ ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক কামরূপ মেঘবর্ষণ, ক্রোধরূপ বজ্রনিক্ষেপ ও লোভরূপ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মদমাৎসর্য্যারূপ প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। তাহাতে লোকের ধৈর্য্যরূপ ধর্ম্ম উড়িয়া যাইতে অর্থাৎ বিদূরিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কলির প্রভাবে ষড়রিপুর প্রাবল্যে লোকের ধর্ম্মচ্যুতি হইতে লাগিল। জীবের দুর্গতি দেখিয়া ভগবান্ চৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রচার করিয়া জীব সকলকে রক্ষা করিলেন। জীব ভক্তি-শৈলের আশ্রয়ে নিরাপদ হইল; অর্থাৎ ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া নিষ্পাপ হইল। কলি-ইন্দ্র পরাভূত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, "যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ গান করিবে, তাহার উপর আমার অধিকার থাকিবে না।" তখন মহাপ্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে "ধন্য কলি" উপাধি প্রদান করিলেন। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন কেন? উত্তর, তিনি নররূপে যখন অবতীর্ণ, তখন সামান্য মানবের ন্যায় আচরণ করিয়া ভক্তি শিক্ষা দানই তাঁহার পক্ষে উচিত। কারণ, নিজে ভক্ত না হইলে, সুচারুরূপে অন্যকে ভক্তির সাধন শিক্ষা দেওয়া যায় না; এই জন্যই চরিতামৃতকার কহিয়াছেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" কলিকে ধন্য বলিবার তাৎপর্য্য কি? কারণ, নামগ্রহণরূপ সহজ সাধন কেবল এই কলিকালের অল্পপ্রাণ জীবের জন্য। একবার বদন ভরিয়া "হরে কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ কর, আর শমনের ভয় থাকিবে না।

৪র্থ পদ। যথা রাগ।

এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি, হয়েছে হেন প্রেম পরচার ॥ ধ্রু।
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল যাচিঞা যে ঘরে ঘরে ॥
ভব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যে দুর্লভ প্রেম, জগত ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া, বাজাইল করতালি ॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল মোর ॥

৫ম পদ। বরাড়ী।

অনুপম গোরা অবতার।
নবধা ভকতি রসে, বিস্তারিয়া সব দেশে, না করিল জাতির বিচার ॥ ধ্রু।
এমন ঠাকুর ভজ, দূর কর সব কাজ, ছাড় সব মিছা অভিলাষ।
চৈতন্যচাঁদের গুণে, আলো করে ত্রিভুবনে, অনায়াসে হৈল পরকাশ ॥
চৈতন্য কল্পতরু, অখিলজীবের গুরু, গোলক বৈভব সব সঙ্গে।
জীবেরে মলিন দেখি, হইয়া করুণ-আঁখি, হরিনাম বিলাইল রঙ্গে ॥
যজ্ঞ জপ ধ্যান পূজা, অন্য যুগে যত পূজা, সাধিলেক অতি বড় দুখে।
এই যে কলির ঘোরে, নরে যত পাপ করে, নাম লৈঞা তরি যায় সুখে ॥
করুণা বিগ্রহ সার, তুলনা কি দিব আর, পতিতের পূরাইল আশ।
কিছু না বুঝিয়া চিত্তে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে, গুণ গায় নরহরি দাস ॥

৬ষ্ঠ পদ। ধানশ্রী।

গৌরাঙ্গ কে জানে মহিমা তোমার ॥
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার ॥ ধ্রু ॥

জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। আহা! "একবার হরিনামে কর পাপ হরয়। পাপীর কি সাধ্য বল তত পাপ করে?" সুতরাং কলিকাল যথার্থই ধন্য কলির জীবও ধন্য।

শ্যাম-মহোদধি কেমনে বিধাতা, মথিয়া সে করতাল।
কত সুধারস তাহে নিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল॥
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল, গৌরপ্রেম-বরিষণে।
দীন হীন জন, ও রসে মগন, নরহরি গুণগানে॥

৭ম পদ। বিভাস।

পাশরা না যায় আমার গোরাচাঁদের লীলা।
যার গুণে পশুপাখী ঝুরয়ে, গলিয়া পড়য় শিলা॥ ধ্রু॥
যাহার নামের লাগি, মহেশ হইলা যোগী, বিরিঞ্চি ভাবয়ে অনুক্ষণে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নাম, সুলভ করিয়া পহুঁ, যাচিঞা দেওল ত্রিভুবনে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গে শোভে, পুলক কদম্ব তাহে, অপরূপ শ্রীঅঙ্গের শোভা।
আনন্দে বিভোর অতি, নরহরি দাস তথি, দেখিয়া সে কনকের আভা॥*

৮ম পদ। গান্ধার।

গোরা মোর শুধই কাঁচা সোণা।
যতনে করহ লাভ, ধনী হইবার যার মরমেতে আছয়ে বাসনা॥ ধ্রু॥
হেন নিকষিত হেম, ভুবনে না মিলে আর, অতুলন গোরা দ্বিজমণি।
সাতটী রাজার ধন, একেক মাণিক নাকি, এ মাণিকের মূল্য নাহি জানি॥
গোলোক বৈকুণ্ঠপুরে, এ ধন গোপন ছিল, শ্রীরাধার প্রেমকোটরায়।
জীবের নিস্তার হেতু, শান্তিপুরনাথ তাহে, হুঙ্কারে আনিল নদীয়ায়॥
নরহরি দাস ভণে, জীবের কপাল গুণে, হইল গৌরাঙ্গ অবতার।
বিনামূলে গোরাধন, যদি কর আকিঞ্চন, আয় নিতাইর প্রেমের বাজার॥

৯ম পদ। শ্রীগান্ধার।

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব মুখে, দেখি আঁখি পরতেকে, না ভজিনু গোরা অবতার॥ ধ্রু॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দৈন্য ভাব প্রকাশিয়া রোদন করিয়া আর্ত্তনাদে।
বুঝাইল অনুক্ষণ, না বুঝে পামর মন, মনু মনু দারুণ বিষাদে॥
ভাবিতে সে সব সুখ, অন্তরে পরম দুখ, অন্নজল খাও কোন্ লাজে।
ও রসে না হৈল রতি, অভিমানে খাইনু মতি, কি শেল রহল হৃদি মাঝে॥

---

* গ্রন্থান্তরে ইহা কৃষ্ণদাসের পদ বলিয়া গৃহীত, ও ইহার ভণিতা এইরূপ :—
"আনন্দ সলিলে ভাসে, এই দীন কৃষ্ণদাসে।"

কে আছে এমন হেন, উদ্ধারে পাতকী১ জন, পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া ॥
চিন্তায় আকুল মন, নরহরি অনুক্ষণ, সে সিন্ধুর উদ্দেশ না পাইয়া ॥

১০ম পদ। শ্রীরাগ।

পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়, দেখ রে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি, সংকীর্ত্তনে করেন বিহার ॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভা ভান্তি, আজানুলম্বিত ভুজ সাজে।
সন্ন্যাসীর রূপ ধরি, আপন রসে বিহ্বল, না জানি কেমন সুখে নাচে ॥
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণার সিন্ধুময়, জয় বৃন্দাবনরায় রে।
নবদ্বীপ পুরন্দর, বৃন্দাবন পামরে, চরণকমলে দেহ ছায় রে ॥

১১শ পদ। ধানশী।

গৌর গোবিন্দগণ, শুন হে রসিকজন, বিষ্ণু মহাবিষ্ণু পর পহুঁ।
যাঁর পদনখদ্যুতি, পরম ব্রহ্মের স্থিতি, সুর-মুনি প্রাণের গণ তুহুঁ ॥
অন্তরে বরণ ভিন্ন, বাহিরে গৌরাঙ্গ চিহ্ন, শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি রাজে।
শতদলকমল, হেমকর্ণিকার মাঝে, বিহরই চারি দ্বারী সাজে ॥
গোলোক বৈকুণ্ঠ আর, শ্বেতদ্বীপ নামে সার, আনন্দ অপার এক নাম।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণে, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসনে, চারি দিকে সাজে চারিধাম ॥
ক্ষীরোদসাগরজলে, ভুজঙ্গরাজের কোলে, যোগনিদ্রা অবলম্বিত লীলা।
তাহে সব অবতরি, শ্বেতদ্বীপ অধিকারী, অনন্ত নিত্যানন্দ পেলা ॥
সহস্র সহস্র কাণে, লোলিয়া লোলিয়া পড়ে মুখে।
সৃজি দুই জিহ্বায়, গৌরচন্দ্র গুণ গায়, পাদপদ্ম মহালক্ষ্মী বুকে ॥ ধ্রু ॥
দশশত ফণীমণি, মুকুটের সাজনি, শ্বেত অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি।
কত কত পারিষদ, সনক সনাতনানন্দে, দেব ঋষিগণে করে স্তুতি ॥
যাঁর এক লোমকূপে, কতেক ব্রহ্মস্বরূপে, নানামতে সৃজে সব প্রজা।
রাম আদি অবতার, অংশে পরকাশ যাঁর, সে সব ব্রহ্মাণ্ডের যেঁহো রাজা ॥
এ হেন অনন্তলীলা, মায়ায় কত সৃজিলা, শ্রীরাধার কটাক্ষবাণ তূণে।
ব্রহ্মাণ্ড উপরি ধাম, শ্রীবৃন্দাবন নাম, গুণগান করে বৃন্দাবনে ॥

১২শ পদ। শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধু পার। ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার ॥

---

(১) পতিত পাঠান্তর।

আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়। জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয়॥

হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী। সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দু বাহু পসারি।

সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে। পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে॥

১৩শ পদ। ধানশী।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই। ভুবনমোহন গোরাচাঁদ নিতাই॥

কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন। হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন॥

হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই। পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥

হেন অবতার ভাই নাই কোন যুগে। কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥

রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার। যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার॥

নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন। একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥

১৪শ পদ। শ্রীরাগ।

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন, নিতাই গৌরচন্দ্র।

সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ॥

ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।

বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল বল হরি॥

দেখ অরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।

শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যাঁর গুণ গাথা॥

সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।

আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস॥

১৫শ পদ। ধানশী।

গোরা মোর গুণের সাগর। প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর॥

গোরা মোর অকলঙ্ক শশী। হরিনামসুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥

গোরা মোর হিমাদ্রিশেখর। তাহা হৈতে প্রেম গঙ্গা বহে নিরন্তর॥

গোরা মোর প্রেম কল্পতরু। যাঁর পদচ্ছায়ে জীব সুখে বাস করু।

গোরা মোর নবজলধর। বরষি শীতল যাহে করে নারীনর॥

গোরা মোর আনন্দের খনি। নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি॥

১৬শ পদ। ধানশী।

কিনা সে সুখের সরোবরে। প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥

নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে। প্রেমভরে পদধরে [illegible] ধরে॥

বয়ান কনয়াচাঁদ ছাঁদে। কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে ॥
রাজহংস প্রিয় সহচর। কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর ॥
নব নব নটন লহরী। প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া-নাগরী ॥
নব নব ভকতি রতনে। অযতনে পাইল সব দীনহীনজনে ॥
নয়নানন্দ কহে সুখ সারে। সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে ॥

১৭শ পদ। বালা ধানশী।

আওত পিরীতি মুরতিময় সাগর, অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত, নব রস যাবত, নব তনু রতন সমাজ ॥
ভালি ভালি নদীয়াবিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন সম্পদ, সকল সুখের সুখ সার ॥ ধ্রু ॥
ধনি ধনি অতি ধনি, অব ভেল সুরধুনী, আনন্দে বহে রসধার।
স্নান পান অবগাহ, আলিঙ্গন সঙ্গম, কত কত বার ॥
প্রতিপুর মন্দির, প্রতি তরুকুলতল, ফুল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ, প্রেমে বিশ্বম্ভর, সবাকার পুরাইল আশ ॥

১৮শ পদ। সুহই।

কলি ঘোরতিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম রহুঁ দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥
ভাই রে ভাই, গোরা গুণ কহনে না যায়।
কত করি-বদন কত চতুরানন, বরণিয়া ওর না পায় ॥ ধ্রু ॥
চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়াছে, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন যেন, দরপণে অন্ধে কিবা কাজে ॥
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে, সেই সে সকল জানে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার ॥

১৯শ পদ। ধানশী।

প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়, করুণা বাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাকাল ছাড়ে, তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত হংস চন্দ্রমাকে, পিবি পিবি বলি ডাকে, পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥ ধ্রু ॥

ডুবি রূপ সনাতন, তোলে নানা রত্ন ধন, যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তি লতা সূত্র করি, লেহ জীব কণ্ঠে ভরি, দূরে যাবে আপনার জ্বালা॥
লীলা রস সংকীর্ত্তন, বিকশিত পদ্মবন, জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুমবন, মাতিল ভ্রমরগণ, পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণ দাসে॥

২০ পদ। সুহই।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চড়াও তাহাতে॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্যবচন।
তোমা সবার শ্রীচরণ, করি অঙ্গ বিভূষণ, করো কিছু এই নিবেদন॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, প্রফুল্লিত পদ্মবন, তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রদিনে, তাতে চরাহ মনোভৃঙ্গগণ॥
নানাভাবে ভক্তগণ, হংস চক্রবাকগণ, যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল, ভক্ত করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে যাঞা, হংস-চক্রবাক হৈঞা, সদা তাতে করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, অনায়াসে কহে কৃষ্ণদাস॥

২১ পদ। সুহই।

গৌরামৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন॥
চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা কর্পূর, দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাতে যার মনো বাঁধে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥
সেই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে, তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে, প্রফুল্লিত তনু মনে, হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
এ অমৃত কর পান, যাহা বিনা নাহি আন, চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে, যাহাতে পড়িলে সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ, যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, রঘুনাথ শ্রীচরণ, শিরে ধরি করি তাঁর আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্য চরিতামৃত, গায় কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥

২২শ পদ। ধানশী।

নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরি। নিতাই গলুইয়া তাতে চৈতন্য কাণ্ডারী॥
ছুই রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল শ্রীরূপ সনাতন। পারের নৌকায় এরা দাঁড়ি ছয়জন॥
কে যাবি ভাই ভবপারে বলি নিতাই ডাকে। খেয়ার কড়ি বিনা পার করে যাকে তাকে॥
আতরে কাতর বিনা কে পার করে ভাই। কিন্তু পার করে সভে চৈতন্য নিতাই॥
কৃষ্ণদাস বলে ভাই বল হরি হরি। নিতাই চৈতন্যের ঘাটে নাহি লাগে কড়ি॥

২৩শ পদ। সুহই।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনরোত্তম শ্রীশ্রীনিবাস আর।
হেন অবতার হবে কি হৈয়াছে যার প্রেমপরচার॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল যাচিঞা যাচিঞা ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে পদ জগতে ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচয় বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে প্রেমে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন আনন্দে মাতিল উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমদাস হেন অবতারে রতি না জন্মিল মোর॥

২৪শ পদ। কামোদ।

ইহ কলিযুগ ধন্য, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য, পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুখী, হৈয়া সকরুণ আঁখি, হরিনাম গাঁথি দিল হার॥
নিজগুণ প্রেমধন, দিলা গোরা জনে জন, পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি, ফিরে প্রভু গৌর হরি, যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে॥
জড় পঙ্গু অন্ধ যত, পশু পাখী আর কত, কাঁদায়ল নিজে প্রেম দিয়া।
প্রেমে সব মত্ত হৈয়া, অন্ন জল তেয়াগিয়া, ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া॥
হেন প্রভু না ভজিনু, জনমিয়া না মরিনু, হারাইনু নিত্যানন্দ নিধি।
কহে হরিদাস ছার, কোন গতি নাহি আর, হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি॥

২৫শ পদ। মঙ্গল।

অখিল ভুবন ভরি, হরি রসবাদর, বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে।
ভকত চাতক যত, পিবি পিবি অবিরত, অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি, মেঘের জনম তথি, সেই মেঘে করল বাদর।
উচানীচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল, গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র, হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত১ যত, তারা হৈল ভাগবত, বাঢ়িল গৌরাঙ্গ-ঠাকুরালী॥
জগাই মাধাই ছিল, তারা প্রেমে উদ্ধারিল, হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে, কেন রইনু মায়াভোলে, প্রভু মোরে দেহ পদচ্ছায়া॥

২৬শ পদ। সুহই।

গোরা দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥ ধ্রু॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কাঁধে।
চলি যাইতে না পারে গোরাচাঁদ হরি বলি কাঁদে॥
প্রেমে ছল ছল, নয়ন-যুগল, কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরিল, গোরাকলেবর, ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বোলে।
প্রিয়সখার কাঁধে, ভুজযুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে॥
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উতরোল পতিতপাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন॥

২৭শ পদ। ধানশী।

অপরূপ চাঁদ, উদয় নদীয়াপুরে, তিমির না রহে ত্রিভুবনে।
অবনীতে অখিল, জীবের শোক নাশল, নিগম নিগূঢ় প্রেমদানে॥
আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
ভকত হৃদয় কুমুদ পরকাশল অকিঞ্চন জীবের উপায়॥ ধ্রু॥
শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরানন, নিরবধি যাঁর গুণ গায়।
সো পহুঁ নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে, আনন্দে ধরণী লোটায়॥
অরুণ-নয়ানে, বরুণ-আলয়, বহহে প্রেম-সুধাজল।
যদুনাথদাস বলে, জীবের করমফলে, প্রসবে সো মুকুতার ফল॥

(১) দুর্গত।

২৮শ পদ। কামোদ।

গৌরবরণ তনু, সুন্দর সুধাময়, সদয় হৃদয় রসালয়ে।
কুন্দ করবীর, গাঁথন থর থর, দোলনি বনিবনমালয়ে॥
গৌর বাসে বর,প্রিয় গদাধর, নিগূঢ় রস পরকাশয়ে।
রসমণ্ডল ঐছে, ভাসল প্রেমে, গদ গদ ভাসয়ে॥
নদীয়া নগরে, চাঁদ কত কত, দূরে গেও আঁধিয়ারে।
কতিহুঁ উলয়, দীপ নিরমল, ইবেহুঁ নামই না পাররে॥
গৌর গদাধর, প্রেম সরোবর, উথলি মহীতল পূররে।
দাস যদুনাথে, বিধি বিড়ম্বিত, পরস নাপাইয়া ঝুররে॥

২৯শ পদ। সুহই।

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম। ভাবিতে ভাবিতে হৈল রাধার বরণ॥
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর। ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥
ধারা ধরণী সঘনে বহিয়া যায়। পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়॥
মননিমগন গৌরী ভাবের প্রকাশে। এক মুখে কি কহিব যদুনাথ দাসে॥

৩০শ পদ। ধানশী।

কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী। কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি॥
হেনরূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি। অন্তরে পরাণ কাঁদে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সি। হরি হরি বলি কাঁদে পরম উদাসী॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মুখে হাসি। করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি
নন্দরাম দাসে কহে মনে অভিলাষী। কাঁদায়ে কান্দাইল গোরা ত্রিভুবনবাসী॥

৩১শ পদ। বিভাস লোফা।

গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি গুণ অগণন। তুলনা দিবার নাহি অন্য স্থান॥
কল্পতরু অভিলাষ করয়ে পূরণ। যেজন তাহার স্থানে করয়ে যাচন॥
সিন্ধু বিন্দু দেয় তথা করিলে গমন। ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ॥
পাত্রাপাত্র নাহি মানে গৌরাঙ্গ রতন। সময় বিচার তেঁহ না করে কখন॥
যাচিঞা অমূল্য ধন করে বিতরণ। একলা বঞ্চিত কেবল দাস সঙ্কর্ষণ॥

৩২শ পদ। গান্ধার।

ভব সাগর বর দূরতর দুরগহ, দুস্তর গতি সুবিথার।
নিমগন জগত, পতিত সব আকুল, কোই না পাওল পার॥

জয় জয় নিতাই গৌর অবতার।
হরিনাম প্রবল তরণী অবলম্বয়ে, করুণায় করল উদ্ধার ॥ ধ্রু ॥
অজভব আদি ব্যাস শুক নারদ, অন্ত না পায়ই যাঁর।
ঐছন প্রেম পতিত জনে বিতরই, কো অছু করুণা অপার ॥
হেন অবতার আর কিয়ে হোয়ব, রসিক ভকতগণ মেল।
দীন ঘনশ্যাম, সোঙরি ভেল জরজর, হৃদি মাহা রহি গেল শেল ॥

৩৩ পদ কেদার।

গৌর গদাধর, দুহুঁ তনু সুন্দর, অপরূপ প্রেমবিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে, পরশে যব বিলসয়ে, অমিঞা বারখে অনিবার ॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁজন লেহ।
কো অছু ভাব, প্রেমময় চতুরালি মজিয়া পাওব সেহ ॥ ধ্রু ॥
করে করে নয়নে যোই মাধুরী, সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি, তনু চমকাইত, অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
অমিঞা পুতলি কিয়ে, রসময় মূরতি, কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন, তনু মন ভুলায়, যদু কিয়ে পাওব পার ॥

৩৪ পদ। মঙ্গল।

জলের জীব কাঁদয়ে দেখিয়া প্রতিবিম্ব, কাননে কাঁদায় পশুপাখী।
তরুয়া পুলকিত, পাষাণ দরবিত, শুনিয়া অন্ধ কাঁদে হাকি ডাকি ॥
অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ।
অসীম অনুভব, এক মুখে কি কহব, মনে বা মুখে না আইসে সেহ ॥ধ্রু॥
কুলের কুলবধূ, ফুকরি ফুকরি কাঁদে, বধির জড় কাঁদে ধাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক, না জানি কিবা লাগি কাঁদে ॥
এমন অবতার, হবেক নাহি আর, কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড়, অজড় উদ্ধারিত, কেবল বঞ্চিত ভেল যদু ॥

৩৫ পদ। ধানশী।

দাস গদাধর প্রাণ গোরা। পূরব চরিতে ভেল ভোরা ॥
বিজুরী বরণ তনু চোরা। কমল-নয়নে বহে লোরা ॥
কনক-কমল মুখ কাঁতি। হাসিতে খসয়ে মণি মোতি ॥
বিপুল পুলকভরে কম্প। হরি হরি বলি দেই ঝম্প ॥

না জানে অহনিশি নিজ রসে সঘনে চিকুর চীর খসে ॥
ঘন ঘন মহী পড়ি যায়। হেমগিরি ধরণী লোটায় ॥
ভাসল ভুবন প্রেমরসে। যদু এড়াইল কর্ম্মদোষে ॥

৩৬শ পদ। শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার। পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার ॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা। রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা ॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি। সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী।
সর্ব্বলোক ছাড়ে যারে অপরস বলি। দেবগণ মাগে আগে তার পদধূলি ॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম। হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥

৩৭ পদ। ভাটিয়ারি।

যত যত অবতার সার। ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার ॥ধ্রু॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ প্রেম নাম ধন। আচণ্ডালে দিয়া প্রভু ভরিলা ভুবন ॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়। ডুবিয়া সকল লোক নাচে গান গায় ॥
পশু-পক্ষি ব্যাঘ্র-মৃগজলচরগণে। হাসে কাঁদে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল সব গ্রামে। বঞ্চিত হইল এক দাস বলরামে।

৩৮ পদ। সুহই।

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন, কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিববিরিঞ্চি অগোচর প্রেমধন, যাচিঞা বিলায় জগজনে।
করুণার সাগর, গৌর অবতার, নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা সে মাধুরী, প্রাণ কাঁদে পাশরিতে নারি ॥
পামর-পাষণ্ড-আদি দীনহীন খল জাতি, গুণ শুনি কাঁদে জগজ্জন।
অগেয়ান পশুপাখী, তারা কাঁদে ঝরে আঁখি, কি দিয়া বাঁধিল সবার মন ॥
রাজা ছাড়ে রাজভোগ, যোগী ছাড়ে ধ্যানযোগ, জ্ঞানী কাঁদে ছাড়ি জ্ঞানরসে।
কেবা বলরাম হিয়া, গড়িলা পাষাণ দিয়া, হেন রস না কৈল পরশে ॥

৩৯ পদ। শ্রীরাগ।

সব অবতার সার গোরা অবতার। এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর ॥
দীনহীন অধম পতিত জনে জনে। যাচিঞা যাচিঞা প্রভু দিলা প্রেমধনে।
এমন দয়ালনিধি যেবা না ভজিল। আপনার হাতে তুলি গরল খাইল।
সে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে। কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে ॥
মুঞি সে অধম হেন প্রভু না ভজিয়া। কহে বলরাম এবে মরিনু পড়িয়া ॥

৪০ পদ। কামোদ।

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি। ঘন রসে সিঁচল স্থলচর জাতি ॥
দেখ দেখ গৌর জলদ অবতার। বরিখয়ে প্রেমে অমিঞা অনিবার ॥
তদরধি জগভরি দুরদিন ভোর। হরিরসে ডগমগ জগজন ভোর ॥
নাচত উনমত ভকত ময়ূর। অভকত ভেক রোয়ত জলে বুর ॥
ভকতি লতা তিন ভুবন বেয়াপ। উত্তম অধম সব প্রেমফল পাব ॥
কীর্ত্তন কুলীশ "রোগ বনচারী" ১। জ্ঞানসে ওঘন গরজে বিদারি ॥
চিত বিলোপি কষিল ২ করম ভুজঙ্গ। নিরমিল ৩ কলিমদ দহন তরঙ্গ ॥
তাপিত চাতক তিরপিত ভেল। দশদিক সবহুঁ নদী বহি গেল।
ডুবল অবনী কাহো নাহি ঠাম। সংসারের অচলে ৪ রহলু বলরাম ॥

৪১ পদ। মঙ্গল।

আপাদ-মস্তক প্রেমধারা বরিখত চৌদিকে ঝলকত কিরণে।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি, গমন সুলাবণি, চাঁদ উদয় করু চরণে ॥
কেমন বিধাতা সে, গৌরাঙ্গ চাঁদেরে যে, গড়িল আপন তনু ধরিয়া।
কেমন কেমন তার, কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া, তখনি না গেল কেন গলিয়া ॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, দারু পাষাণ কিবা, গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগপাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে, নাহি কাঁদে হেন নাহি পরাণি ॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর, যেমন তেমন দেহ পাঞা।
অনন্তদাসের মন, ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ, দেশে দেশে ফিরি যেন গাঞা।

৪২ পদ। শ্রীরাগ বা কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই।
অখিল-জীবের ভাগ্যে, অবনী বিহরে গো, পতিতপাবন দোন ভাই ॥ধ্রু॥
যারে দেখে তার ঠামে, যাচিঞা বিলায় প্রেমে, উত্তম অধম নাহি মানে।
এ তিন ভুবনের লোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক, প্রেম-অমৃত করি পানে ॥
কল্পবিরিঞ্চি সিন্ধু, না যাচয়ে একবিন্দু, ছিছি কিয়ে তাহাতে উপমা।
পতিত দেখিয়া কাঁদে, দেহথির নাহি বাঁধে, যাচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেমা ॥
এমন দয়াল দুহুঁ, যে না ভজে হেন পহুঁ, সে ছারের জীবনে কি আশ।
সন্ন্যাসী বিপ্র হৈলে ইহ, অসুর গণন সেহ, অনন্তদাসের এই ভাষ ॥

১। রোগ, বনচারি। ২ বিল নিকষিল। ৩। নিরমিল। ৪ বাচলে ?

৪৩ পদ। মঙ্গল।

নিতাই চৈতন্য দুই ভাই দয়ার অবধি। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি॥
চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে। হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে॥
পতিত দুর্গত পাপী কলিহত যারা। নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা॥
ভুবনমঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন রসে। রায় অনন্ত কাঁদে না পাইয়া লেশে॥

৪৪ পদ। সুহই।

গৌর নবঘন প্রেমধারা বরিষিল। তৃষিত তাপিত জীব তিরপিত ভেল॥
দুর্ম্মতি কঠিন মাটী ভক্তিচাষে চূর। উপজিল জীব-হৃদে প্রেমের অঙ্কুর॥
সে অঙ্কুরে ভক্তিবারি নিতাই সেচিল। দিনে দিনে প্রেমতরু বাড়িয়া উঠিল॥
ধরিল প্রেমের ফল সব জীবতরে। অনন্ত বঞ্চিত ভেল নিজ কর্ম্মফেরে॥

৪৫ পদ। গান্ধার।

সনকাদি মুনিগণে, চাহি বুলে দেবগণে, বিরিঞ্চি ধেয়ানে নাহি পায়।
দিগম্বর পশুপতি, ভ্রমি বুলে দিবারাতি, পঞ্চমুখে যাঁর গুণ গায়॥
যাঁর পদ ধৌত হৈতে, শুচি কৈল ত্রিজগতে, হরশিরে জটার ভূষণ।
সো পঁহু নদীয়াপুরে, অবতরি শচীঘরে, সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ॥
দেখি শচীনন্দন, জীব সব অচেতন, প্রকাশিলা নাম সংকীর্ত্তন।
বিষয়ী যবন যত, তারা হৈল উনমত, না হইল পড়ুয়া অধম॥
প্রেমজল মহাবন্যা, পৃথিবী করিল ধন্যা, ত্রিভুবন চলিল বাহিয়া।
তার্কিক পাষণ্ড যত, পলাইল হৈয়া ভীত, অভিমান-নৌকায় চড়িয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, তাঁর পদ মকরন্দ, যে জন করয়ে তার আশ।
তাঁহার চরণ ধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, দুখিয়া শেখর তার দাস॥

৪৬ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ। উথলিয়া বাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় তট দুইখানি। অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণি॥
স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। ডুবারি কাণ্ডারি তাহে প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রেম জলচর শ্রীবাসাদি সহচর। স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের মকর॥
বালুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া। দুঃখিয়া শেখর কাঁদে ফুকার করিয়া॥

৪৭ পদ। তুড়ী।

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরি গদাধর। নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥

অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ একজুড়ি। চালায় সরকার ঠাকুর হানি প্রেমনড়ি ॥
গুণ বাঁধা গায়েন বায়েন সব ফিরে। হরিনাম ইক্ষুরস দরদরাইতে পড়ে ॥
যে পায় সে খায় রস কেহ না আলয়। যত তত খায় তবু পেট না ভরয় ॥
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ৈ। নানা মতে করে পাক যার যে রুচই ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।
বিনা মূলে দেয় রস গাগরি গাগরি ॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল। মাগিয়া যাচিঞা শালে খায় সর্ব্বক্ষণ ॥

৪৮ পদ। ধানশী।

জগন্নাথ মিশ্রের সুকৃতি বীজ হৈতে। জনমিল গৌর-কল্পতরু নদীয়াতে ॥
যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল। নানা শাখা উপশাখা তাহার হইল ॥
ধরিল তাহাতে অদভুত প্রেমফল। রসে পরিপূর্ণ তাহা মাদক কেবল ॥
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল পাড়িয়া। দীন দুঃখিজনে দেয় দুহাতে বিলাঞা
সে ফলের রস যেন সুধাকরসুধা। যে জন চুষিয়া খায় যায় তার ক্ষুধা ॥
আপনি সে ফল খাইয়া নিতাই মালী। উনমত হৈয়া নাচে মাথে করি ডালি ॥
ধর নেও নেও বলি সে ফল বিলায়। কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রায়।

৪৯ পদ। বরাড়ী।

জীবেরে এমন দয়া কোথাও না দেখি, নায়র চৈতন্য প্রভু ॥
দীনহীনজনে এমন করুণা আর, নাহি দেখি কভু ॥
যুগধর্ম্ম লাগিয়া, বৈরাগ্যে ভ্রমিয়া, ফিরেন দেশে দেশে।
পাইয়া আকিঞ্চন, যাচিঞা প্রেমধন, বিলায় করুণা-আবেশে ॥
নিজ নাম সংকীর্ত্তন, পরম নিগূঢ় ধন, করুণায় গঢ়ল কায়া।
ধীর অধীর জড়, পঙ্গু অন্ধ আতুর, সবারে সমান দয়া ॥
তিন তাপে তাপিত, দেখিয়া ত্রিজগত, নয়ন ভরল প্রেমজলে।
শীতল করিতে, হেরিয়া কৃপাদিঠি, বরিখয়ে কানুদাসে বলে ॥

৫০ পদ। মল্লার।

গোরাগুণ গাও গাও শুনি।
অনেক পুণ্যের ফলে, সোপহুঁ মিলায়ল, প্রেমপরশ রস মণি ॥ ধ্রু ॥
অখিল জীবের, এ শোক-সায়র, শোষয়ে নয়াননিমিষে।
ও প্রেম লব লেশ, পরশ না পাইলে, পরাণ জুড়াইবে কিসে।

অরুণ-নয়নে, বরুণ আলয়, করুণাময় নিরিখণে।
মধুর আলাপনে, আথরে আথরে, পাঁজরে পাতিয়া লিখনে॥
প্রেমে ঢল ঢল, পুলকে পূরল, আপাদ মস্তক তনু।
বাসুদেব কহে, সহস্রধারা বহে, সুমেরু সিঞ্চিত জনু॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

পঁহু মোর গৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায়॥ ধ্রু॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি। সেই পঁহু বাহু তুলি কাঁদে হরি বলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম। সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অবিরাম॥
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া। গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা॥
পূরব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ। রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝেও না রঙ্গ॥

৫২ পদ। বিভাস।

ক্ষীরনিধি-জলমাঝে, আছিলা শয়ন শেজে, নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
অদ্বৈত পিরীতি বশে, আইলা কীর্ত্তন রসে, হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে॥
অবতরি রঘুকুলে, সিন্ধু বাঁধি গিরিমূলে, দশকন্ধ করিলা সংহার।
বধিলা রাক্ষসকুলে, আপনার বাহুবলে, শ্রীরামলক্ষ্মণ অবতার॥
যদুসিংহ অবতারে, গোকুল মথুরাপুরে, কত কত করিল বিহার।
মোহিয়া গোপীর মন, বিলাইলা প্রেমধন, কানাই বলাই অবতার॥
সব যুগ অবশেষে, কলিযুগ পরবেশে, ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান।
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি, ত্রিভুবন ভরি শুনি, করিবারে পতিতেরে ত্রাণ॥
যুগে যুগে অবতার, হরিতে ক্ষিতির ভার, পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণগানে॥

৫৩ পদ। শ্রীরাগ।

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যানে নাহি পায়। সহস্র আননে শেষ যার গুণ গায়॥
যার পাদপদ্ম লক্ষ্মী করয়ে সেবন। দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে করয়ে চিন্তন॥
ত্রেতায় জনম যার দশরথ ঘরে। যাহার বিলাস সদা গোকুল নগরে॥
গোপীগণ ঠেকিল যার প্রেম ফাঁদে। পতিতের গলা ধরি সেবা কেন কাঁদে॥ ১
অপরূপ এবে নবদ্বীপের বিলাস। ২ হেরিয়া মুগধ ভেল বৃন্দাবন দাস॥

---

১ নবদ্বীপ-গগনে উদিল সেই চাঁদে।
২ শচীর সূতিকা ঘরে পঁহুর বিলাস—ইতি পাঠান্তর।